কাছের ঠাকুর

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৪১

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত
মানসী প্রেস, ৭৩ শিশির ভাদুড়ী সরণি হইতে মুদ্রিত

'রা-স্বা'
তাঁর রথের রশি টেনে নিয়ে চলেছেন যাঁরা
সেই সব অগণিত ভক্তবৃন্দের করকমলে
আমার উৎসর্গ

লেখকের অন্যান্য বই

ওয়ারিশ

গল্প সংগ্রহ ১/২

অদ্ভুতুড়ে

শ্রেষ্ঠ গল্প

বড় সাহেব

মাধুর জন্য

জোড় বিজোড়

গোলমাল

আক্রান্ত

ফেরীঘাট

চারদিক

একাদশীর ভূত

হরিপুরের হরেক কাণ্ড

খ্রীষ্টাব্দ ১৮৮৮, ১৪ সেপ্টেম্বর, বঙ্গাব্দ ১২৯৫ ৩০ ভাদ্র, শুক্রবার, শুভ তালনবমী তিথিতে পাবনা জেলার (অধুনা বাংলাদেশ) হিমায়েতপুর গ্রামে সকাল সাতটা পাঁচ মিনিটে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শিবচন্দ্র চক্রবর্তী ও মাতা মনোমোহিনী দেবীর তিনি প্রথম সন্তান।

মাতা মনোমোহিনী আগ্রা সৎসঙ্গের হুজুর মহারাজের শিষ্যা ছিলেন। এই তেজস্বিনী, ধর্মপ্রাণা, সেবাপরায়ণা নারী স্বীয় গুণেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। হুজুর মহারাজের তিরোধানের পর যখন সরকার সাহেব তৎস্থলাভিষিক্ত হন তখন বালক অনুকূলচন্দ্রকে সৎমন্ত্র প্রদানের জন্য মাতা মনোমোহিনী তাঁকে পত্র দেন। সরকার সাহেব পত্রোত্তরে মাতা মনোমোহিনীকেই সৎমন্ত্র প্রদান করতে নির্দেশ দেন। মায়ের কাছে দীক্ষা লাভের পরই অনুকূলচন্দ্র বলেন যে, এই বীজমন্ত্র তাঁর অচেনা নয়। মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থাতেও তিনি এই নাম জপ করতেন।

অনুকূলচন্দ্র প্রথমে পাবনা ইনস্টিটিউশন ও পরে নৈহাটি মহন্দ্রনাথ স্কুলে পড়াশুনো করেন। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষা তাঁর আর দেওয়া হয়নি, কারণ এক দরিদ্র বন্ধুকে তিনি এই পরীক্ষার ফী-এর টাকা দান করে দেন।

অনুকূলচন্দ্রের পর মাতা মনোমোহিনীর আরও কয়েকটি পুত্রকন্যা হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় তন্মধ্যে প্রভাসচন্দ্র, কুমুদরঞ্জন ও গুরুপ্রসাদী ছাড়া আর কেউ বেশিদিন বাঁচেননি। চিরকুমারী গুরুপ্রসাদী এখনও বর্তমান।

নিজের চারপাশ সম্পর্কে বালক অনুকূলচন্দ্রের কৌতূহল ছিল দুর্নিবার। তীক্ষ্ণ ও গভীর পর্যবেক্ষণ, নিজের মতো করে তা বিশ্লেষণ ও অনুধাবন এবং যুক্তিপরম্পরা সিদ্ধান্তে বা সত্যে পৌঁছানোর প্রবণতা ছিল তাঁর মজ্জাগত। একদিন বৃষ্টিস্নাত অপরাহ্নে স্কুল থেকে একাকী ফেরার পথে তিনি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সম্মোহিত হয়ে যান। তিনি দেখতে পান তাঁর চারদিকে যা ছি সবই আলোকবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। সেইসব দ্যুতিময় কণিকা নানা ছন্দে আন্দোলিত হচ্ছে, নৃত্য করছে, তরঙ্গায়িত হচ্ছে। কিছুক্ষণ তিনি এমন অভিভূত হয়ে ছিলেন যে বাহ্যচৈতন্য লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অবলোকনের ভিতর দিয়েই বিশ্বরহস্যের দরজা তাঁর কাছে উন্মোচিত হল। কণিকা বা অণুময় এই বস্তু ও বাহ্যজগতের কথা বিজ্ঞান অনেক আগেই জেনেছে। কিন্তু ঠাকুর তবু তা জেনেছেন তাঁর নিজস্ব ইন্দ্রিয় ও সত্তা দিয়েই। তিনি পুঁথিপড়া বিদ্যায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। ঠাকুর সত্যকে জানতে চাইতেন নিজের মতো করে এবং হাতেকলমে। তিনি যখন খাগের কলম দিয়ে নিজের মতো করে

ফাউন্টেন পেন আবিষ্কার করলেন তার অনেক আগেই ফাউন্টেন পেন আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু তাতে ঠাকুরের কী? তিনি নিজে আবিষ্কার করবেন তবে তৃপ্তি। বাল্য বয়সে ভাঁটি গাছের পাতা খেয়ে ঠাকুরের পেটে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। মুখে গ্যাঁজলা উঠে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু লক্ষণটা তিনি মনে রেখেছিলেন। কিছুদিন পর আর একজন বালকের পেটে ব্যথা আর মুখে গ্যাঁজলা উঠতে দেখে ঠাকুর তাকে ভাঁটি গাছের পাতা খাওয়ান। তাতেই ছেলেটি আরোগ্য লাভ করে। আমরা জানি এ হল সদৃশ লক্ষণের চিকিৎসা পদ্ধতি, যা থেকে হোমিওপ্যাথির উদ্ভব। ঠাকুর তা জেনেছেন পরে। কিন্তু নিজের জীবনে প্রয়োগ করে করেই তিনি যা কিছু অধিগত করেছেন।

বোধহয় এই কারণেই পুঁথিপড়া বিদ্যের প্রতি তাঁর অনীহা ছিল। বই পড়ে না শিখে যা কিছু শিখতে চেয়েছেন হাতে কলমে! বইকেও উপেক্ষা করেনি, পড়েছেন প্রয়োজনমাফিক! পাশ করে চাকরি করার ইচ্ছে তো তাঁর কখনও ছিল না।

অনুকূলচন্দ্রের মাতৃভক্তি ছিল দৃষ্টান্তস্বরূপ। জননীই যেন ছিলেন তাঁর ভুবন! মাকে খুশি কার জন্য তিনি সর্বদাই ছিলেন তৎপর। পরবর্তীকালে তিনি ছড়া দিয়েছেন - মাতৃভক্তি অটুট যত, সেই ছেলেই হয় কৃতী তত। যা তিনি সারাজীবন ধরে বলেছেন তার প্রত্যেকটির মধ্যেই ছিল তাঁরই জীবনের প্রতিফলন। বালক অনুকূলচন্দ্র দুষ্ট বড় কম ছিলেন না। কিন্তু প্রগাঢ় মাতৃভক্তি সেই দুষ্টুমিকেও যেন ভূমায়তি করেছিল। মাকে খুশি করার প্রাণপাত চেষ্টার ভিতর দিয়েই জীবনের অনেক সারসত্য তাঁর অধিগত হয়েছিল।

বঙ্গাব্দ ১৩১৩, ২৮ শ্রাবণ মাত্র সতেরো বছর বয়সে অনুকূলচন্দ্র পিতামাতার ইচ্ছানুক্রমে ধোপাদহ গ্রামের (তৎকালে পাবনা শহর নিবাসী) রামগোপাল ভট্টাচার্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা একাদশ বর্ষিয়া সরসীবালা দেবীকে বিবাহ করেন।

এর পর ঠাকুর ডাক্তারী পড়তে কলকাতায় এসে ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হন। এই পর্বে তাঁকে প্রবল অর্থকষ্ট, অনাহার ও শারীরিক ক্লেশ সহ্য করতে হয়। যে সামান্য টাকা জননী তাঁকে পাঠাতে সমর্থ হতেন তাতে তাঁর চলত না। পয়সার অভাবে কলের জল খেয়ে কাটিয়েছেন, আশ্রয়ের অভাবে অনেক দিন ফুটপাথে শুয়ে রাত্রি অতিবাহিত করতে হয়েছে। গ্রে স্ট্রিটে যোগেন ভট্টাচার্যের কয়লার গুদামেও বেশ কিছুদিন ছিলেন। কয়লার গুদামে থাকায় তাঁরর জামাকাপড় নোংরা হত, শরীর মলিন হত, কিন্তু তাঁর হৃদয়ের উজ্জ্বল শুভ্রতা ম্লান হত না। তাই যে সব কুলিদের মধ্যে তিনি বাস করতেন তারা তাঁকে গভীর ভাবে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। অনুকূলচন্দ্রের চুম্বকের মতো আকর্ষণ শক্তির উৎসই হল তাঁর দরদ, তাঁর সুগভীর প্রেম। যেখানে যে অবস্থাতেই তিনি থাকুন না কেন, তাঁর অন্তরের

আলোই যেন চারধারে ছড়িয়ে পড়ত। তাঁকে চিনতে মানুষের ভুল হত না। এই ছাত্রটির ঐশ্বরিক ভাব আর ব্যক্তিত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে ওই মেডিক্যাল স্কুলের এক শিক্ষক ডাঃ শশীভূষণ মিত্র পরবর্তীকালে তাঁকে গুরুপদে বরণ করেছিলেন।

কলকাতায় থাকাকালীন যে কষ্ট ও দুর্দ্দশা তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল তাই থেকেও তিনি সংগ্রহ করেছেন জীবনের রসদ, অভিজ্ঞতা। অন্যের কষ্টকে চিনতে পেরেছেন। আবার কুলি বা শ্রমিকদের সঙ্গে মেলামেশা ও ভাব ভালবাসার দরুন ঠাকুর তাদের জীবনের পরিচয়ও সম্যক লাভ করেছেন। এ সবই তাঁর জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে ব্যাপকতা সঞ্চার করেছিল।

কি রকম ডাক্তার ছিলেন তিনি? একথার জবাবও সহজ নয়। ডাক্তারি পড়া শেষ করে তিনি হিমায়েতপুরে ফিরে এসে অবলম্বন করলেন হোমিওপ্যাথি। বাস্তববোধ, অনুমানশক্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অত্যন্ত প্রখর হওয়ার ফলে চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁর সাফল্য অবশ্যম্ভাবিই ছিল। সাফল্য এলও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। তাঁর ওষুধে রোগীর আরোগ্য একটা কিংবদন্তী হয়ে দাঁড়াল। চারদিকে তাঁর খ্যাতি এতই ছড়িয়ে পড়ল যে বহু দূর থেকেও রোগী আসতে লাগল তাঁর কাছে। কিন্তু এই সাফল্য ঠাকুরের কাছে বড় কথা ছিল না। সবসময়েই তাঁর উৎসুক মন জীবনের সব ঘটনা থেকেই সংগ্রহ করত অভিজ্ঞতা। চিকিৎসা করতে গিয়েই তিনি দেখলেন, শুধু ওষুধ দিয়েই বা নিদান হেঁকেই চিকিৎসকের কাজ শেষ হয় না। রোগী সেই ওষুধ সংগ্রহ করতে পারল কিনা, ঠিকমতো খেল কিনা, তার পথ্য জুটছে কিনা, তার গৃহপরিবেশ স্বাস্থ্যকর কিনা এসবও চিকিৎসকের নজর রাখা দরকার। পরবর্তীকালে শুধু হোমিওপ্যাথি নয়, ভেষজ ওষুধ ঠাকুর অনেকগুলিই আবিষ্কার করেন। তাঁর সৃষ্টি সৎসঙ্গ রসৈষণা মন্দিরে সেসব ওষুধ আজও তৈরি হয় এবং তার চাহিদা এতই বিপুল যে যোগান দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর দেওয়া ওষুধের মধ্যে প্রিভেন্টিনা (অ্যানটিসেপটিক ক্রিম), আজামঞ্জিট, উৎপলাদিকষায় কষায়, কবল, কার্ডোটোন, হেপাটোন, বাসার্জুন ইত্যাদির কথা আজ সর্বসাধারণের কাছেও পরিচিত। নিজে ডাক্তারি করতেন বলেই চিকিৎসা সম্পর্কে তাঁর গভীর নিবেশ ছিল। ডাক্তারদের কেমন হওয়া উচিত তার খুঁটিনাটি তিনি দিয়ে গেছেন। বিশেষ করে প্রতিটি রোগীর কেস হিস্ট্রি লিখে রাখা যে ডাক্তারের একান্ত প্রয়োজন তাও জোর দিয়ে বলেছেন।

ডাক্তারি পসার হতে না হতেই তিনি ধীরে ধীরে শুরু করলেন তাঁর উদ্দিষ্ট অধ্যাত্মমণ্ডলটি সৃষ্টির কাজ। শুরু হল কীর্তন যুগ। এবং এই যুগটিই শ্রীশ্রী ঠাকুরকে যেন সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে দিল। ইনি যে মহা পাবক পুরুষ, মানুষকে অন্তরে বাইরে যে ইনিই অমৃতত্ব সঞ্চার করতে পারেন সে বিষয়ে আর ভক্তজনের সন্দেহ রইল না।

এই কীর্তনযুগের যে-সব বিবরণ পাওয়া যায় তাতে এটা পরিস্কার যে, ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত এই কীর্তন সেই যুগে এক বিশাল ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি করে। শ্রীশ্রীঠাকুর অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন। আজানুলম্বিত বাহু, ঈষৎ তাম্রাভ গৌর বর্ণ, বিশাল আয়ত দুটি গভীর চোখ এবং অপরূপ মুখশ্রী। দীর্ঘদেহী ছিলেন, তবে ঢ্যাঙা লম্বা নন। তনুটি ছিল সুঠাম ও সুন্দর। এই অপরূপ মানুষটি যখন কীর্তনে যোগ দিতেন তখন নানা বিভঙ্গে তাঁর বরতনুটি শুধু আন্দোলিত হত। সেই সুঠাম সুন্দর তনুর তরঙ্গ যেন মানুষকে পাগল করে দিত।

প্রথমে কীর্তনের দলটি হয়তো খুব বড় ছিল না। মূলতঃ কিশোরীমোহন দাস, অনন্ত নাথ রায়, নফর ঘোষ, দুর্গানাথ সান্যাল, কোকন, বুনে প্রভৃতি এবং পরে সতীশচন্দ্র গোস্বামী, সুশীল বসু প্রমুখ কীর্তনের দলে যোগ দেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে এই কীর্তনকে খুব স্বাভাবিক সংঘটন বলে মনে হয় না। উদ্দণ্ড কীর্তন করতে করতে এক এক জন লাফ দিয়ে বাদ্যরত জয়ঢাকের ওপরে উঠে দাঁড়াতেন এবং নৃত্য করতেন। এই কীর্তনের সময়ে চারিদিকে যেন অতিলৌকিক বাতাবরণ সৃষ্টি হত। বৃক্ষরাজি কীর্তনের তালে তালে কাঁপত। নাচত পশুপাখিরাও। ঠাকুর প্রথমেই কীর্তনে যোগ দিতেন না। কীর্তন জমে উঠলে তিনি ছুটে এসে মাঝখানে পড়ে তাঁর মোহন নাচ নাচতে থাকতেন। দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে ছুটে আসত।

ঠাকুরের বয়স তখন চব্বিশ-পঁচিশ বছর। কীর্তনের যুগ। আর এই যুগ ঠাকুরের ভাবসমাধিরও যুগ। কীর্তন করতে করতেই কখনও কখনও ঠাকুর মূর্ছিতবৎ মাটিতে পড়ে যেতেন। দেহখানি বিবশ, প্রাণহীন হয়ে পড়ত। নাড়ি বন্ধ হয়ে যেত। শ্বাস চলত না। কিন্তু তাঁর শরীরে দেখা দিত বিচিত্র সুন্দর সব স্পন্দন, আন্দোলন। কখনও বা বিচিত্র, দুরূহ ও অসম্ভব সব আসন মুদ্রাদি হতে থাকত। কূর্মাসন, পদ্মাসন, বীরাসন, রাজাসন প্রভৃতি শতাধিক আসন অতি দ্রুতবেগে সংঘটিত হত। কখনও পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের ওপর ভর করে সমস্ত শরীর শূন্যে আন্দোলিত হত। কখনও কচ্ছপের মতো হাত পা সব শরীরের মধ্যে ঢুকে যেত। কখনও ডাঙায় তোলা কাৎলা মাছের মতো শরীরখানি লাফাতে থাকত। সমাধি হলেই প্রথমে তার ডান পায়ের বুড়ো আঙুল থরথর করে কাঁপতে থাকত। ওই কম্পন থামলেই তাঁর বাহ্যসংজ্ঞা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যেত। এই অবস্থায় তাঁর বদনমণ্ডল কখনও হাস্যোদীপ্ত, কখনও নীলবর্ণ, কখনও বা ঈষদারক্তিম স্বর্গীয় জ্যোতিতে দীপ্তিমান হয়ে উঠত। আর এই অবস্থায় কোনও কোনও দিন তাঁর মুখ থেকে ধীর উদাত্ত স্বরে বিভিন্ন ভাষায় অদ্ভুত বাণীসমূহ উচ্চারিত হতে থাকত। এই বাণীগুলি সম্পর্কে তিনি নিজে পরবর্তীকালে বলেছেন, "বাণীর সময় কখনও কখনও মনে হত যেন কতগুলি আইডিয়ার ঢেউ

আমার অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে ফক ফক করে বেরিয়ে আসছে আর বায়োস্কোপের ফিল্মের মতো আইডিয়াগুলি দেখাও দিত মূর্ত জীবন্ত হয়ে। সে কী ভীষণ! যেন উল্কাটা এসে সামনে দাঁড়াল আর তাই দেখে সব বেরুতো।"

প্রথমদিকে এসব বাণীর তাৎপর্য বা গুরুত্ব সকলে উপলব্ধি করেনি। কিছুদিন পরে বৃন্দাবনচন্দ্র অধিকারী, অনন্তনাথ রায় ও কিশোরীমোহন দাসের চেষ্টায় বাণীগুলি লিপিবদ্ধ হতে থাকে। বিভিন্ন ভাষায় ঠাকুরের মুখ থেকে বাণী উচ্চারিত হত। কিন্তু সেইসব ভাষা সকলের জানা না থাকায় শুধু ইংরিজি, বাংলা আর সংস্কৃত বাণীগুলি লিপিবদ্ধ হতে থাকে। এই বাণীগুলি পরে গ্রন্থাকারে "পুণ্যপুঁথি" নামে প্রকাশিত হয়। সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে শুরু করে মানুষের অনেক প্রশ্নের সমাধান এই মহা গ্রন্থটিতে আছে।

ভক্ত অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য অন্যত্র চলে যাবেন বলে শ্রীশ্রীঠাকুরেরর কাছে কিছু লিখিত উপদেশ প্রার্থনা করেন। দয়াল ঠাকুর এক রাত্রে ভক্তের এই আব্দার পূর্ণ করতে কিছু উপদেশ লিখে দেন। এই উপদেশাবলি ১৩১৬ বঙ্গাব্দে লেখা হয়। এই উপাদেশাবলীই "সত্যানুসরণ"

সৎসঙ্গ বলে কোনও আশ্রম ঠাকুর আনুষ্ঠানিকভাবে গঠন করেননি।। কীর্তনযুগে তাঁর কাছে চুম্বকের আকর্ষণের মতো হাজার হাজার মানুষ এসে জুটতে লাগল।। তাঁকে ঘিরে আপনা থেকেই রূপ নিতে লাগল একটা সংগঠন। আর সেই সঙ্গে প্রয়োজনেই গড়ে উঠতে লাগল নানারকম নির্মাণ। ঘরদোর তৈরি হতে লাগল, ক্রমে স্কুল হল, কলেজ হল, হাসপাতাল, বিজ্ঞান গবেষণাগার হস্তশিল্পের ব্যবস্থা ধীরে ধীরে উদ্ভিন্ন হতে লাগল। লোকে ঠাকুরের নামানুসারেই এই আশ্রমকে অভিহিত করত। পরে মাতা মনোমোহিনী এই আশ্রমের নামকরণ করেন সৎসঙ্গ।

কীর্তনযুগে ঠাকুর সদলবলে গ্রামে, শহরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে পরিক্রমা করতেন। অনেক ভক্তের বাড়িতে গিয়ে হাজির হতেন। তাঁর মধ্যে মানুষ খুঁজে পেত অমৃতের স্বাদ। তাঁর সঙ্গই ছিল মানুষের কাছে এক পরম প্রাপ্তি। একে ওই মোহন রূপ, অপরূপ নৃত্যের ভঙ্গিমা, ভাবসমাধি, তার ওপর তাঁর অমৃতময় কথোপকথন মানুষের প্রতি অপরিসীম মমতা ও ভালবাসা মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত।

১৩৩০ বঙ্গাব্দে ২৪ অগ্রহায়ণ তাঁর পিতা শিবচন্দ্র পরলোকে গমন করেন। ঠাকুরের বয়স তখন ৩৫ বছর। এর ঠিক ১৪ বছর পর ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ৬ই চৈত্র পরলোকগমন করেন মাতা মনোমোহিনী। মাকে ঠাকুর প্রাণাধিক ভালবাসতেন। তাই মাতৃবিয়োগ তাঁর কাছে এক বজ্রকঠিন আঘাত। এই শোক বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত তাঁকে বিহ্বল রেখেছে। মায়ের অভাবে যে তিনি ঠুঁটো হয়ে পড়েছেন একথা বার বার

বলতেন।

প্রথমা পত্নী সরসীবালার গর্ভে ঠাকুরের দুই পুত্র অমরেন্দ্রনাথ ও বিবেকরঞ্জন এবং দুই কন্যা সাধনা ও সান্ত্বনা জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুরের পঞ্চাশোর্ধ বয়সে সরসীবালার কনিষ্ঠা ভগ্নী সর্ব্বমঙ্গলা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বরণ করার প্রবল ইচ্ছা জ্ঞাপন করলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে নিবৃত্ত করার অনেক চেষ্টা করেন। তারপর মাতা মনোমোহিনী সর্বমঙ্গলার প্রবল অনুরাগ দেখে অনুকূলচন্দ্রকে বিবাহ করার আদেশ দেন। মাতৃ আজ্ঞা বরাবরই শ্রীশ্রীঠাকুরের শিরোধার্য ছিল। এই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে শ্রীশ্রীঠাকুরের তৃতীয় পুত্র প্রচেতারঞ্জনের জন্ম। আরও পরবর্তীকালে অব্রাহ্মণ পারুলবালা শ্রীশ্রীঠাকুরকে পতিত্বে বরণ করেন। এই অসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে শ্রীশ্রীঠাকুরের এক কন্যা অনুকা জন্মগ্রহণ করেন। বলে রাখা ভাল যে, শ্রীশ্রীঠাকুর সংসারে থেকেও নিজেকে দূরে রাখতেন। ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়েই কাটত তাঁর দিবসরজনী। দাম্পত্য জীবন ছিল নামমাত্র।

দয়াল ঠাকুর নিজে খুব কমই দীক্ষা দিয়েছেন। প্রথম দিকে বিশেষ কয়েকজনকে। তারপর দীক্ষা দানের জন্য তিনি আচারনিষ্ঠ, ইষ্টপ্রাণ, সদাচারী ভক্তদের বেছে নিয়ে ঋত্বিকের পাঞ্জা প্রদান করেন। ঋত্বিকরা তাঁর পুরোহিত, কোনক্রমেই তাঁরা গুরু নন। ঠাকুরের সৎনাম তাঁর আদেশে বিতরণ করাই তাঁদের কাজ। এই প্রথা শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্তন করেছিলেন বলে কথিত আছে। ঋত্বক ছাড়াও যাজনকার্যে সাহায্য ও ঋত্বিকদের সহায়তা দানের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর অধ্বর্য্যু ও যাজক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। এঁরা দীক্ষা দিতে পারেন না বটে, কিন্তু মানুষ যাতে উদ্বুদ্ধ হয় সেই কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন।

যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি এই তিন স্তম্ভের ওপর শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুশাসন দাঁড়িয়ে আছে। যজন মানে নাম-ধ্যান পরয়াণতা, ইষ্ট বা গুরুতে মনকে সম্যকভাবে ন্যস্ত করার প্রয়াস। যাজন মানে নাম ধ্যান ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেকে বিনায়িত করে চরিত্রের এমন বিকাশ সাধন যাতে মানুষকে নিজের ইষ্টের দিকে আকৃষ্ট করা যায়। যাজন শুধু মুখের কথা নয়, কথার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতা না থাকলে যাজন সার্থক হয় না। মানুষকে দীক্ষা নেওয়ার কথা বলতেই নেই, কিন্তু তার ভিতরের এমন অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে হয় যাতে সে দীক্ষা নেওয়ায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। ইষ্টভৃতি মানে ইষ্টকে ভরণপোষণ। দয়াল ঠাকুর আমাদের ইষ্ট, বাস্তবজীবনে তাঁর প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রতিদিন বাস্তবভাবে অর্ঘ্য নিবেদন করাই ইষ্টভৃতি। নিজে অর্জন করে তবেই তা প্রতিদিন ভোরবেলা অন্নজল গ্রহণের আগে পবিত্রভাবে মন্ত্রোচ্চারণ করে নিবেদন করতে হয় এবং প্রতি ত্রিশ দিনের দিন তা দক্ষিণা ও সংগঠনীসহ ইষ্টসকাশে পাঠাতে হয়। পাঠানোর দিন যতক্ষণ পাঠানো না হচ্ছে ততক্ষণে জলগ্রহণ নিষেধ।

ইষ্টভৃতি পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে দুটি ভ্রাতৃভোজ্য দিতে হয়।

এছাড়া ঠাকুর স্বস্ত্যয়নী ব্রত, সদাচার ইত্যাদিও কঠোরভাবে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণাশ্রম কখনও ভাঙা উচিত নয় এবং বিবাহাদির ব্যাপারে খুব সর্তকতা অবলম্বন করারই বিধি তিনি দিয়েছেন। এ ব্যাপারে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিস্তারিত বলা আছে।

১৯৪৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঠাকুর খানিকটা আকস্মিক ভাবেই পাবনা হিমায়েতপুর ছেড়ে দেওঘর বৈদ্যনাথধামে রওনা হয়ে যান। চিকিৎসকের পরামর্শে বায়ুপরিবর্তনের জন্যই যাওয়া বটে, কিন্তু এই যাত্রার নিহিত অন্য কোনও গভীর তাৎপর্য থাকা সম্ভব। হিমায়েতপুর আশ্রমে তাঁর কোটি কোটি টাকার সম্পদ পড়ে রইল। দেওঘর শহরের উপান্তে বড়াল বাংলো নামে একখানি বাড়ি ভাড়া করে সেখানেই বেশ কষ্ট করে ঠাকুর বাস করতে লাগলেন। তিনি তো কখনও একা নন, তিনি মানেই সঙ্গে তাঁর প্রিয় শিষ্যরা। বহু মানুষ নিয়েই থেকেছেন এবং চলেছেন ঠাকুর। তাই শত কষ্ট হলেও কাউকে পরিত্যাগ করার প্রশ্নই কখনও তাঁর জীবনে দেখা দেয়নি। দেওঘরে তাঁকে ঘিরে, তাঁকে নিয়েই ফের গড়ে উঠল আশ্রম—যা সৎসঙ্গ নামে আজ বিখ্যাত। মনে রাখতে হবে সংগঠনটা ঠাকুরের প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছে, ঠাকুরের জন্যই সংগঠন। নইলে সংগঠন মূল্যহীন। ঠাকুরের ইচ্ছা রূপায়ণ, অনুশাসনকে ফলিত করে তোলাই সংগঠনের কাজ। ঠাকুরের সারাটা জীবনই কেটেছে দুঃখ কষ্টের মধ্যে। বাল্যকালে এবং ছাত্রজীবনে দারিদ্র্য ছিল প্রকট। পরে অন্যের দুঃখ দুর্দ্দশার ভাগীদার হয়ে মানুষকে মুক্ত করতে গিয়ে নিজের জীবনে ডেকে এনেছেন কত কষ্ট। নিজে পরমপ্রেমময় আবার ভালবাসার কাঙাল। মানুষকে ভালবেসে ঠাকুরের কোনও ক্লান্তি নেই। আবার তিনি চাইতেন আমরাও যেন ভালবাসাময় হয়ে উঠি।

১৯৬৯ সালের ২৭ জানুয়ারি সকাল চারটে পঞ্চান্ন মিনিটে পরমদয়াল শ্রীশ্রী ঠাকুর তাঁর বরতনু ত্যাগ করেন। ১৯৭১-এর ১০ মে প্রয়াণ করেন সরসীবালা।

তিনি মানবদেহে এসেছিলেন। মানবদেহের রোগ-ভোগ অবসান তো আছেই। কিন্তু তিনি যে অমৃতময় জীবনের সন্ধান দিয়ে গেছেন তাতে উত্তীর্ণ হতে পারে যে কোনও মানুষই। তাঁর অনুশাসনকে তাই কঠোরভাবে এবং আগ্রহের সঙ্গে অনুসরণ করতে হয়। চাই গুরুর প্রতি ভক্তি ও নিষ্ঠা। মনে রাখতে হবে ঠাকুরই একমাত্র উপাস্য, তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম।

॥ অনুশীলন ॥

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেওয়া সৎনাম গ্রহণ করার পর কতগুলি জিনিস অস্খলিতভাবে এবং অনুরাগের সঙ্গে নিত্য পালন করতে হয়।

ইষ্টভৃতি : ইষ্টভৃতি হল নিজের উপার্জন থেকে প্রতিদিন নিজে অন্নজল গ্রহণ করার আগেই ঠাকুরকে ভোজ্য নিবেদন করা। ভোরবেলা শয্যাত্যাগের পর প্রাত:কৃত্যাদী সেরে বাসী জামা কাপড় ছেড়ে শুদ্ধ বস্ত্র পরে ঠাকুরের প্রতিকৃতি এবং আসনের সামনে বসতে হয়। প্রথমেই ওঁ ব্রহ্ম পরব্রহ্ম কৃলমালিক রাধাস্বামী দয়ালের চরণে কোটি কোটি প্রণাম" বলে আভূমি প্রণামান্তে দু এক মিনিট জপধ্যান করে মন্ত্রপাঠপূর্বক ইষ্টভৃতির অর্ঘ্য নিবেদন করে তা একটি কৌটো বা উপযুক্ত পাত্রে রাখতে হয়। ইষ্টভৃতি নিবেদনের সময় মনে কোনও কামনা বাসনা রাখতে নেই। যতদূর সম্ভব ভক্তি ভালবাসা নিয়ে নিবেদন করার চেষ্টা করতে হয়। এই ইষ্টভৃতি ঠিক ত্রিশ দিন পূর্ণ হলে ত্রিশ দিনের দিনই মানি অর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট যোগে ইষ্টসকাশে পাঠাতে হয়। যতক্ষণ না ইষ্টভৃতি পাঠানো হচ্ছে ততক্ষণ জলগ্রহণ করতে নেই। ইষ্টভৃতির সঙ্গে দক্ষিণা, সংগঠনী, প্রণামী ও ঋত্বিকী পাঠানোর নিয়ম। নইলে ইষ্টভৃতি সম্পূর্ণ হয় না। ইষ্টভৃতি প্রেরণ করার পর ওইদিন দুজন ইষ্টভ্রাতাকে ভোজ্য দান করতে হয়। ভোজ্য হল চাল ডাল তরকারি ইত্যাদি।

নামধ্যান : সকালে উঠে আগে ইষ্টভৃতি করে তার পর নামধ্যানে বসা ভাল। ভোর তিনটের পর থেকে ইষ্টভৃতি করা চলে। ঠাকুর চাইতেন উষাকালের আগেই আমরা ইষ্টভৃতি করি। ইষ্টভৃতির পর একটি আরামদায়ক আসনে বসে (* চেয়ার, কৌচ যাই হোক তাতে বসা চলে) মুখ মাথা ও শরীর একটা পাতলা চাদরে ঢাকা দিয়ে পিঠ সোজা রেখে আজ্ঞাচক্রে মনোনিবেশ করতে হয়। ধ্যানের প্রাণই হচ্ছে ভালবাসা। ধ্যানের সময় ঠাকুরের প্রতি একটা ভালবাসার ভাব মনে সৃষ্টি করে নিতে হয়। ধ্যানে প্রাথমিক মনোনিবেশের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর চক্র ফটো প্রবর্তন করেছেন। চক্রফটো নিয়ে ধ্যান করলে মন সহজে নিবিষ্ট হয়। চক্রফটো কাছে না থাকলে এমনিই ধ্যান করা যায়।

স্বত: অনুজ্ঞা শ্রীশ্রীঠাকুর যে স্বত: অনুজ্ঞা দিয়ে গেছেন তা সকালে জপ ধ্যানান্তে পাঠ ও মনোগত করে নিতে হয়। শুধু মুখে বলাই নয়, আমি অক্রোধী, আমি অমানী ইত্যাদি ভাবে উদ্বুদ্ধ হতে হয় এবং সেই ভাবে চলতে হয়। দিনের মধ্যে যতবার খুশি স্বত: অনুজ্ঞা আবৃত্তি করা যেতে পারে, বিশেষ করে ধ্যানের পর তো বটেই।

শবধ্যান : দয়াল ঠাকুর যে শবধ্যান প্রবর্তন করে গেছেন সেটা অবহেলা করতে

নেই। শবধ্যানের জন্য একটু শক্ত জায়গা দরকার। মেঝেতে শতরঞ্চী বা মাদুর পেতে তার ওপর টান টান ভাবে চিৎ হয়ে শুতে হয়। দু পায়ের গোড়ালি যেন এক সঙ্গে থাকে, আর হাত দুখানা শরীরের সঙ্গে লেগে প্রলম্বিত থাকবে। মাথার পিছন দিকে—যেখানে মেডুলা ওবলংগাটা রয়েছে সেইখানে ঠাকুরের মূর্তি কল্পনা করে নামজপ করতে হবে। শবধ্যানের সময় শরীর ঢিলা রাখতে হয়, শ্লথ রাখতে হয়। এই ধ্যান পাঁচ থেকে সাত মিনিট করলেই যথেষ্ট। দিনের মধ্যে তিন চারবার করতে হয়।

নাম : মনে রাখতে হবে ভরপেট খাওয়ার পরে কোনও ধ্যানই করতে নেই। তাতে হজমের অসুবিধে হয়। তবে নাম সবসময়েই চলবে।, নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মতো। নামে কোনও বিরাম দিতে নেই। নাম করতে করতে কিছুদিনের মধ্যেই চব্বিশ ঘণ্টাই ইষ্টমূর্তি ধ্যান হতে থাকে। ঠাকুর বলেছেন সব কাজের মধ্যেই নামের চাকা ঘুরবে। এমন কি মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময়েও। তিনি আমাদের এই আশ্বাস দিয়ে রেখেছেন, নাম অবিরল করে গেলে চিন্তাশক্তির লাঘব হবে, কিন্তু কাজের ব্যাঘাত হবে না। এসব কেবল তাঁর কথার কথা নয়, ঠাকুরের দেওয়া জিনিষ নিজে হাতে-কলমে করে উপলব্ধিতে পৌঁছোতে হয়। আর তখনই আসে বিশ্বাস।

আহার : আহার সম্পর্কে ঠাকুর যা বলেছেন তা যেমন জীবনীয় ও আয়ুবর্ধক তেমনই মেধা ও মনঃসংযোগের সহায়ক। ঠাকুর বলেছেন মাছ-মাংস-ডিম-পেঁয়াজ রসুন ইত্যাদি খেলে দেহে অপ্রয়োজনীয় বিক্ষেপ ঘটে এবং মনও তাতে সংক্রামিত হয়। আমিষ আহার শরীরে টকসিন বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে আদি ব্যাধির উৎপাত বাড়ে।

থানকুনি পাতা : প্রতিদিন সকালে ইষ্টভৃতি ও জপধ্যানের পর প্রতিটি সৎসঙ্গীকেই একটি করে থানকুনি পাতা ডাঁটি সহ ভাল করে চিবিয়ে খেয়ে বেশি করে জল খেতে হবে। থানকুনির সঙ্গে একটুখানি আখিগুড় ও সামান্য দুধ খেলে আরও ভাল। চিবোতে অশক্ত হলে থানকুনি থেঁতো করে রস খাওয়া যেতে পারে। বছরের সবসময়ে থানকুনি পাওয়া যায় না বলে থানকুনি পাতা ধুয়ে ছায়ায় শুকিয়ে রাখলে তাও খাওয়া চলবে। নিতান্তই থানকুনি দুর্লভ হয়ে পড়লে তার বদলে তুলসীপাতা খেলেও হয়। শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেছেন, থানকুনি শরীরের অতিরিক্ত টকসিন কমায় ও ঘামের সঙ্গে বের করে দেয়। ফলে শরীর সুস্থ থাকে। থানকুনির ব্যাপারে প্রতি সৎসঙ্গীকেই সচেতন হতে হবে। আজকাল থানকুনির ট্যাবলেট তৈরি হচ্ছে।

অভাবে ওই ট্যাবলেট খাওয়া ভাল। তবে টাটকা থানকুনিই সর্বোত্তম। ঠাকুরের বলা আছে, থানকুনি ও জল খাওয়ার পর একটু প্রাতঃভ্রমণ করা ভাল।

প্রার্থনা : প্রতিদিন সকালে ইষ্টভৃতি ও জপধ্যানের পর এবং সন্ধ্যায় বিনতি প্রার্থনা করা একান্তই প্রয়োজন।

পূর্ণাঙ্গ বিনতি প্রার্থনার মধ্যে ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য ও মহিমা অতি উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে। ঠাকুর বার বার পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চি পালনের কথা বলেছেন। পূর্ণাঙ্গ বিনতি প্রার্থনার মধ্যে পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চি রয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সারা জীবন ধরে নানা প্রসঙ্গে ওই আহ্বানী সহ পূর্ণাঙ্গ বিনতি প্রার্থনাই করতে বলেছেন। তাছাড়া বিনতি ঝড়ের বেগে, আবেগহীন যান্ত্রিকভাবে করলে ফলপ্রসূ হয় না। বরং একটু ধীর লয়ে, অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে, ভক্তির সঙ্গে প্রার্থনা করলে মন শান্ত ও আপ্লুত হয়। বিনতি প্রার্থনার অনেকটা অংশই শ্রীশ্রীঠাকুরের বলে দেওয়া এবং তাঁরই নির্দেশে তাঁর বিশিষ্ট ভক্তের দ্বারা বিরচিত। আহ্বানী সহ পূর্ণাঙ্গ বিনতি প্রার্থনা আমাদের শ্রীশ্রী ঠাকুরের ভাবধারায় অভিষিক্ত করে। বিনতির পর শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থটি থেকে কিছু অংশ পাঠ ও তা হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। ঠাকুর সমবেত বিনতি প্রার্থনা পছন্দ করতেন। এজন্যই বলেছেন, অন্তত একবেলা যেন সমবেতভাবে বিনতি প্রার্থনা করার চেষ্টা আমরা করি। সমবেত ভাবে না পারলে এককভাবে করতে হবে, আর এই জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের গ্রন্থাবলী নিত্য পাঠ, নিত্য আলোচনা এবং চিন্তা ও অনুশীলন প্রতিটি ভক্ত শিষ্যেরই অস্খলিতভাবে করা উচিত। নইলে ঠাকুরকে অন্তরে জাগ্রত করে রাখা সম্ভব নয়। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর বাণীগুলি সম্পর্কে আমাদের খুব সচেতন থাকতে বলেছেন। সযত্নে ও অতি সতর্কতার সঙ্গে এই বাণী সমূহ সংরক্ষণ করা ভাবী মানবসমাজের পরম কল্যাণের জন্যই প্রয়োজন।

ঠাকুর পরিবার : শ্রীশ্রী ঠাকুর পরিবার বলতে বোঝায় তাঁর তিন পুত্র, তিন কন্যা এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের। এঁদের সকলের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল থাকা ভক্তদের একান্ত কর্তব্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের সব সন্তানই তাঁর। কাউকেই খাটো করা চলবে না। সকলেরই ভাল মন্দের দিকে শিষ্যদের নজর রাখা কর্তব্য।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের নানা বয়সের নানা ধরনের ছবি সংগ্রহ করে রাখতে হয়। ধ্যানের সময় যে ছবিটি যখন ভাবতে ইচ্ছে করবে সেইটেই ভাবা যায়। ধ্যানে শুধু তাঁর মুখশ্রী দেখাই ধ্যান নয়। তাঁর কথা, বাণী তাঁর নির্দেশিত কাজ ইত্যাদির কথাও ধ্যান করতে হয়। এবং তারপর ওইসব চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলে

তবেই ধ্যানের ফল আমরা লাভ করব।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের মূর্তি ও ছবির প্রসঙ্গে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দিল্লী থেকে শুরু করে আসাম, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা বিভিন্ন জায়গায় শ্রীশ্রীঠাকুরের শতাধিক মন্দির তৈরি হয়েছে। বেশির ভাগ মন্দিরেই শ্রীশ্রীঠাকুরেরর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় মূর্তি সমূহে ঠাকুরের চেহারা বা ভাবের যথোচিত প্রতিফলন ঘটছে না। ঠাকুরের মুখাবয়বের কিছু বিশিষ্টতা আছে। সামনে থেকে ও পাশ থেকে তাঁর বিভিন্ন ছবি বারবার স্টাডি না করলে তাঁর মূর্তি করা খুব কঠিন কাজ, এবং সে কাজ করতে হলে অতি দক্ষ ভাস্করের প্রয়োজন। আমাদের দেশে ভাস্কর্যের ট্রাডিশন তেমন উজ্জ্বল নয়। ভাল ভাস্কর পাওয়া দুষ্কর। তাই আমার মতো আরও অনেকের বিশ্বাস, খুব উচুঁদরের প্রতিভাবান এবং ভগবৎপ্রাণ ভাস্কর ছাড়া ঠাকুরের মূর্তি করা সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে মূর্তি প্রতিষ্ঠা না করে ঠাকুরের আলোকচিত্র বা তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। সুখের কথা আমাদের দেশে ভাস্করের অভাব থাকলেও চিত্রকরের অভাব নেই। কিন্তু চিত্রকরের হওয়া চাই প্রথম শ্রেণীর। নইলে ঠাকুরের ছবিতেও আকাঙ্খিত মাত্রা সংযোজিত হবে না। এ বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করার সময় এসে গেছে।

ইসকনে ভক্তিবেদান্তস্বামীর যে সব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে সেগুলি কেমন জীবন্ত, প্রাণবন্ত! জয়রামবাটিতে মা সারদার মর্মরমূর্তি কী অনবদ্য! যারা সেগুলি রচনা করেছেন তাঁদেরও তো বরাত দেওয়া যায়!

ঠাকুরের ছবি বা মূর্তি শ্রীশ্রী ঠাকুরের মুখশ্রী ও ভাবকে নিখুঁতভাবে প্রকাশ করবে, ভক্তরা তো এইটেই চায়। যেহেতু তিনি এখন দেহে নেই সেই কারণেই তাঁর ছবি ও মূর্তির গুরুত্ব এখন অপরিসীম। সুতরাং এই কাজটি অতি সতর্কতার সঙ্গে, অতি যত্নে ও প্রখর তদারকিতে হওয়া উচিত। যে সব মূর্তি ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলি অপসারিত করে সেই জায়গায় নিদেনপক্ষে ঠাকুরের ব্লোআপ করা ফটো রাখা প্রয়োজন।

কোথাও কেউ ঠাকুরের নাম করে কোনও উদ্ধৃতি দিলে বা উদ্ধৃতি সহ কিছু লিখলে সেটি যাচাই না করে গ্রহণ করা কদাচ উচিত নয়। শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন মানুষের পরম উদ্ধাতা, তেমনি আবার কিছু মতলববাজ মানুষের তাঁকে ভাঙানোর সম্ভাবনাও প্রবল। মহাপুরুষদের নিয়ে ব্যবসাও বিরল কিছু নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ঋত্বিকদের দেবতা আখ্যা দিয়ে গেছেন। তাঁর ঋত্বিকরা যদি প্রকৃত ঋত্বিকোচিত চলনায় নিজেদের অভ্যস্ত করে তুলতে পারেন তাহলে বিনা আয়াসেই তাঁরা মানুষের চোখে দেবোপম হয়ে উঠবেন। ঠাকুর ঋত্বিকদের চালনা করতেন তাঁর অফুরাণ ভালবাসা আর মমত্ব দিয়ে। ঋত্বিকরা তখন তাঁর প্রতিষ্ঠাকল্পে হাসিমুখে অনেক কঠিন পরিস্থিতি জয় করেছেন। এখনও ঋত্বিকরা তা পারেন যদি তাঁরা তন্নিষ্ঠ থাকেন। নিষ্ঠা ও ভক্তিতে দ্বিচারিতা ঢুকে পড়লেই কিন্তু সর্বনাশ। ঠাকুরের ঋত্বিকরা যদি ভ্রষ্ট হন তবে তাঁর আন্দোলনটিও যে থমকে যাবে।

দীক্ষা দান এক অতি পবিত্র কাজ। দীক্ষা দেওয়ার সময়ে ঋত্বিক অনবরত হৃদয়ে ঠাকুরকে ধরে রাখবেন। দীক্ষা তো ঠাকুরই দেন, ঋত্বিক প্রতিনিধি মাত্র। দীক্ষা দান করতে হয় অতীব নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে। সব কিছু ভাল করে অল্প সময়ে সহজ ভাষায় যজমানকে বুঝিয়ে দিতে হয়। অনেক সময়ে বারবার বোঝাতে হয়। ধৈর্য হারালে চলে না। দীক্ষার কোনও অঙ্গই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আচমন থেকে শুরু করে ইষ্টভৃতি অবধি কোনওটাই উপেক্ষার বিষয় নয়। ঠিকমতো দীক্ষা হলে ঋত্বিক তা নিজের শরীর ও মন দিয়েই বুঝতে পারবেন।

দয়াল ঠাকুর প্রবর্তিত স্বস্ত্যয়নী ব্রতর কথা আগেও বলেছি। স্বস্ত্যয়নী ব্রত ধারণ করে প্রতিদিন অর্থ রাখার পর মাসান্তে অর্থাৎ ত্রিশ দিনের দিন তিনটি টাকা শ্রীশ্রী ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে টাকা জমা রাখতে হয়। কারণ, ঠাকুর স্বস্ত্যয়নী ব্রতকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। কতবার কত প্রসঙ্গে যে ঠাকুর স্বস্ত্যয়নী ঠিকমতো পালনের নির্দেশ দিয়েছেন তার হিসেব নেই। Divine economy বলে কতবার উল্লেখ করেছেন। স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত অর্থে কেনা জমিতে যে একদিন সারাদেশ ভরে যাবে এমন আশাও প্রকাশ করেছেন। শুধু অর্থই নয়, স্বস্ত্যয়নী অন্যান্য নীতিও অবশ্য পালনীয়। এই ব্রত যে মানুষের জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদকে কতখানি ফলিত ও প্রত্যক্ষ করে তোলে তা যথার্থ ব্রতধারী বুঝতে পারবেই। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বস্ত্যয়নী ব্রত সম্পর্কে যা বলেছেন ঠিক ঠিক তা পালন করার মধ্যেই মানুষের পরম মঙ্গল নিহিত রয়েছে। এই ব্রতর কোনও অঙ্গই লঙ্ঘনীয় নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কোন উদ্দেশ্যে কী করতে বলেন তা অনুধাবন করাই ভক্তের কাজ।

স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন। কথা হল, যাঁর উত্তরাধিকারী আছে অর্থাৎ পুত্র-কন্যা এবং সন্তানবৎ কেউ তিনি স্বস্ত্যয়নীর সঞ্চিত অর্থ তাকে বা তাদের হাতে অর্পণ করে যেতে পারেন। কিংবা নিজের জীবৎকালেই স্বস্ত্যয়নীর

উদ্বৃত্ত অর্থ চাষের জমি, খামার বা সরকারী ঋণপত্র ইত্যাদিতে লগ্নী করে উত্তরাধিকারীকে তা রক্ষণাবেক্ষণ ও যথোচিত ইষ্টমুখী ব্যবহারের জন্য দিয়ে যেতে পারেন। যাঁর উত্তরাধিকারী নেই তিনি তাঁর স্বস্ত্যয়নীর ভার উপযুক্ত, বিশ্বস্ত ইষ্টভ্রাতা বা আশ্রমের হাতে দিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু এটা অপরাগ ক্ষেত্রেই করা যেতে পারে। উপায় থাকলে কিন্তু স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত অর্থ শুধু দায় এড়ানোর জন্য মন্দির প্রকল্পে দিয়ে দেওয়া উচিত নয়। তাতে স্বস্ত্যয়নীর অভীষ্ট ফল লাভ করা যাবে না।

॥ কাছের ঠাকুর ॥

ঠাকুরের কথা, ঈশ্বরের কথা, পরম পিতার কথা, ধর্মের কথা বুঝবার জন্য সকলের জীবনেই দুঃখ, সংকট বা সমস্যার একটা পটভূমি বোধ হয় দরকার। বাস্তবপক্ষে মানুষ এমনিতে যেমন বা যতটাই ঈশ্বর-বিশ্বাসের ভাবে ভাবিত হোক না কেন সংকট বা সমস্যা এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে যেমনভাবে তাঁকে খোঁজে তেমন সুখের সময়ে নয়। আর দুঃখ হল ঈশ্বর-বিশ্বাসের একটা পরীক্ষাও। এর ভিতর দিয়েই তাঁর সকাশে যাওয়া সহজতর হয়। ঋণমুক্ত হওয়া যায় নানা প্রবৃত্তির অভিভূতি থেকে, আর প্রবৃত্তি বা রিপুগুলিকে চেনাও যায় সহজে।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সম্পর্কে যখনই কিছু লেখার জন্য লেখনী ধারণ করার কথা ভেবেছি তখনই এক দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব এসে আমাকে আন্দোলিত করেছে। থেকে গেছি। মনে হয়েছে, আমি বোধ হয় পেরে উঠব না! পেরে উঠব না, কারণ এঁর জীবন আরও আরও পূর্বতন মহাপুরুষদের মতো সহজ ও সরল ভক্তিরসাশ্রয়ী নয়। ইনি সনাতন আর্য হিন্দু ধর্মের শক্ত ভিতের ওপরেই মনুষ্য সমাজকে দাঁড় করাতে চান বটে, কিন্তু ওঁর ধর্মাচরণ এত বেশি আচরণ-সাপেক্ষ এবং এত সূক্ষ্ম ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, এঁর দর্শন, সাহিত্য কাব্য এতই গভীর ও নতুন যে সহজ বুদ্ধিতে এঁর পরিমাপ করতে গেলে ঠিক থৈ পাওয়া যায় না। যা তিনি বলেছেন তা সারাটি জীবন ধরে নিজে কাঁটায় কাঁটায় অনুসরণ করেছেন, কোথাও কোনও খেলাপ নেই। কখনও কারও সঙ্গে আপস-রফায় যাননি, একটা জীবন তিনি কখনও নিজের বলা কথার উল্টোটি বলেননি, নিজের দেওয়া উপদেশের বিরুদ্ধে চলেননি। আচরণশীলতা, চর্চা, অভ্যাসের ভিতর দিয়ে ধর্মাচরণকে তিনি ফলিত ও জীবনমুখী করে দেখিয়ে গেছেন, ধর্ম প্রকৃতপক্ষে কল্পনাবিলাস, অহেতুক কৃপা বা ঈশ্বরের কৃপণ দানপ্রাপ্তি নয়। ধর্ম মানুষকে উচ্ছল, অনাসক্ত, অনলস, উজ্জ্বল, দক্ষ ও সফল করে যদি তুলতেই না পারে তবে ধর্মের আর কোনও উদ্দেশ্য দিয়ে আমাদের কাজ নেই।

ধর্ম কথার অর্থ যা ধারণ করে থাকে। অর্থাৎ মানুষের জীবনকে যা ধারণ করে এবং তার বৃদ্ধিকে যা অবাধ করে। মানুষের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য কিছু না কিছু থাকবেই। ধর্ম তার এই বৈশিষ্ট্যগুলিকেই ফুটিয়ে তোলে। দীক্ষা অর্থে দক্ষতা। মানুষ তার স্ববৈশিষ্ট্যে দক্ষ হয়ে উঠে নিজে যখন সার্থক হয় এবং অপরকে সার্থক করে তোলে তখনই প্রকৃত ধর্মাচরণ হল। বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, ত্যাগ, সাধনা, ব্রহ্মচর্য এসব যদি নিজের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তা শুকনো আয়াসে পরিণত হয়। যদি মানুষের প্রকৃতিদত্ত বৃত্তি ও প্রবৃত্তিগুলিকে জীবনমুখী করে নিয়োগ করা যায় তাহলে সন্ন্যাস ব্রহ্মচর্য আপনিই আসে।

ঠাকুরের কাছে যাওয়ার আগে ঈশ্বরবিশ্বাস বলে আমার কিছুই তেমন ছিল না। গুরুবাদের তীব্র বিরোধীও ছিলাম আর বিশেষ করে বিরাগ ছিল ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের প্রতি। নানা গুজব ও রটনা তো ছিলই তাঁর সম্পর্কে।

কিন্তু জীবনের এক দুর্বহ দুঃখের দিনে পাকেচক্রে যখন তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলাম তখন তিনি ঈশ্বর না গুরু না অবতার তা কিছুই বুঝিনি, কিন্তু এক লহমায় তাঁকে আমার আপন বলে মনে হয়েছিল।

এই 'আপনজন' বলে মনে হওয়াটাই এমন এক অলৌকিক বোধ যা সহজে বোঝা যায় বটে, কিন্তু বহু বাক্য দিয়েও কিছুতেই বোঝানো যায় না।

আমরা কয়েক বন্ধু তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। প্রসূন মিত্র, শশাঙ্ক সরকার, চন্দন মজুমদার, মুকুল গুহ এবং আমি। শশাঙ্ক সরকার ঠাকুরের শিষ্য ছিল, একটি ইংলিশ মিডিয়াম মিশনারি স্কুলে চাকরি করে। লম্বা, লকলকে, সুদর্শন এই যুবকটিও জীবনে এক প্রবল ধাক্কা খেয়ে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল একদা। এই ঘটনার বেশ কিছুদিন আগে সে দীক্ষা নিয়েছিল বটে, কিন্তু স্বভাবত কিছু খেয়ালী হওয়ায় সে দীক্ষার পর করণীয় কিছুই করত না। বড়লোকের আদুরে ছেলে ছিল সে, তাই স্বভাব কিছুটা উগ্র, কিছুটা অগোছাল। নিক্সো বোর্ডিং ছিল হ্যারিসন রোডের ওপর, আমহার্স্ট স্ট্রিট ক্রসিং-এর কাছে। সেখানে সে থাকত। বাথরুমের পাশে, ছোট্ট ডবল সিটেড ঘরে। আমার সঙ্গে যখন তার পরিচয় তখন সে জীবনের সেই বড় ধাক্কাটা সামলে ঠাকুরকে আঁকড়ে ধরেছে। নিরামিষ খায়, ধ্যান করে।

আমি যখন মানসিক বিপর্যয়ে আক্রান্ত হয়ে ভিতরে ভিতরে জ্বালা যন্ত্রণায় জ্বলে খাক ও ক্ষয় হয়ে যাচ্ছি, যখন আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য পথ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, বুদ্ধিতে দেখা দিচ্ছে নানা ওলটপালট, তখন একদিন শশাঙ্কর ঘরে গিয়ে হানা দিলাম। তার সাদা চাদরপাতা পরিচ্ছন্ন বিছানা, তার পরিষ্কার জামাকাপড়, টেবিলে এবং দেয়ালে ঠাকুরের ছবি—এসবের মধ্যে গিয়ে হঠাৎ কেন যেন ভাল লাগতে লাগল। যতক্ষণ শশাঙ্কর ঘরে থাকতাম ততক্ষণ মনটা বেশ ভাল থাকত। আর শশাঙ্কও বুঝতে পেরেছিল, আমার মানসিক সংকট চলছে। তাই সে বলত, আমার মাস্টারির সময়টুকু বাদ দিয়ে সারাক্ষণ আমি তোমার জন্য এ-ঘরে অপেক্ষা করব। তোমার যখন খুশি এসো, মাঝরাত হলেও দ্বিধা কোরো না।

বাস্তবিকই শশাঙ্ক তখন আমাকে মস্ত এক সহায়তা আর সাহচর্য দিয়েছিল। না দিলে কী যে হত তা ভাবতেও আজ আতঙ্ক হয়।

মৃত্যুচিন্তা, নশ্বরতার চিন্তা মানুষকে যখন পেয়ে বসে তখন ভূতের মতোই পায়। আর তীব্র ওই বিষাদরোগ এমনই সাংঘাতিক যে, শত্রুরও যেন ওই রোগ না হয়, এমন প্রার্থনা স্বতঃই মনে আসে। শশাঙ্কর ঘরে গেলে কিছুক্ষণের জন্য যে ওই

পাষাণভার থেকে আমার মন মুক্ত থাকত সেটা আমি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করতাম। মনে প্রশ্ন হত, তবে কি এ ওর ঠাকুরেরই প্রভাব?

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সম্পর্কে অনেক অপপ্রচার ও রটনা আছে। কতকাল আগে থেকে 'শনিবারের চিঠি' ও অন্যান্য ব্যক্তি এই কাজে ব্রতী হয়েছেন। তাঁদের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত ঠাকুরের বিপক্ষে গেলেও তাঁরা পরেপ্রকারে স্বীকার করেছেন যে, মানুষটি ক্ষমতাবান। ইনি লোককে সম্মোহিত করে রাখেন! তাঁর চারিত্রিক অপবাদও প্রচুর রটিত হয়। আবার যাঁরা স্বচক্ষে ঠাকুরের কীর্তনযুগের লীলা দেখেছেন তাঁরা তাঁর বিরোধী হয়েও সভয়ে তাঁকে এড়িয়ে চলেছেন। আমরাও এসব বিষয়ে সচেতন ছিলাম।

শশাঙ্ক যখন ঠাকুরের কথা একটু আধটু আমাকে বলার চেষ্টা করত তখন কিন্তু আমি তেমন প্রতিবাদ করতাম না। আমি চুপ করে বসে শুনতাম। এবং ঘরের পরিমণ্ডলে একটি মৃদু নিরাময়কারী শান্ত মণ্ডলকে অনুভব করতাম। আমার তাপিত হৃদয় যেন শান্ত হয়ে তার উদ্যত ফণা নামিয়ে নিত।

তিন চার দিন বাদে শশাঙ্ক একদিন বলল, চল, খোদ কর্তার কাছে গিয়ে তোমার মানসিক সংকটের কথা বলবে। দেখ না, কী হয়।

প্রস্তাবটা আমার খুব খারাপ লাগল না। মনে হল, উনি হিপনোটাইজ করলে করুন না। আমার এখন সম্মোহিত থাকারই প্রয়োজন। দুঃসহ দুর্বহ এই বিষাদ আমি আর বইতে পারছি না।

প্রসূন, শশাঙ্ক, মুকুল, চন্দন আর আমি। আমাদের সকলেরই বয়স তখন ত্রিশের এদিক বা ওদিক। আমার নিজের বয়স তখন উনত্রিশ। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারির শেষ বা ফেব্রুয়ারির শুরু। সঠিক তারিখ মনে নেই। রাত্রির ট্রেনে আমরা পাঁচজন হৈ হৈ করে চেপে বসলাম। গল্পগুজবেই পথটা প্রায় কেটে গেল। যশিডি মোটে ছয় ঘণ্টার রাস্তা। ঢুলতে ঢুলতে যখন ভোর রাত্রে 'যশিডি' 'যশিডি' চিৎকার শুনে হুড়মুড় করে নামলাম তখন কনকনে শীত।

যশিডি থেকে সৎসঙ্গ আশ্রম মাইল পাঁচেকের পথ। স্টেশনে ভাঁড়ে গরম চা খেয়ে টাঙ্গায় চেপে রওনা দেওয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই জুড়িয়ে গেল দুটি চোখ আর বুক। কোন এক রহস্যময় অলৌকিক পুরুষের সন্নিধানে চলেছি আমরা, কিন্তু যাওয়ার পথের প্রাকৃতিক শোভাও যে অনুপম। ছোট ছোট টিলা, আদিগন্ত উচ্চাবচ প্রান্তর আর লালমাটির এই দেশটির প্রেমে পড়ে যেতে হয় প্রথম দর্শনেই। প্রাকৃতিক শোভা আশৈশব আমি বড় কম দেখিনী কিন্তু দেওঘরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাকে আজও যত সম্মোহিত করে তত আর কোনও জায়গা নয়।

পথে যেতে যেতে পাঁচ জনে মিলে নানা রঙ্গ-রসিকতা আর ঠাট্টা ইয়ার্কি হচ্ছিল।

নেই। শবধ্যানের জন্য একটু শক্ত জায়গা দরকার। মেঝেতে শতরঞ্চী বা মাদুর পেতে তার ওপর টান টান ভাবে চিৎ হয়ে শুতে হয়। দু পায়ের গোড়ালি যেন এক সঙ্গে থাকে, আর হাত দুখানা শরীরের সঙ্গে লেগে প্রলম্বিত থাকবে। মাথার পিছন দিকে—যেখানে মেডুলা ওবলংগাটা রয়েছে সেইখানে ঠাকুরের মূর্তি কল্পনা করে নামজপ করতে হবে। শবধ্যানের সময় শরীর ঢিলা রাখতে হয়, শ্লথ রাখতে হয়। এই ধ্যান পাঁচ থেকে সাত মিনিট করলেই যথেষ্ট। দিনের মধ্যে তিন চারবার করতে হয়।

নাম : মনে রাখতে হবে ভরপেট খাওয়ার পরে কোনও ধ্যানই করতে নেই। তাতে হজমের অসুবিধে হয়। তবে নাম সবসময়েই চলবে।, নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মতো। নামে কোনও বিরাম দিতে নেই। নাম করতে করতে কিছুদিনের মধ্যেই চব্বিশ ঘণ্টাই ইষ্টমূর্তি ধ্যান হতে থাকে। ঠাকুর বলেছেন সব কাজের মধ্যেই নামের চাকা ঘুরবে। এমন কি মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময়েও। তিনি আমাদের এই আশ্বাস দিয়ে রেখেছেন, নাম অবিরল করে গেলে চিন্তাশক্তির লাঘব হবে, কিন্তু কাজের ব্যাঘাত হবে না। এসব কেবল তাঁর কথার কথা নয়, ঠাকুরের দেওয়া জিনিষ নিজে হাতে-কলমে করে উপলব্ধিতে পৌঁছোতে হয়। আর তখনই আসে বিশ্বাস।

আহার : আহার সম্পর্কে ঠাকুর যা বলেছেন তা যেমন জীবনীয় ও আয়ুবর্ধক তেমনই মেধা ও মনঃসংযোগের সহায়ক। ঠাকুর বলেছেন মাছ-মাংস-ডিম-পেঁয়াজ রসুন ইত্যাদি খেলে দেহে অপ্রয়োজনীয় বিক্ষেপ ঘটে এবং মনও তাতে সংক্রামিত হয়। আমিষ আহার শরীরে টকসিন বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে আদি ব্যাধির উৎপাত বাড়ে।

থানকুনি পাতা : প্রতিদিন সকালে ইষ্টভৃতি ও জপধ্যানের পর প্রতিটি সৎসঙ্গীকেই একটি করে থানকুনি পাতা ডাঁটি সহ ভাল করে চিবিয়ে খেয়ে বেশি করে জল খেতে হবে। থানকুনির সঙ্গে একটুখানি আখিগুড় ও সামান্য দুধ খেলে আরও ভাল। চিবোতে অশক্ত হলে থানকুনি থেঁতো করে রস খাওয়া যেতে পারে। বছরের সবসময়ে থানকুনি পাওয়া যায় না বলে থানকুনি পাতা ধুয়ে ছায়ায় শুকিয়ে রাখলে তাও খাওয়া চলবে। নিতান্তই থানকুনি দুর্লভ হয়ে পড়লে তার বদলে তুলসীপাতা খেলেও হয়। শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেছেন, থানকুনি শরীরের অতিরিক্ত টকসিন কমায় ও ঘামের সঙ্গে বের করে দেয়। ফলে শরীর সুস্থ থাকে। থানকুনির ব্যাপারে প্রতি সৎসঙ্গীকেই সচেতন হতে হবে। আজকাল থানকুনির ট্যাবলেট তৈরি হচ্ছে।

অভাবে ওই ট্যাবলেট খাওয়া ভাল। তবে টাটকা থানকুনিই সর্বোত্তম। ঠাকুরের বলা আছে, থানকুনি ও জল খাওয়ার পর একটু প্রাতঃভ্রমণ করা ভাল।

প্রার্থনা : প্রতিদিন সকালে ইষ্টভৃতি ও জপধ্যানের পর এবং সন্ধ্যায় বিনতি প্রার্থনা করা একান্তই প্রয়োজন।

পূর্ণাঙ্গ বিনতি প্রার্থনার মধ্যে ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য ও মহিমা অতি উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে। ঠাকুর বার বার পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চি পালনের কথা বলেছেন। পূর্ণাঙ্গ বিনতি প্রার্থনার মধ্যে পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চি রয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সারা জীবন ধরে নানা প্রসঙ্গে ওই আহ্বানী সহ পূর্ণাঙ্গ বিনতি প্রার্থনাই করতে বলেছেন। তাছাড়া বিনতি ঝড়ের বেগে, আবেগহীন যান্ত্রিকভাবে করলে ফলপ্রসূ হয় না। বরং একটু ধীর লয়ে, অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে, ভক্তির সঙ্গে প্রার্থনা করলে মন শান্ত ও আপ্লুত হয়। বিনতি প্রার্থনার অনেকটা অংশই শ্রীশ্রীঠাকুরের বলে দেওয়া এবং তাঁরই নির্দেশে তাঁর বিশিষ্ট ভক্তের দ্বারা বিরচিত। আহ্বানী সহ পূর্ণাঙ্গ বিনতি প্রার্থনা আমাদের শ্রীশ্রী ঠাকুরের ভাবধারায় অভিষিক্ত করে। বিনতির পর শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থটি থেকে কিছু অংশ পাঠ ও তা হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। ঠাকুর সমবেত বিনতি প্রার্থনা পছন্দ করতেন। এজন্যই বলেছেন, অন্তত একবেলা যেন সমবেতভাবে বিনতি প্রার্থনা করার চেষ্টা আমরা করি। সমবেত ভাবে না পারলে এককভাবে করতে হবে, আর এই জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের গ্রন্থাবলী নিত্য পাঠ, নিত্য আলোচনা এবং চিন্তা ও অনুশীলন প্রতিটি ভক্ত শিষ্যেরই অস্খলিতভাবে করা উচিত। নইলে ঠাকুরকে অন্তরে জাগ্রত করে রাখা সম্ভব নয়। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর বাণীগুলি সম্পর্কে আমাদের খুব সচেতন থাকতে বলেছেন। সযত্নে ও অতি সতর্কতার সঙ্গে এই বাণী সমূহ সংরক্ষণ করা ভাবী মানবসমাজের পরম কল্যাণের জন্যই প্রয়োজন।

ঠাকুর পরিবার : শ্রীশ্রী ঠাকুর পরিবার বলতে বোঝায় তাঁর তিন পুত্র, তিন কন্যা এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের। এঁদের সকলের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল থাকা ভক্তদের একান্ত কর্তব্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের সব সন্তানই তাঁর। কাউকেই খাটো করা চলবে না। সকলেরই ভাল মন্দের দিকে শিষ্যদের নজর রাখা কর্তব্য।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের নানা বয়সের নানা ধরনের ছবি সংগ্রহ করে রাখতে হয়। ধ্যানের সময় যে ছবিটি যখন ভাবতে ইচ্ছে করবে সেইটেই ভাবা যায়। ধ্যানে শুধু তাঁর মুখশ্রী দেখাই ধ্যান নয়। তাঁর কথা, বাণী তাঁর নির্দেশিত কাজ ইত্যাদির কথাও ধ্যান করতে হয়। এবং তারপর ওইসব চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলে

তবেই ধ্যানের ফল আমরা লাভ করব।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের মূর্তি ও ছবির প্রসঙ্গে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দিল্লী থেকে শুরু করে আসাম, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা বিভিন্ন জায়গায় শ্রীশ্রীঠাকুরের শতাধিক মন্দির তৈরি হয়েছে। বেশির ভাগ মন্দিরেই শ্রীশ্রীঠাকুরেরর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় মূর্তি সমূহে ঠাকুরের চেহারা বা ভাবের যথোচিত প্রতিফলন ঘটছে না। ঠাকুরের মুখাবয়বের কিছু বিশিষ্টতা আছে। সামনে থেকে ও পাশ থেকে তাঁর বিভিন্ন ছবি বারবার স্টাডি না করলে তাঁর মূর্তি করা খুব কঠিন কাজ, এবং সে কাজ করতে হলে অতি দক্ষ ভাস্করের প্রয়োজন। আমাদের দেশে ভাস্কর্যের ট্রাডিশন তেমন উজ্জ্বল নয়। ভাল ভাস্কর পাওয়া দুষ্কর। তাই আমার মতো আরও অনেকের বিশ্বাস, খুব উচুঁদরের প্রতিভাবান এবং ভগবৎপ্রাণ ভাস্কর ছাড়া ঠাকুরের মূর্তি করা সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে মূর্তি প্রতিষ্ঠা না করে ঠাকুরের আলোকচিত্র বা তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। সুখের কথা আমাদের দেশে ভাস্করের অভাব থাকলেও চিত্রকরের অভাব নেই। কিন্তু চিত্রকরের হওয়া চাই প্রথম শ্রেণীর। নইলে ঠাকুরের ছবিতেও আকাঙ্খিত মাত্রা সংযোজিত হবে না। এ বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করার সময় এসে গেছে।

ইসকনে ভক্তিবেদান্তস্বামীর যে সব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে সেগুলি কেমন জীবন্ত, প্রাণবন্ত! জয়রামবাটিতে মা সারদার মর্মরমূর্তি কী অনবদ্য। যারা সেগুলি রচনা করেছেন তাঁদেরও তো বরাত দেওয়া যায়!

ঠাকুরের ছবি বা মূর্তি শ্রীশ্রী ঠাকুরের মুখশ্রী ও ভাবকে নিখুঁতভাবে প্রকাশ করবে, ভক্তরা তো এইটেই চায়। যেহেতু তিনি এখন দেহে নেই সেই কারণেই তাঁর ছবি ও মূর্তির গুরুত্ব এখন অপরিসীম। সুতরাং এই কাজটি অতি সতর্কতার সঙ্গে, অতি যত্নে ও প্রখর তদারকিতে হওয়া উচিত। যে সব মূর্তি ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলি অপসারিত করে সেই জায়গায় নিদেনপক্ষে ঠাকুরের ব্লোআপ করা ফটো রাখা প্রয়োজন।

কোথাও কেউ ঠাকুরের নাম করে কোনও উদ্ধৃতি দিলে বা উদ্ধৃতি সহ কিছু লিখলে সেটি যাচাই না করে গ্রহণ করা কদাচ উচিত নয়। শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন মানুষের পরম উদ্ধাতা, তেমনি আবার কিছু মতলববাজ মানুষের তাঁকে ভাঙানোর সম্ভাবনাও প্রবল। মহাপুরুষদের নিয়ে ব্যবসাও বিরল কিছু নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ঋত্বিকদের দেবতা আখ্যা দিয়ে গেছেন। তাঁর ঋত্বিকরা যদি প্রকৃত ঋত্বিকোচিত চলনায় নিজেদের অভ্যস্ত করে তুলতে পারেন তাহলে বিনা আয়াসেই তাঁরা মানুষের চোখে দেবোপম হয়ে উঠবেন। ঠাকুর ঋত্বিকদের চালনা করতেন তাঁর অফুরাণ ভালবাসা আর মমত্ব দিয়ে। ঋত্বিকরা তখন তাঁর প্রতিষ্ঠাকল্পে হাসিমুখে অনেক কঠিন পরিস্থিতি জয় করেছেন। এখনও ঋত্বিকরা তা পারেন যদি তাঁরা তন্নিষ্ঠ থাকেন। নিষ্ঠা ও ভক্তিতে দ্বিচারিতা ঢুকে পড়লেই কিন্তু সর্বনাশ। ঠাকুরের ঋত্বিকরা যদি ভ্রষ্ট হন তবে তাঁর আন্দোলনটিও যে থমকে যাবে।

দীক্ষা দান এক অতি পবিত্র কাজ। দীক্ষা দেওয়ার সময়ে ঋত্বিক অনবরত হৃদয়ে ঠাকুরকে ধরে রাখবেন। দীক্ষা তো ঠাকুরই দেন, ঋত্বিক প্রতিনিধি মাত্র। দীক্ষা দান করতে হয় অতীব নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে। সব কিছু ভাল করে অল্প সময়ে সহজ ভাষায় যজমানকে বুঝিয়ে দিতে হয়। অনেক সময়ে বারবার বোঝাতে হয়। ধৈর্য হারালে চলে না। দীক্ষার কোনও অঙ্গই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আচমন থেকে শুরু করে ইষ্টভৃতি অবধি কোনওটাই উপেক্ষার বিষয় নয়। ঠিকমতো দীক্ষা হলে ঋত্বিক তা নিজের শরীর ও মন দিয়েই বুঝতে পারবেন।

দয়াল ঠাকুর প্রবর্তিত স্বস্ত্যয়নী ব্রতর কথা আগেও বলেছি। স্বস্ত্যয়নী ব্রত ধারণ করে প্রতিদিন অর্ঘ রাখার পর মাসান্তে অর্থাৎ ত্রিশ দিনের দিন তিনটি টাকা শ্রীশ্রী ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে টাকা জমা রাখতে হয়। কারণ, ঠাকুর স্বস্ত্যয়নী ব্রতকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। কতবার কত প্রসঙ্গে যে ঠাকুর স্বস্ত্যয়নী ঠিকমতো পালনের নির্দেশ দিয়েছেন তার হিসেব নেই। Divine economy বলে কতবার উল্লেখ করেছেন। স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত অর্থে কেনা জমিতে যে একদিন সারাদেশ ভরে যাবে এমন আশাও প্রকাশ করেছেন। শুধু অর্থই নয়, স্বস্ত্যয়নী অন্যান্য নীতিও অবশ্য পালনীয়। এই ব্রত যে মানুষের জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদকে কতখানি ফলিত ও প্রত্যক্ষ করে তোলে তা যথার্থ ব্রতধারী বুঝতে পারবেই। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বস্ত্যয়নী ব্রত সম্পর্কে যা বলেছেন ঠিক ঠিক তা পালন করার মধ্যেই মানুষের পরম মঙ্গল নিহিত রয়েছে। এই ব্রতর কোনও অঙ্গই লঙ্ঘনীয় নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কোন উদ্দেশ্যে কী করতে বলেন তা অনুধাবন করাই ভক্তের কাজ।

স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন। কথা হল, যাঁর উত্তরাধিকারী আছে অর্থাৎ পুত্র-কন্যা এবং সন্তানবৎ কেউ তিনি স্বস্ত্যয়নীর সঞ্চিত অর্থ তাকে বা তাদের হাতে অর্পণ করে যেতে পারেন। কিংবা নিজের জীবৎকালেই স্বস্ত্যয়নীর

উদ্বৃত্ত অর্থ চাষের জমি, খামার বা সরকারী ঋণপত্র ইত্যাদিতে লগ্নী করে উত্তরাধিকারীকে তা রক্ষণাবেক্ষণ ও যথোচিত ইষ্টমুখী ব্যবহারের জন্য দিয়ে যেতে পারেন। যাঁর উত্তরাধিকারী নেই তিনি তাঁর স্বস্ত্যয়নীর ভার উপযুক্ত, বিশ্বস্ত ইষ্টভ্রাতা বা আশ্রমের হাতে দিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু এটা অপরাগ ক্ষেত্রেই করা যেতে পারে। উপায় থাকলে কিন্তু স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত অর্থ শুধু দায় এড়ানোর জন্য মন্দির প্রকল্পে দিয়ে দেওয়া উচিত নয়। তাতে স্বস্ত্যয়নীর অভীষ্ট ফল লাভ করা যাবে না।

॥ কাছের ঠাকুর ॥

ঠাকুরের কথা, ঈশ্বরের কথা, পরম পিতার কথা, ধর্মের কথা বুঝবার জন্য সকলের জীবনেই দুঃখ, সংকট বা সমস্যার একটা পটভূমি বোধ হয় দরকার। বাস্তবপক্ষে মানুষ এমনিতে যেমন বা যতটাই ঈশ্বর-বিশ্বাসের ভাবে ভাবিত হোক না কেন সংকট বা সমস্যা এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে যেমনভাবে তাঁকে খোঁজে তেমন সুখের সময়ে নয়। আর দুঃখ হল ঈশ্বর-বিশ্বাসের একটা পরীক্ষাও। এর ভিতর দিয়েই তাঁর সকাশে যাওয়া সহজতর হয়। ঋণমুক্ত হওয়া যায় নানা প্রবৃত্তির অভিভূতি থেকে, আর প্রবৃত্তি বা রিপুগুলিকে চেনাও যায় সহজে।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সম্পর্কে যখনই কিছু লেখার জন্য লেখনী ধারণ করার কথা ভেবেছি তখনই এক দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব এসে আমাকে আন্দোলিত করেছে। থেকে গেছি। মনে হয়েছে, আমি বোধ হয় পেরে উঠব না: পেরে উঠব না, কারণ এঁর জীবন আরও আরও পূর্বতন মহাপুরুষদের মতো সহজ ও সরল ভক্তিরসাশ্রয়ী নয়। ইনি সনাতন আর্য হিন্দু ধর্মের শক্ত ভিতের ওপরেই মনুষ্য সমাজকে দাঁড় করাতে চান বটে, কিন্তু ওঁর ধর্মাচরণ এত বেশি আচরণ-সাপেক্ষ এবং এত সূক্ষ্ম ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, এঁর দর্শন, সাহিত্য কাব্য এতই গভীর ও নতুন যে সহজ বুদ্ধিতে এঁর পরিমাপ করতে গেলে ঠিক থৈ পাওয়া যায় না। যা তিনি বলেছেন তা সারাটি জীবন ধরে নিজে কাঁটায় কাঁটায় অনুসরণ করেছেন, কোথাও কোনও খেলাপ নেই। কখনও কারও সঙ্গে আপস-রফায় যাননি, একটা জীবন তিনি কখনও নিজের বলা কথার উল্টোটি বলেননি, নিজের দেওয়া উপদেশের বিরুদ্ধে চলেননি। আচরণশীলতা, চর্চা, অভ্যাসের ভিতর দিয়ে ধর্মাচরণকে তিনি ফলিত ও জীবনমুখী করে দেখিয়ে গেছেন, ধর্ম প্রকৃতপক্ষে কল্পনাবিলাস, অহেতুক কৃপা বা ঈশ্বরের কৃপণ দানপ্রাপ্তি নয়। ধর্ম মানুষকে উচ্ছল, অনাসক্ত, অনলস, উজ্জ্বল, দক্ষ ও সফল করে যদি তুলতেই না পারে তবে ধর্মের আর কোনও উদ্দেশ্য দিয়ে আমাদের কাজ নেই।

ধর্ম কথার অর্থ যা ধারণ করে থাকে।-অর্থাৎ মানুষের জীবনকে যা ধারণ করে এবং তার বৃদ্ধিকে যা অবাধ করে। মানুষের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য কিছু না কিছু থাকবেই। ধর্ম তার এই বৈশিষ্ট্যগুলিকেই ফুটিয়ে তোলে। দীক্ষা অর্থে দক্ষতা। মানুষ তার স্ববৈশিষ্ট্যে দক্ষ হয়ে উঠে নিজে যখন সার্থক হয় এবং অপরকে সার্থক করে তোলে তখনই প্রকৃত ধর্মাচরণ হল। বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, ত্যাগ, সাধনা, ব্রহ্মচর্য এসব যদি নিজের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তা শুকনো আয়াসে পরিণত হয়। যদি মানুষের প্রকৃতিদত্ত বৃত্তি ও প্রবৃত্তিগুলিকে জীবনমুখী করে নিয়োগ করা যায় তাহলে সন্ন্যাস ব্রহ্মচর্য আপনিই আসে।

ঠাকুরের কাছে যাওয়ার আগে ঈশ্বরবিশ্বাস বলে আমার কিছুই তেমন ছিল না। গুরুবাদের তীব্র বিরোধীও ছিলাম আর বিশেষ করে বিরাগ ছিল ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের প্রতি। নানা গুজব ও রটনা তো ছিলই তাঁর সম্পর্কে।

কিন্তু জীবনের এক দুর্বহ দুঃখের দিনে পাকেচক্রে যখন তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলাম তখন তিনি ঈশ্বর না গুরু না অবতার তা কিছুই বুঝিনি, কিন্তু এক লহমায় তাঁকে আমার আপন বলে মনে হয়েছিল।

এই 'আপনজন' বলে মনে হওয়াটাই এমন এক অলৌকিক বোধ যা সহজে বোঝা যায় বটে, কিন্তু বহু বাক্য দিয়েও কিছুতেই বোঝানো যায় না।

আমরা কয়েক বন্ধু তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। প্রসূন মিত্র, শশাঙ্ক সরকার, চন্দন মজুমদার, মুকুল গুহ এবং আমি। শশাঙ্ক সরকার ঠাকুরের শিষ্য ছিল, একটি ইংলিশ মিডিয়াম মিশনারি স্কুলে চাকরি করে। লম্বা, লকলকে, সুদর্শন এই যুবকটিও জীবনে এক প্রবল ধাক্কা খেয়ে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল একদা। এই ঘটনার বেশ কিছুদিন আগে সে দীক্ষা নিয়েছিল বটে, কিন্তু স্বভাবত কিছু খেয়ালী হওয়ায় সে দীক্ষার পর করণীয় কিছুই করত না। বড়লোকের আদুরে ছেলে ছিল সে, তাই স্বভাব কিছুটা উগ্র, কিছুটা অগোছাল। নিক্কো বোর্ডিং ছিল হ্যারিসন রোডের ওপর, আমহার্স্ট স্ট্রিট ক্রসিং-এর কাছে। সেখানে সে থাকত। বাথরুমের পাশে, ছোট্ট ডবল সিটেড ঘরে। আমার সঙ্গে যখন তার পরিচয় তখন সে জীবনের সেই বড় ধাক্কাটা সামলে ঠাকুরকে আঁকড়ে ধরেছে। নিরামিষ খায়, ধ্যান করে।

আমি যখন মানসিক বিপর্যয়ে আক্রান্ত হয়ে ভিতরে ভিতরে জ্বালা যন্ত্রণায় জ্বলে খাক ও ক্ষয় হয়ে যাচ্ছি, যখন আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য পথ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, বুদ্ধিতে দেখা দিচ্ছে নানা ওলটপালট, তখন একদিন শশাঙ্কর ঘরে গিয়ে হানা দিলাম। তার সাদা চাদরপাতা পরিচ্ছন্ন বিছানা, তার পরিষ্কার জামাকাপড়, টেবিলে এবং দেয়ালে ঠাকুরের ছবি—এসবের মধ্যে গিয়ে হঠাৎ কেন যেন ভাল লাগতে লাগল। যতক্ষণ শশাঙ্কর ঘরে থাকতাম ততক্ষণ মনটা বেশ ভাল থাকত। আর শশাঙ্কও বুঝতে পেরেছিল, আমার মানসিক সংকট চলছে। তাই সে বলত, আমার মাস্টারির সময়টুকু বাদ দিয়ে সারাক্ষণ আমি তোমার জন্য এ-ঘরে অপেক্ষা করব। তোমার যখন খুশি এসো, মাঝরাত হলেও দ্বিধা কোরো না।

বাস্তবিকই শশাঙ্ক তখন আমাকে মস্ত এক সহায়তা আর সাহচর্য দিয়েছিল। না দিলে কী যে হত তা ভাবতেও আজ আতঙ্ক হয়।

মৃত্যুচিন্তা, নশ্বরতার চিন্তা মানুষকে যখন পেয়ে বসে তখন ভূতের মতোই পায়। আর তীব্র ওই বিষাদরোগ এমনই সাংঘাতিক যে, শত্রুরও যেন ওই রোগ না হয়, এমন প্রার্থনা স্বতই মনে আসে। শশাঙ্কর ঘরে গেলে কিছুক্ষণের জন্য যে ওই

পাষাণভার থেকে আমার মন মুক্ত থাকত সেটা আমি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করতাম। মনে প্রশ্ন হত, তবে কি এ ওর ঠাকুরেরই প্রভাব?

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সম্পর্কে অনেক অপপ্রচার ও রটনা আছে। কতকাল আগে থেকে 'শনিবারের চিঠি' ও অন্যান্য ব্যক্তি এই কাজে ব্রতী হয়েছেন। তাঁদের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত ঠাকুরের বিপক্ষে গেলেও তাঁরা পরেপ্রকারে স্বীকার করেছেন যে, মানুষটি ক্ষমতাবান। ইনি লোককে সম্মোহিত করে রাখেন! তাঁর চারিত্রিক অপবাদও প্রচুর রটিত হয়। আবার যাঁরা স্বচক্ষে ঠাকুরের কীর্তনযুগের লীলা দেখেছেন তাঁরা তাঁর বিরোধী হয়েও সভয়ে তাঁকে এড়িয়ে চলেছেন। আমরাও এসব বিষয়ে সচেতন ছিলাম।

শশাঙ্ক যখন ঠাকুরের কথা একটু আধটু আমাকে বলার চেষ্টা করত তখন কিন্তু আমি তেমন প্রতিবাদ করতাম না। আমি চুপ করে বসে শুনতাম। এবং ঘরের পরিমণ্ডলে একটি মৃদু নিরাময়কারী শান্ত মণ্ডলকে অনুভব করতাম। আমার তাপিত হৃদয় যেন শান্ত হয়ে তার উদ্যত ফণা নামিয়ে নিত।

তিন চার দিন বাদে শশাঙ্ক একদিন বলল, চল, খোদ কর্তার কাছে গিয়ে তোমার মানসিক সংকটের কথা বলবে। দেখ না, কী হয়।

প্রস্তাবটা আমার খুব খারাপ লাগল না। মনে হল, উনি হিপনোটাইজ করলে করুন না। আমার এখন সম্মোহিত থাকারই প্রয়োজন। দুঃসহ দুর্বহ এই বিষাদ আমি আর বইতে পারছি না।

প্রসূন, শশাঙ্ক, মুকুল, চন্দন আর আমি। আমাদের সকলেরই বয়স তখন ত্রিশের এদিক বা ওদিক। আমার নিজের বয়স তখন উনত্রিশ। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারির শেষ বা ফেব্রুয়ারির শুরু। সঠিক তারিখ মনে নেই। রাত্রির ট্রেনে আমরা পাঁচজন হৈ হৈ করে চেপে বসলাম। গল্পগুজবেই পথটা প্রায় কেটে গেল। যশিডি মোটে ছয় ঘণ্টার রাস্তা। ঢুলতে ঢুলতে যখন ভোর রাত্রে 'যশিডি' 'যশিডি' চিৎকার শুনে হুড়মুড় করে নামলাম তখন কনকনে শীত।

যশিডি থেকে সৎসঙ্গ আশ্রম মাইল পাঁচেকের পথ। স্টেশনে ভাঁড়ে গরম চা খেয়ে টাঙ্গায় চেপে রওনা দেওয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই জুড়িয়ে গেল দুটি চোখ আর বুক। কোন এক রহস্যময় অলৌকিক পুরুষের সন্নিধানে চলেছি আমরা, কিন্তু যাওয়ার পথের প্রাকৃতিক শোভাও যে অনুপম। ছোট ছোট টিলা, আদিগন্ত উচ্চাবচ প্রান্তর আর লালমাটির এই দেশটির প্রেমে পড়ে যেতে হয় প্রথম দর্শনেই। প্রাকৃতিক শোভা আশৈশব আমি বড় কম দেখিনী কিন্তু দেওঘরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাকে আজও যত সম্মোহিত করে তত আর কোনও জায়গা নয়।

পথে যেতে যেতে পাঁচ জনে মিলে নানা রঙ্গ-রসিকতা আর ঠাট্টা ইয়ার্কি হচ্ছিল।

নেই। শবধ্যানের জন্য একটু শক্ত জায়গা দরকার। মেঝেতে শতরঞ্চী বা মাদুর পেতে তার ওপর টান টান ভাবে চিৎ হয়ে শুতে হয়। দু পায়ের গোড়ালি যেন এক সঙ্গে থাকে, আর হাত দুখানা শরীরের সঙ্গে লেগে প্রলম্বিত থাকবে। মাথার পিছন দিকে—যেখানে মেডুলা ওবলংগাটা রয়েছে সেইখানে ঠাকুরের মূর্তি কল্পনা করে নামজপ করতে হবে। শবধ্যানের সময় শরীর ঢিলা রাখতে হয়, শ্লথ রাখতে হয়। এই ধ্যান পাঁচ থেকে সাত মিনিট করলেই যথেষ্ট। দিনের মধ্যে তিন চারবার করতে হয়।

নাম : মনে রাখতে হবে ভরপেট খাওয়ার পরে কোনও ধ্যানই করতে নেই। তাতে হজমের অসুবিধে হয়। তবে নাম সবসময়েই চলবে।, নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মতো। নামে কোনও বিরাম দিতে নেই। নাম করতে করতে কিছুদিনের মধ্যেই চব্বিশ ঘণ্টাই ইষ্টমূর্তি ধ্যান হতে থাকে। ঠাকুর বলেছেন সব কাজের মধ্যেই নামের চাকা ঘুরবে। এমন কি মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময়েও। তিনি আমাদের এই আশ্বাস দিয়ে রেখেছেন, নাম অবিরল করে গেলে চিন্তাশক্তির লাঘব হবে, কিন্তু কাজের ব্যাঘাত হবে না। এসব কেবল তাঁর কথার কথা নয়, ঠাকুরের দেওয়া জিনিষ নিজে হাতে-কলমে করে উপলব্ধিতে পৌঁছোতে হয়। আর তখনই আসে বিশ্বাস।

আহার : আহার সম্পর্কে ঠাকুর যা বলেছেন তা যেমন জীবনীয় ও আয়ুবর্ধক তেমনই মেধা ও মনঃসংযোগের সহায়ক। ঠাকুর বলেছেন মাছ-মাংস-ডিম-পেঁয়াজ রসুন ইত্যাদি খেলে দেহে অপ্রয়োজনীয় বিক্ষেপ ঘটে এবং মনও তাতে সংক্রামিত হয়। আমিষ আহার শরীরে টক্সিন বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে আদি ব্যাধির উৎপাত বাড়ে।

থানকুনি পাতা : প্রতিদিন সকালে ইষ্টভৃতি ও জপধ্যানের পর প্রতিটি সৎসঙ্গীকেই একটি করে থানকুনি পাতা ডাঁটি সহ ভাল করে চিবিয়ে খেয়ে বেশি করে জল খেতে হবে। থানকুনির সঙ্গে একটুখানি আখিগুড় ও সামান্য দুধ খেলে আরও ভাল। চিবোতে অশক্ত হলে থানকুনি থেঁতো করে রস খাওয়া যেতে পারে। বছরের সবসময়ে থানকুনি পাওয়া যায় না বলে থানকুনি পাতা ধুয়ে ছায়ায় শুকিয়ে রাখলে তাও খাওয়া চলবে। নিতান্তই থানকুনি দুর্লভ হয়ে পড়লে তার বদলে তুলসীপাতা খেলেও হয়। শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেছেন, থানকুনি শরীরের অতিরিক্ত টকসিন কমায় ও ঘামের সঙ্গে বের করে দেয়। ফলে শরীর সুস্থ থাকে। থানকুনির ব্যাপারে প্রতি সৎসঙ্গীকেই সচেতন হতে হবে। আজকাল থানকুনির ট্যাবলেট তৈরি হচ্ছে।

অভাবে ওই ট্যাবলেট খাওয়া ভাল। তবে টাটকা থানকুনিই সর্বোত্তম। ঠাকুরের বলা আছে, থানকুনি ও জল খাওয়ার পর একটু প্রাতঃভ্রমণ করা ভাল।

প্রার্থনা : প্রতিদিন সকালে ইষ্টভৃতি ও জপধ্যানের পর এবং সন্ধ্যায় বিনতি প্রার্থনা করা একান্তই প্রয়োজন।

পূর্ণাঙ্গ বিনতি প্রার্থনার মধ্যে ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য ও মহিমা অতি উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে। ঠাকুর বার বার পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চি পালনের কথা বলেছেন। পূর্ণাঙ্গ বিনতি প্রার্থনার মধ্যে পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চি রয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সারা জীবন ধরে নানা প্রসঙ্গে ওই আহ্বানী সহ পূর্ণাঙ্গ বিনতি প্রার্থনাই করতে বলেছেন। তাছাড়া বিনতি ঝড়ের বেগে, আবেগহীন যান্ত্রিকভাবে করলে ফলপ্রসূ হয় না। বরং একটু ধীর লয়ে, অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে, ভক্তির সঙ্গে প্রার্থনা করলে মন শান্ত ও আপ্লুত হয়। বিনতি প্রার্থনার অনেকটা অংশই শ্রীশ্রীঠাকুরের বলে দেওয়া এবং তাঁরই নির্দেশে তাঁর বিশিষ্ট ভক্তের দ্বারা বিরচিত। আহ্বানী সহ পূর্ণাঙ্গ বিনতি প্রার্থনা আমাদের শ্রীশ্রী ঠাকুরের ভাবধারায় অভিষিক্ত করে। বিনতির পর শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থটি থেকে কিছু অংশ পাঠ ও তা হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। ঠাকুর সমবেত বিনতি প্রার্থনা পছন্দ করতেন। এজন্যই বলেছেন, অন্তত একবেলা যেন সমবেতভাবে বিনতি প্রার্থনা করার চেষ্টা আমরা করি। সমবেত ভাবে না পারলে এককভাবে করতে হবে, আর এই জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের গ্রন্থাবলী নিত্য পাঠ, নিত্য আলোচনা এবং চিন্তা ও অনুশীলন প্রতিটি ভক্ত শিষ্যেরই অস্খলিতভাবে করা উচিত। নইলে ঠাকুরকে অন্তরে জাগ্রত করে রাখা সম্ভব নয়। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর বাণীগুলি সম্পর্কে আমাদের খুব সচেতন থাকতে বলেছেন। সযত্নে ও অতি সতর্কতার সঙ্গে এই বাণী সমূহ সংরক্ষণ করা ভাবী মানবসমাজের পরম কল্যাণের জন্যই প্রয়োজন।

ঠাকুর পরিবার : শ্রীশ্রী ঠাকুর পরিবার বলতে বোঝায় তাঁর তিন পুত্র, তিন কন্যা এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের। এঁদের সকলের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল থাকা ভক্তদের একান্ত কর্তব্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের সব সন্তানই তাঁর। কাউকেই খাটো করা চলবে না। সকলেরই ভাল মন্দের দিকে শিষ্যদের নজর রাখা কর্তব্য।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের নানা বয়সের নানা ধরনের ছবি সংগ্রহ করে রাখতে হয়। ধ্যানের সময় যে ছবিটি যখন ভাবতে ইচ্ছে করবে সেইটেই ভাবা যায়। ধ্যানে শুধু তাঁর মুখশ্রী দেখাই ধ্যান নয়। তাঁর কথা, বাণী তাঁর নির্দেশিত কাজ ইত্যাদির কথাও ধ্যান করতে হয়। এবং তারপর ওইসব চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলে

তবেই ধ্যানের ফল আমরা লাভ করব।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের মূর্তি ও ছবির প্রসঙ্গে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দিল্লী থেকে শুরু করে আসাম, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা বিভিন্ন জায়গায় শ্রীশ্রীঠাকুরের শতাধিক মন্দির তৈরি হয়েছে। বেশির ভাগ মন্দিরেই শ্রীশ্রীঠাকুরেরর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় মূর্তি সমূহে ঠাকুরের চেহারা বা ভাবের যথোচিত প্রতিফলন ঘটছে না। ঠাকুরের মুখাবয়বের কিছু বিশিষ্টতা আছে। সামনে থেকে ও পাশ থেকে তাঁর বিভিন্ন ছবি বারবার স্টাডি না করলে তাঁর মূর্তি করা খুব কঠিন কাজ, এবং সে কাজ করতে হলে অতি দক্ষ ভাস্করের প্রয়োজন। আমাদের দেশে ভাস্কর্যের ট্রাডিশন তেমন উজ্জ্বল নয়। ভাল ভাস্কর পাওয়া দুষ্কর। তাই আমার মতো আরও অনেকের বিশ্বাস, খুব উচুঁদরের প্রতিভাবান এবং ভগবৎপ্রাণ ভাস্কর ছাড়া ঠাকুরের মূর্তি করা সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে মূর্তি প্রতিষ্ঠা না করে ঠাকুরের আলোকচিত্র বা তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। সুখের কথা আমাদের দেশে ভাস্করের অভাব থাকলেও চিত্রকরের অভাব নেই। কিন্তু চিত্রকরের হওয়া চাই প্রথম শ্রেণীর। নইলে ঠাকুরের ছবিতেও আকাঙ্খিত মাত্রা সংযোজিত হবে না। এ বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করার সময় এসে গেছে।

ইসকনে ভক্তিবেদান্তস্বামীর যে সব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে সেগুলি কেমন জীবন্ত, প্রাণবন্ত! জয়রামবাটিতে মা সারদার মর্মরমূর্তি কী অনবদ্য। যারা সেগুলি রচনা করেছেন তাঁদেরও তো বরাত দেওয়া যায়!

ঠাকুরের ছবি বা মূর্তি শ্রীশ্রী ঠাকুরের মুখশ্রী ও ভাবকে নিখুঁতভাবে প্রকাশ করবে, ভক্তরা তো এইটেই চায়। যেহেতু তিনি এখন দেহে নেই সেই কারণেই তাঁর ছবি ও মূর্তির গুরুত্ব এখন অপরিসীম। সুতরাং এই কাজটি অতি সতর্কতার সঙ্গে, অতি যত্নে ও প্রখর তদারকিতে হওয়া উচিত। যে সব মূর্তি ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলি অপসারিত করে সেই জায়গায় নিদেনপক্ষে ঠাকুরের ব্লোআপ করা ফটো রাখা প্রয়োজন।

কোথাও কেউ ঠাকুরের নাম করে কোনও উদ্ধৃতি দিলে বা উদ্ধৃতি সহ কিছু লিখলে সেটি যাচাই না করে গ্রহণ করা কদাচ উচিত নয়। শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন মানুষের পরম উদ্ধাতা, তেমনি আবার কিছু মতলববাজ মানুষের তাঁকে ভাঙানোর সম্ভাবনাও প্রবল। মহাপুরুষদের নিয়ে ব্যবসাও বিরল কিছু নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ঋত্বিকদের দেবতা আখ্যা দিয়ে গেছেন। তাঁর ঋত্বিকরা যদি প্রকৃত ঋত্বিকোচিত চলনায় নিজেদের অভ্যস্ত করে তুলতে পারেন তাহলে বিনা আয়াসেই তাঁরা মানুষের চোখে দেবোপম হয়ে উঠবেন। ঠাকুর ঋত্বিকদের চালনা করতেন তাঁর অফুরাণ ভালবাসা আর মমত্ব দিয়ে। ঋত্বিকরা তখন তাঁর প্রতিষ্ঠাকল্পে হাসিমুখে অনেক কঠিন পরিস্থিতি জয় করেছেন। এখনও ঋত্বিকরা তা পারেন যদি তাঁরা তন্নিষ্ঠ থাকেন। নিষ্ঠা ও ভক্তিতে দ্বিচারিতা ঢুকে পড়লেই কিন্তু সর্বনাশ। ঠাকুরের ঋত্বিকরা যদি ভ্রষ্ট হন তবে তাঁর আন্দোলনটিও যে থমকে যাবে।

দীক্ষা দান এক অতি পবিত্র কাজ। দীক্ষা দেওয়ার সময়ে ঋত্বিক অনবরত হৃদয়ে ঠাকুরকে ধরে রাখবেন। দীক্ষা তো ঠাকুরই দেন, ঋত্বিক প্রতিনিধি মাত্র। দীক্ষা দান করতে হয় অতীব নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে। সব কিছু ভাল করে অল্প সময়ে সহজ ভাষায় যজমানকে বুঝিয়ে দিতে হয়। অনেক সময়ে বারবার বোঝাতে হয়। ধৈর্য হারালে চলে না। দীক্ষার কোনও অঙ্গই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আচমন থেকে শুরু করে ইষ্টভৃতি অবধি কোনওটাই উপেক্ষার বিষয় নয়। ঠিকমতো দীক্ষা হলে ঋত্বিক তা নিজের শরীর ও মন দিয়েই বুঝতে পারবেন।

দয়াল ঠাকুর প্রবর্তিত স্বস্ত্যয়নী ব্রতর কথা আগেও বলেছি। স্বস্ত্যয়নী ব্রত ধারণ করে প্রতিদিন অর্থ রাখার পর মাসান্তে অর্থাৎ ত্রিশ দিনের দিন তিনটি টাকা শ্রীশ্রী ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে টাকা জমা রাখতে হয়। কারণ, ঠাকুর স্বস্ত্যয়নী ব্রতকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। কতবার কত প্রসঙ্গে যে ঠাকুর স্বস্ত্যয়নী ঠিকমতো পালনের নির্দেশ দিয়েছেন তার হিসেব নেই। Divine economy বলে কতবার উল্লেখ করেছেন। স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত অর্থে কেনা জমিতে যে একদিন সারাদেশ ভরে যাবে এমন আশাও প্রকাশ করেছেন। শুধু অর্থই নয়, স্বস্ত্যয়নী অন্যান্য নীতিও অবশ্য পালনীয়। এই ব্রত যে মানুষের জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদকে কতখানি ফলিত ও প্রত্যক্ষ করে তোলে তা যথার্থ ব্রতধারী বুঝতে পারবেই। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বস্ত্যয়নী ব্রত সম্পর্কে যা বলেছেন ঠিক ঠিক তা পালন করার মধ্যেই মানুষের পরম মঙ্গল নিহিত রয়েছে। এই ব্রতর কোনও অঙ্গই লঙ্ঘনীয় নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কোন উদ্দেশ্যে কী করতে বলেন তা অনুধাবন করাই ভক্তের কাজ।

স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন। কথা হল, যাঁর উত্তরাধিকারী আছে অর্থাৎ পুত্র-কন্যা এবং সন্তানবৎ কেউ তিনি স্বস্ত্যয়নীর সঞ্চিত অর্থ তাকে বা তাদের হাতে অর্পণ করে যেতে পারেন। কিংবা নিজের জীবৎকালেই স্বস্ত্যয়নীর

উদ্বৃত্ত অর্থ চাষের জমি, খামার বা সরকারী ঋণপত্র ইত্যাদিতে লগ্নী করে উত্তরাধিকারীকে তা রক্ষণাবেক্ষণ ও যথোচিত ইষ্টমুখী ব্যবহারের জন্য দিয়ে যেতে পারেন। যাঁর উত্তরাধিকারী নেই তিনি তাঁর স্বস্ত্যয়নীর ভার উপযুক্ত, বিশ্বস্ত ইষ্টভ্রাতা বা আশ্রমের হাতে দিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু এটা অপরাগ ক্ষেত্রেই করা যেতে পারে। উপায় থাকলে কিন্তু স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত অর্থ শুধু দায় এড়ানোর জন্য মন্দির প্রকল্পে দিয়ে দেওয়া উচিত নয়। তাতে স্বস্ত্যয়নীর অভীষ্ট ফল লাভ করা যাবে না।

॥ কাছের ঠাকুর ॥

ঠাকুরের কথা, ঈশ্বরের কথা, পরম পিতার কথা, ধর্মের কথা বুঝবার জন্য সকলের জীবনেই দুঃখ, সংকট বা সমস্যার একটা পটভূমি বোধ হয় দরকার। বাস্তবপক্ষে মানুষ এমনিতে যেমন বা যতটাই ঈশ্বর-বিশ্বাসের ভাবে ভাবিত হোক না কেন সংকট বা সমস্যা এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে যেমনভাবে তাঁকে খোঁজে তেমন সুখের সময়ে নয়। আর দুঃখ হল ঈশ্বর-বিশ্বাসের একটা পরীক্ষাও। এর ভিতর দিয়েই তাঁর সকাশে যাওয়া সহজতর হয়। ঋণমুক্ত হওয়া যায় নানা প্রবৃত্তির অভিভূতি থেকে, আর প্রবৃত্তি বা রিপুগুলিকে চেনাও যায় সহজে।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সম্পর্কে যখনই কিছু লেখার জন্য লেখনী ধারণ করার কথা ভেবেছি তখনই এক দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব এসে আমাকে আন্দোলিত করেছে। থেকে গেছি। মনে হয়েছে, আমি বোধ হয় পেরে উঠব না! পেরে উঠব না, কারণ এঁর জীবন আরও আরও পূর্বতন মহাপুরুষদের মতো সহজ ও সরল ভক্তিরসাশ্রয়ী নয়। ইনি সনাতন আর্য হিন্দু ধর্মের শক্ত ভিতের ওপরেই মনুষ্য সমাজকে দাঁড় করাতে চান বটে, কিন্তু ওঁর ধর্মাচরণ এত বেশি আচরণ-সাপেক্ষ এবং এত সূক্ষ্ম ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, এঁর দর্শন, সাহিত্য কাব্য এতই গভীর ও নতুন যে সহজ বুদ্ধিতে এঁর পরিমাপ করতে গেলে ঠিক থৈ পাওয়া যায় না। যা তিনি বলেছেন তা সারাটি জীবন ধরে নিজে কাঁটায় কাঁটায় অনুসরণ করেছেন, কোথাও কোনও খেলাপ নেই। কখনও কারও সঙ্গে আপস-রফায় যাননি, একটা জীবন তিনি কখনও নিজের বলা কথার উল্টোটি বলেননি, নিজের দেওয়া উপদেশের বিরুদ্ধে চলেননি। আচরণশীলতা, চর্চা, অভ্যাসের ভিতর দিয়ে ধর্মাচরণকে তিনি ফলিত ও জীবনমুখী করে দেখিয়ে গেছেন, ধর্ম প্রকৃতপক্ষে কল্পনাবিলাস, অহেতুক কৃপা বা ঈশ্বরের কৃপণ দানপ্রাপ্তি নয়। ধর্ম মানুষকে উচ্ছল, অনাসক্ত, অনলস, উজ্জ্বল, দক্ষ ও সফল করে যদি তুলতেই না পারে তবে ধর্মের আর কোনও উদ্দেশ্য দিয়ে আমাদের কাজ নেই।

ধর্ম কথার অর্থ যা ধারণ করে থাকে। অর্থাৎ মানুষের জীবনকে যা ধারণ করে এবং তার বৃদ্ধিকে যা অবাধ করে। মানুষের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য কিছু না কিছু থাকবেই। ধর্ম তার এই বৈশিষ্ট্যগুলিকেই ফুটিয়ে তোলে। দীক্ষা অর্থে দক্ষতা। মানুষ তার স্ববৈশিষ্ট্যে দক্ষ হয়ে উঠে নিজে যখন সার্থক হয় এবং অপরকে সার্থক করে তোলে তখনই প্রকৃত ধর্মাচরণ হল। বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, ত্যাগ, সাধনা, ব্রহ্মচর্য এসব যদি নিজের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তা শুকনো আয়াসে পরিণত হয়। যদি মানুষের প্রকৃতিদত্ত বৃত্তি ও প্রবৃত্তিগুলিকে জীবনমুখী করে নিয়োগ করা যায় তাহলে সন্ন্যাস ব্রহ্মচর্য আপনিই আসে।

ঠাকুরের কাছে যাওয়ার আগে ঈশ্বরবিশ্বাস বলে আমার কিছুই তেমন ছিল না। গুরুবাদের তীব্র বিরোধীও ছিলাম আর বিশেষ করে বিরাগ ছিল ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের প্রতি। নানা গুজব ও রটনা তো ছিলই তাঁর সম্পর্কে।

কিন্তু জীবনের এক দুর্বহ দুঃখের দিনে পাকেচক্রে যখন তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলাম তখন তিনি ঈশ্বর না গুরু না অবতার তা কিছুই বুঝিনি, কিন্তু এক লহমায় তাঁকে আমার আপন বলে মনে হয়েছিল।

এই 'আপনজন' বলে মনে হওয়াটাই এমন এক অলৌকিক বোধ যা সহজে বোঝা যায় বটে, কিন্তু বহু বাক্য দিয়েও কিছুতেই বোঝানো যায় না।

আমরা কয়েক বন্ধু তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। প্রসূন মিত্র, শশাঙ্ক সরকার, চন্দন মজুমদার, মুকুল গুহ এবং আমি। শশাঙ্ক সরকার ঠাকুরের শিষ্য ছিল, একটি ইংলিশ মিডিয়াম মিশনারি স্কুলে চাকরি করে। লম্বা, লকলকে, সুদর্শন এই যুবকটিও জীবনে এক প্রবল ধাক্কা খেয়ে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল একদা। এই ঘটনার বেশ কিছুদিন আগে সে দীক্ষা নিয়েছিল বটে, কিন্তু স্বভাবত কিছু খেয়ালী হওয়ায় সে দীক্ষার পর করণীয় কিছুই করত না। বড়লোকের আদুরে ছেলে ছিল সে, তাই স্বভাব কিছুটা উগ্র, কিছুটা অগোছাল। নিক্কো বোর্ডিং ছিল হ্যারিসন রোডের ওপর, আমহার্স্ট স্ট্রিট ক্রসিং-এর কাছে। সেখানে সে থাকত। বাথরুমের পাশে, ছোট্ট ডবল সিটেড ঘরে। আমার সঙ্গে যখন তার পরিচয় তখন সে জীবনের সেই বড় ধাক্কাটা সামলে ঠাকুরকে আঁকড়ে ধরেছে। নিরামিষ খায়, ধ্যান করে।

আমি যখন মানসিক বিপর্যয়ে আক্রান্ত হয়ে ভিতরে ভিতরে জ্বালা যন্ত্রণায় জ্বলে খাক ও ক্ষয় হয়ে যাচ্ছি, যখন আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য পথ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, বুদ্ধিতে দেখা দিচ্ছে নানা ওলটপালট, তখন একদিন শশাঙ্কর ঘরে গিয়ে হানা দিলাম। তার সাদা চাদরপাতা পরিচ্ছন্ন বিছানা, তার পরিষ্কার জামাকাপড়, টেবিলে এবং দেয়ালে ঠাকুরের ছবি—এসবের মধ্যে গিয়ে হঠাৎ কেন যেন ভাল লাগতে লাগল। যতক্ষণ শশাঙ্কর ঘরে থাকতাম ততক্ষণ মনটা বেশ ভাল থাকত। আর শশাঙ্কও বুঝতে পেরেছিল, আমার মানসিক সংকট চলছে। তাই সে বলত, আমার মাস্টারির সময়টুকু বাদ দিয়ে সারাক্ষণ আমি তোমার জন্য এ-ঘরে অপেক্ষা করব। তোমার যখন খুশি এসো, মাঝরাত হলেও দ্বিধা কোরো না।

বাস্তবিকই শশাঙ্ক তখন আমাকে মস্ত এক সহায়তা আর সাহচর্য দিয়েছিল। না দিলে কী যে হত তা ভাবতেও আজ আতঙ্ক হয়।

মৃত্যুচিন্তা, নশ্বরতার চিন্তা মানুষকে যখন পেয়ে বসে তখন ভূতের মতোই পায়। আর তীব্র ওই বিষাদরোগ এমনই সাংঘাতিক যে, শত্রুরও যেন ওই রোগ না হয়, এমন প্রার্থনা স্বতঃই মনে আসে। শশাঙ্কর ঘরে গেলে কিছুক্ষণের জন্য যে ওই

পাষাণভার থেকে আমার মন মুক্ত থাকত সেটা আমি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করতাম। মনে প্রশ্ন হত, তবে কি এ ওর ঠাকুরেরই প্রভাব?

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সম্পর্কে অনেক অপপ্রচার ও রটনা আছে। কতকাল আগে থেকে 'শনিবারের চিঠি' ও অন্যান্য ব্যক্তি এই কাজে ব্রতী হয়েছেন। তাঁদের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত ঠাকুরের বিপক্ষে গেলেও তাঁরা পরেপ্রকারে স্বীকার করেছেন যে, মানুষটি ক্ষমতাবান। ইনি লোককে সম্মোহিত করে রাখেন! তাঁর চারিত্রিক অপবাদও প্রচুর রটিত হয়। আবার যাঁরা স্বচক্ষে ঠাকুরের কীর্তনযুগের লীলা দেখেছেন তাঁরা তাঁর বিরোধী হয়েও সভয়ে তাঁকে এড়িয়ে চলেছেন। আমরাও এসব বিষয়ে সচেতন ছিলাম।

শশাঙ্ক যখন ঠাকুরের কথা একটু আধটু আমাকে বলার চেষ্টা করত তখন কিন্তু আমি তেমন প্রতিবাদ করতাম না। আমি চুপ করে বসে শুনতাম। এবং ঘরের পরিমণ্ডলে একটি মৃদু নিরাময়কারী শান্ত মণ্ডলকে অনুভব করতাম। আমার তাপিত হৃদয় যেন শান্ত হয়ে তার উদ্যত ফণা নামিয়ে নিত।

তিন চার দিন বাদে শশাঙ্ক একদিন বলল, চল, খোদ কর্তার কাছে গিয়ে তোমার মানসিক সংকটের কথা বলবে। দেখ না, কী হয়।

প্রস্তাবটা আমার খুব খারাপ লাগল না। মনে হল, উনি হিপনোটাইজ করলে করুন না। আমার এখন সম্মোহিত থাকারই প্রয়োজন। দুঃসহ দুর্বহ এই বিষাদ আমি আর বইতে পারছি না।

প্রসূন, শশাঙ্ক, মুকুল, চন্দন আর আমি। আমাদের সকলেরই বয়স তখন ত্রিশের এদিক বা ওদিক। আমার নিজের বয়স তখন উনত্রিশ। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারির শেষ বা ফেব্রুয়ারির শুরু। সঠিক তারিখ মনে নেই। রাত্রির ট্রেনে আমরা পাঁচজন হৈ হৈ করে চেপে বসলাম। গল্পগুজবেই পথটা প্রায় কেটে গেল। যশিডি মোটে ছয় ঘণ্টার রাস্তা। ঢুলতে ঢুলতে যখন ভোর রাত্রে 'যশিডি' 'যশিডি' চিৎকার শুনে হুড়মুড় করে নামলাম তখন কনকনে শীত।

যশিডি থেকে সৎসঙ্গ আশ্রম মাইল পাঁচেকের পথ। স্টেশনে ভাঁড়ে গরম চা খেয়ে টাঙ্গায় চেপে রওনা দেওয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই জুড়িয়ে গেল দুটি চোখ আর বুক। কোন এক রহস্যময় অলৌকিক পুরুষের সন্নিধানে চলেছি আমরা, কিন্তু যাওয়ার পথের প্রাকৃতিক শোভাও যে অনুপম। ছোট ছোট টিলা, আদিগন্ত উচ্চাবচ প্রান্তর আর লালমাটির এই দেশটির প্রেমে পড়ে যেতে হয় প্রথম দর্শনেই। প্রাকৃতিক শোভা আশৈশব আমি বড় কম দেখিনী কিন্তু দেওঘরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাকে আজও যত সম্মোহিত করে তত আর কোনও জায়গা নয়।

পথে যেতে যেতে পাঁচ জনে মিলে নানা রঙ্গ-রসিকতা আর ঠাট্টা ইয়ার্কি হচ্ছিল।

প্রসূন অর্থাৎ আকাশবাণীর প্রসূন মিত্র এক সময়ে দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশনে চাকরি করেছে। কিন্তু তখন সে ঠাকুরের কাছে যায়নি বা তাঁকে কখনও দেখেনি। শশাঙ্ক ছাড়া আমরা আর কেউই দেখিনি তাঁকে। আমার বুকটা মাঝে মাঝে গুড়গুড় করছিল। ধর্মের বকলমে কত ভণ্ডামিই তো আছে, ইনি খাঁটি না ভেজাল তা কী করে বুঝব?

দেওঘর সৎসঙ্গ নগরের প্রবেশপথে যে তোরণ এখন রয়েছে তা তখন ছিল কিনা মনে নেই। যতদূর জানি, ছিল না। লেভেল ক্রসিং পার হয়েই বাঁ ধারে চমৎকার কম্পাউণ্ড ঘেরা চৌধুরী ভিলা। কোনও বড়লোক একদা বানিয়েছিলেন, সৎসঙ্গ বাড়িটি কিনে নিয়ে গেস্ট হাউস বানিয়েছে। মাঝখানে হলঘর আর গুটি চারেক শোওয়ার ঘর, সামনে বেশ বড় একটি লন।

এই বাড়িতে থাকতেন পরেশদা, অর্থাৎ পরেশচন্দ্র ভোরা। এখন ইনি সৎসঙ্গের মুখপত্র 'আলোচনা'-র সহকারী সম্পাদক। সেই সাতসকালে তাঁর ঘুম ভাঙানো হল, উনিও কবোষ্ণ লেপের আশ্রয় ছেড়ে উঠে এসে উজ্জ্বল হাসিমুখে আমাদের গ্রহণ করলেন সেই অমলিন হাসি তাঁর আজও অম্লান আছে।

একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আমরা মাইলখানেক দূরে আশ্রমে রওনা হলাম। রাজনারায়ণ বসু রোডটি এতই শান্ত বৃক্ষছায়ায় সমাহিত যে মনটা স্নিগ্ধ হয়ে যায়। চারদিকে ভোরের একটি পরিচ্ছন্ন আবহ।

সবে রোদ ফুটেছে। আমরা গিয়ে আশ্রমের চৌহদ্দিতে ঢুকলাম।

ঠাকুর তখন নিরালা নিবেশে বসতেন। মাঝখানের উঠোনে সামিয়ানা ছিল কিনা মনে নেই। কিন্তু তাঁর পার্লারে একটু রোদ পড়ে ছিল, এটা মনে আছে।

একটু দূর থেকেই তাঁকে দেখা যাচ্ছিল। পার্লারের মস্ত মস্ত খোলা জানালা দিয়ে তখন অবারিতই দেখা যেত তাঁকে।

মুক্তকণ্ঠে বলি, অমন রূপ জন্মেও দেখিনি। তাঁর দেহবর্ণ ছিল তাম্রাভ গৌর। তখন তাঁর বয়স সাতাত্তরের মতো। ওই বয়সে যে অমন দেবোপম রূপ কোনও মানুষের থাকতে পারে তা আমার ধারণায় ছিল না। তাঁর পরনে ছিল চিরাচরিত ধুতি, গায়ে একখানা ফতুয়া, কাঁধের ওপর দিয়ে আলগোছে ফেলে রাখা একখানা বালাপোশ। তামাকের গন্ধে ম ম করছে চারপাশ আর ওই পার্লার থেকে ধূপ বা অন্যান্য গন্ধদ্রব্যর এবং কাঠের নিজস্ব গন্ধ এবং সর্বোপরি তাঁর দৈবী উপস্থিতির এক সুঘ্রাণ মিলেমিশে এমন একটা পরিমণ্ডল রচনা করেছিল যে ভারী মনোরম লাগল আমাদের।

কিন্তু যে জিনিসটি আমাকে আমূল চমকে দিয়েছিল তা হল তাঁর দুখানি চোখ। সেই দুই চোখের বর্ণনা কী ভাবে দেব? বহুবার চেষ্টা করে দেখেছি, পারিনি। আয়ত দুই বিশাল চক্ষু থেকে এক কারুণ্যের আলো হীরকদীপ্তির মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

চোখ যে অত দ্যুতিময় হতে পারে তা আমার ধারণার অতীত ছিল। অন্তর্ভেদী সেই চোখের দিকে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকাই ছিল অসম্ভব। সুন্দর চোখ তো অনেকেরই থাকে, কিন্তু ওরকম যোগীচক্ষু বিরল।

প্রসূনই আমাকে বলল,এঁকে আমি আগে কখনও দেখিনি। কিন্তু প্রকৃত যোগীচক্ষুর অধিকারী এই মানুষটির কাছে আমার অনেক আগেই আসা উচিত ছিল।

ঠাকুর কথা বলতেন কম, শুনতেন বেশি। যা শুনতেন তা মন দিয়ে নিবিষ্ট হয়ে শুনতেন। একটি দুটি কথায় জবাব দিতেন। তাঁর পার্লারে ভোর থেকে রাত্রি অবধি অবিরল মানুষের যাওয়া আসা। ওরকম মানুষ-মাতাল আমি তো কখনও দেখিনি। পার্লারটাই ঠাকুরের শোওয়া-বসা, দিন-রাত্রি অবস্থানের ঘর। কিন্তু সেই ঘরে অন্দর ও বাহির একাকার হয়ে গেছে। লাগোয়া একটি ঘরে বড়মা থাকেন, সে ঘরখানাও দিনরাত্রি মানুষের সমাগমে মুখরিত।

দেখেশুনে মনে প্রশ্ন হল, ইনি খান বা ঘুমোন কখন? এঁর কি ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই?

ধীরে ধীরে জেনেছি, সেই কৈশোরকাল থেকেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু ছিল না, এখনও নেই। সারাদিন এক জনস্রোত এসে এই মহাসমুদ্রের কাছে নিজেদের বিলিয়ে দিচ্ছে। আর মানুষও যে কত রকম! উচ্চতম কোটি থেকে নিম্নতম কোটির, বিচিত্র ও বহুবিধ এত মানুষকে সামাল দেওয়া যার তার কাজ তো নয়।

আমাদের প্রথম মুগ্ধতা ধীরে ধীরে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছিল। যতবার তাঁর কাছে যাই, ততবারই যেন মনে হয়, এঁর মতো কাউকে তো কখনও দেখিনি! হাজার জন মানুষের মধ্যে থাকলেও এঁকে আলাদা বলে চিনে নিতে এক লহমাও লাগে না।

রে হাউজারম্যান নামে যে মার্কিন সৎসঙ্গী সেই ত্রিশের দশক থেকে ঠাকুরের কাছে আছেন, তিনি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ঠাকুরের কাছে গেলে তুমি ইলেকট্রিসিটির মতো কিছু কি টের পাও?

বাস্তবিক ঠাকুরকে কখনও স্পর্শ-না করলেও আমি দু একবার তাঁর তিন চার ফুট দূরত্বের মধ্যে গেছি। আর তখন যে এক তড়িৎবাহী পরিমণ্ডলকে খুব স্পষ্ট অনুভব করেছি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কেমন যেন গা শিউরে উঠত, অদ্ভুত এক অনুভূতি হতে থাকত।

প্রথমবারের কথা বলি। ঠাকুর যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি এই তিন স্তম্ভের ওপর তাঁর জীবনাদর্শকে স্থাপন করেছেন। সেই সঙ্গে স্বস্ত্যয়নী ও সদাচার। যাই হোক, যজন, যাজন ও ইষ্টভৃতি এই তিনটি নীতির মধ্যেই জীবনের যত কিছুর পরিপূরণী শক্তি রয়ে গেছে। শুনতে ছোট্ট তিনটি কথা। কিন্তু কার্যত এই তিনটি নীতি যে

কোনও মানুষেরই অমৃত-অভিসারের পরম পাথেয় এবং এক বৃহৎ কর্মযজ্ঞ। যজন কথার মধ্যে নিহিত আছে ব্যক্তিগত নামধ্যান-পরায়ণতা। জপধ্যান নিয়ে অনেক কথা আছে। বীজ নামও আছে অনেক রকম। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের সৎনাম গ্রহণ করার পর এই নাম জপের যে প্রত্যক্ষ শরীরী স্বরূপ অনুভব করেছি তা আমার মতো নাস্তিককে খুবই বিস্মিত করেছিল। শুধু আমার অভিজ্ঞতা বলে কথা নয়, যে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই সৎনাম গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে যাঁরাই কয়েকদিন নিয়মমতো এই নাম জপ করেছেন তাঁদের সকলের অভিজ্ঞতাই কম বেশি একই রকম। যাঁরা নামধ্যানে প্রাগ্রসর তাঁদের অভিজ্ঞতা যে কত বিচিত্র, অনুভূতি যে কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তরঙ্গকে ধরেছে তার ইয়ত্তা নেই। সহজ স্বাভাবিক ধ্যানেই শঙ্খনাদ ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়, দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের সত্তাকে অনুভব করা যায়। তবু এসব অনুভূতি বা উপলব্ধিকে ঠাকুর খুব বেশি প্রশ্রয় দিতে না। এক সময়ে এমন হয়েছিল যে, শিষ্যরা ধ্যানের নেশায় খুব বুঁদ হয়ে থাকতেন, কাজকর্মে গা করতেন না। ঠাকুর তখন এই সব অনুভূতি কিছুটা হ্রাস করে দেন। নামধ্যানে যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় তাতে তো সন্দেহ নেই, কিন্তু কাজকর্মের ভিতর দিয়ে হাতেকলমে যদি জগতের মঙ্গল করার উদ্যোগ না থাকে তবে সেই আধ্যাত্মিকতার মূল্য কী? ঠাকুর যে ধর্ম করার জন্য এসেছেন তা ফলিত ধর্ম, তা সকলকে নিয়ে, গোটা জগৎকে মঙ্গলাভিমুখী করার ধর্ম, তা শুধু ব্যক্তিগত মোক্ষ নয়। ধর্ম মানেই অস্তিত্বকে রক্ষা করে বর্ধনের পথে অগ্রসর হওয়া, সবাইকে নিয়ে। এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের যেরকম পারিপার্শ্বিকের ওপর নির্ভর করতে হয়, সেরকম পারিপার্শ্বিকও আমাদের ওপর নির্ভরশীল। কাজেই নিজের যদি ভাল চাই তাহলে পারিপার্শ্বিকেরও ভাল চাইতে হবে, তাকেই পোষণ দিতে হবে, পালন করতে হবে। এই সরল লজিক মানতে বোধ হয় আপত্তি হবে না। ধর্ম অর্থে জীবন ও বৃদ্ধির ধর্ম, অন্য কোনও ধর্ম নেই।

ঠাকুর যখন ধর্মকে আমাদের হাতের মুঠোয় এনে দিলেন, সহজসাধ্য করে তুললেন, ধর্মের ফলিত রূপ যখন আমরা একটু একটু উপলব্ধি করতে লাগলাম, তখনই ধর্ম সম্পর্কে অনেক ধোঁয়াটে ধারণা, অনাবশ্যক কল্পনা, ধাঁধা কেটে যেতে লাগল, অনেক কঠিন তত্ত্বকথা হয়ে যেতে লাগল সরল সহজ।

কিন্তু এসব উপলব্ধি হয়েছে পরে। ঠাকুরকে নিয়ে আমাদের প্রাথমিক অভিজ্ঞতার কথা সবে তো শুরু হয়েছে।

প্রথমবার দেওঘরে আমরা বোধ হয় পাঁচ দিন ছিলাম। আশ্রমের বাইরে দোকানে সুস্বাদু আলুর চপ, কচুরি, বাঁধাকপির বড়া দেদার খাই। ভাঁড়ের পর ভাঁড় চা, আর সেই সঙ্গে আড্ডা-বিতর্ক। সেই বিতর্কের সবটাই ঠাকুরকে নিয়ে। ঠাকুরকে তখনও

আমরা গ্রহণ করিনি। ওদিকে শিষ্যরা আমাদের নানাভাবে ঠাকুরের মহত্ত্ব বোঝানোর চেষ্টা করছেন, যাজন করছেন। আমরাও তর্কে মেতে জাল কেটে বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা করছি। তখন দীক্ষা, গুরুকরণ ইত্যাদি ভাবতেই আমাদের ভেতরটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ওসব মানি না। ঘোরতর নাস্তিক আমি তো ছিলামই তখন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যখনই ঠাকুরের কাছে গিয়ে বসি তৎক্ষণাৎ মনটা যেন ভাল হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে একটু কেমন যেন গা শিরশির করা ভয় ভয় ভাবও। কারণ তাঁর ওই দুখানা অন্তর্ভেদী চোখ। কিছুতেই ওই চোখে চোখ রাখতে পারতাম না। বুক দুরদুর করত।

ঠাকুরের কাছে আমার জিজ্ঞাসা ছিল অনেক। কিন্তু আমি স্বভাবে লাজুক বলে এবং ঠাকুরের কাছে সর্বদাই বহু লোকের ভিড় বলে কিছুতেই কোনও কথা জিজ্ঞেস করতে পারতাম না। কিন্তু সকালে বা সন্ধ্যায় বেশ কিছুক্ষণ আমি ঠাকুরের কাছে বসে থাকতাম। কেন কে জানে, সেই সান্নিধ্য আমার বড়ো ভাল লাগত।

ঠাকুরের কাছে দুটো প্রশ্ন নিবেদন করব বলে মনে মনে স্থির করে রেখেছিলাম। তীব্র মানসিক বিষাদ শুরু হওয়ার পর থেকে আমি নানা ধর্মগ্রন্থ খামচাখামচি করে পড়েছি। স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীতে কল্পান্তের কথা পেয়েছিলাম। কল্প যখন শেষ হয় তখন বিশ্বজগতের সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র জ্যোতিহারা হয়ে পরস্পর এক হয়ে পিণ্ডের আকার ধারণ করে। সেই পিণ্ড আবার একদিন বিস্ফোরিত হয় এবং নতুন করে সৃষ্টি হয় গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা। কল্পান্ত সত্যিই ঘটে কিনা এ ছিল আমার প্রথম প্রশ্ন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, দীক্ষা গ্রহণ না করে যদি আমি ঠাকুরের উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী চলি তাহলে আমার কোনও উপকার বা উন্নতি হবে কিনা। দীক্ষা গ্রহণের অর্থ তখন অন্যের কাছ মাথা নোয়ানো, আত্মবিসর্জন এবং আত্মাবমাননা।

যাই হোক, কল্প আর দীক্ষা বিষয়ে আমার দুটি প্রশ্ন কিছুতেই উত্থাপন করে উঠতে পারছিলাম না।

একদিন সন্ধেবেলা নিরালা নিবেশে-ঠাকুরের সামনে বেশ লোকের ভিড়। নানা আলোচনা চলছে। ঠাকুরের কাছে যাঁরা বসেছেন তাঁরাই জানেন সর্বদাই সেখানে জ্ঞানের চর্চা হত, শুধু বসে থাকলেই কত বিষয় যে জানা হয়ে যেত তার ইয়ত্তা নেই।

সেদিন সন্ধ্যায় আমার বন্ধুরা চায়ের দোকানে আড্ডা মারতে গেছে। আমি বিষণ্ণ মনে নিরালা নিবেশে ঠাকুরের কাছে বসে আছি। সেদিন বেশ ভিড় ছিল পার্লারে। কলকাতা থেকে কোনও এক পণ্ডিত ব্যক্তি এসেছেন, তিনিই ঠাকুরকে নানা প্রশ্ন করছিলেন। বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনাও করছিলেন।

আমার কানে সেসব আলোচনা খানিকটা ঢুকছিল, খানিকটা ঢুকছিল না। আমি ঠাকুরের দিকে চেয়ে বসেছিলাম আর ভাবছিলাম, ইনি কি সত্যিই ক্ষমতাবান? নাকি সবই ফককিকারি? ইনি কি সত্যিই শান্তি দিতে পারেন? নাকি নানা কথার যে প্রচার শুনি সেগুলোই সত্যি? মনে নানা সংশয়, হাজারো প্রশ্ন, প্রবল অবিশ্বাস, তীব্র আকর্ষণ, সব মিলিয়ে-মিশিয়ে এক সাংঘাতিক দোলাচলের মধ্যে তখন আমার দিন কাটছে।

হঠাৎ এই অন্যমনস্কতার ভিতরেই কানে এল কলকাতার সেই পণ্ডিত ঠাকুরকে প্রশ্ন করছেন, আচ্ছা ঠাকুর, উপনিষদে যে কল্প এবং কল্পান্তের কথা আছে তা কি সত্যিই হয় নাকি? কল্পের শেষে সব সৃষ্টির লয় হয়ে বিশ্বজগতের সব ম্যাটার পিণ্ডাকার ধারণ করে এবং তার থেকেই আবার সৃষ্টি শুরু হয়?

আমি এই প্রশ্ন শুনে সচকিত হয়ে নড়েচড়ে বসলাম। কিন্তু ঠাকুর এ প্রশ্নের কী যে একটা উত্তর দিলেন তা দূর থেকে ভাল শুনতে পাইনি। তবে ঠাকুর খুবই সংক্ষেপে কিছু একটা বলেছিলেন।

পণ্ডিত এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা ঠাকুর, যদি কেউ ভেবে থাকে যে, আপনার কাছে দীক্ষা না নিয়ে যদি সে আপনার নির্দেশিত পথে চলে তাহলে তার কোনও উন্নতি হবে কি?

এ প্রশ্নটি শুনেই আমি এমন স্তম্ভিত ও হতচকিত হয়ে গেলাম যে, সে অবস্থার কথা এখন বর্ণনা করতেও পারব না। হঠাৎ দেখি, ঠাকুর স্মিতমুখে প্রসন্ন চোখে আমার দিকেই চেয়ে আছেন!

কী জানি কেন, হঠাৎ ভীষণ ভয় হল। মনে হল, এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা উচিত হবে না। এঁরা নিশ্চয়ই জাদুবিদ্যা জানেন, থটরিডিং জানেন বা ঐ ধরনেরই অপ্রাকৃত কিছু। ঠাকুর সম্ভবত আমার মনে অভ্যন্তরটাও দেখতে পান। অনেক গোপন কথা তো উনি জেনে নেবেন!

এক সাংঘাতিক আতঙ্কে আমি হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে সবেগে পার্লার থেকে বেরিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে যেখানে আমার বন্ধুরা আড্ডা মারছিল সেই চায়ের দোকানে হাজির হলাম।

আমার উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা ও আতঙ্কিত দৃষ্টি দেখে বন্ধুরা সচকিত হয়ে উঠল। প্রসূন বলল, কী রে, কী হয়েছে?

আমি আতঙ্কিত গলায় বললাম, এখানে আমাদের আর থাকা ঠিক হবে না। চল, কলকাতায় চলে যাই।

কেন, কী হল রে হঠাৎ?

দিস ম্যান ইজ ডেন্‌জারাস।

কে, ঠাকুর?

হ্যাঁ, ঠাকুর ছাড়া আর কে?

বন্ধুরা তখন আমাকে ধরে বসাল। সকলেরই সাংঘাতিক কৌতূহল। ঘটনার কথা শুনতে চায় সবাই। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে ধীরে ধীরে ঘটনাটা বললাম।

আশ্চর্যের বিষয়, কেউই অবিশ্বাস করল না এবং আমি যতটা ভয় পেয়েছিলাম সেরকম ভয়ের অনুভূতিও কারও হল না। প্রসূনের চোখ তো ছলচল করতে লাগল। সে বলল, ঠাকুরকে প্রথম দেখেই আমি বুঝেছি, ইনি সামান্য মানুষ নন। অনেক সাধু দেখেছি বটে কিন্তু এরকম যোগীচক্ষু আমি আর দেখিনি।

প্রসূন দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা করেছিল কয়েক বছর আগে। তখনকার সময়ে সে কখনও ঠাকুরের কাছে আসেনি বা আসবার আগ্রহ বোধ করেনি। বরং বিরাগই ছিল। এবার সে আফশোষ করে বারবার বলছিল, না এসে খুব ভুল করেছি। এতগুলো বছরে অনেক এগিয়ে যাওয়া যেত।

সেই দিন, অর্থাৎ এই ঘটনার পর বাকি রাত্রিটা আমার কিছু অস্থিরতার মধ্যে কেটেছিল। ঘটনাটি যে অলৌকিক, ব্যাখ্যার অতীত তা বুঝতে পারছি, কিন্তু মন মানছে না, যুক্তিবোধ বলছে, যদি কাকতলীয় হয়ে থাকে! এরকম তো হতেই পারে।

কিন্তু মন যে একটা ঝাঁকুনি খেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। নানা যুক্তিতর্ক আপন মনেই আউড়ে গেছি। প্রতিদিনই কেউ না কেউ আমাদের যাজন করেছেন, তর্কবিতর্ক বিস্তর হয়েছে, কিন্তু ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ বা দীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে কেউই আমাদের সদুত্তর দিতে পারেননি। শুধু ঠাকুরকে দেখেই আমাদের যা কিছু যাজন হচ্ছিল।

এর মধ্যেই একদিন বিকেলে চৌধুরী ভিলায় এলেন ননীগোপাল চক্রবর্তী। সৎসঙ্গের পরবর্তীকালের সম্পাদক ননীদা। তীক্ষ্ণ ও অতিশয় সুদর্শন তাঁর চেহারা। ধবধব করছে গায়ের গৌরবর্ণ। তেমনি তাঁর অনুপম বাচনভঙ্গি।

তিনি এসে বললেন, আপনাদের কী সব প্রশ্ন আছে বলে শুনেছি। যদি দয়া করে আমাকে বলেন তবে আমি সাধ্যমতো জবাব দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি।

মানুষটির চেহারা এবং বাচনভঙ্গি আমার বেশ ভাল লাগল। তবু একটু তর্ক বাধানোর জন্য বললাম, আমাদের অনেক প্রশ্ন। সব কিছুর জবাব কি আপনি দিতে পারবেন?

ননীদা বিনয়ের সঙ্গে বললেন, সাধ্যমতো চেষ্টা করব।

আমি প্রশ্ন করলাম, মৃত্যুর পর মানুষের অস্তিত্ব কি থাকে? তার কি সত্যিই পুনর্জন্ম হয়?

ননীদা কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, আমি একটু রূঢ়ভাবে বাধা দিয়ে বললাম, দেখুন, এ ব্যাপারে শাস্ত্রে টাস্ত্রে যা আছে সেগুলো আমরা জানি। ওসব

তত্ত্বকথা দয়া করে বলবেন না। আমার প্রশ্ন হল, মৃত্যুর পর যে আত্মার অস্তিত্ব থাকে তা আপনি বাস্তবভাবে জানেন কিনা, এব্যাপারে আপনার কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে কিনা। যদি না থাকে তবে বাগবিস্তার বৃথা।

ননীদা কিন্তু সামান্য মাত্রও বিচলিত হলেন না। বললেন, ঠিক আছে, তাই বলব। শুধু একটি ছোট্ট কথা বলে নিই। আপনি যে আছেন এটা যদি সত্যি হয় তবে আপনি যে ছিলেন সেটাও সত্য হতে বাধ্য। আর আপনি যে থাকবেন সেটাও সত্য। আপনি আছেন অথচ আপনি ছিলেন না বা থাকবেন না এটা তো হতে পারে না। বৈজ্ঞানিক ভাবেই একথা বলা যায় তো!

আমি প্রসূন মুকুল চন্দন মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। আমিই বললাম, ঠিক আছে। আপনার কথাটা মেনে নিচ্ছি। এবার বলুন।

ননীদার মেয়ের গল্প বোধ হয় অনেকেই শুনে থাকবেন। দীক্ষাপূর্ব জীবনে ওঁর শিশুকন্যা জলে ডুবে যায়। জীবন্ত অবস্থাতেই তাঁকে জল থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। ননীদা স্বয়ং লাইফ সেভিং সোসাইটির সদস্য এবং জলেডোবা মানুষের চিকিৎসাও তিনি জানতেন। মেয়েকে জল থেকে তুলে তাকে উপুড় করে শুইয়ে ম্যাসাজ করার সময় যখন মেয়েটির সাড়া ফিরে আসছে সেই সময় এক গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তার এসে উল্টো পরামর্শ দেয় এবং ননীদা সেই বিপদে বুদ্ধি স্থির রাখতে না পেরে সেই পরামর্শ মেনে ম্যাসাজ করতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনেন। মেয়েটি মারা যায়। ননীদা এই ঘটনা থেকে শোকে এবং ক্ষোভে উন্মাদের মতো হয়ে যান। তাঁর অধীত বিদ্যা তিনি প্রয়োগ করতে পারলেন না। হাতুড়ের পরামর্শে বুদ্ধিভ্রংশের মতো উল্টো কাজ করে বসলেন। ফলে তাঁর আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, এই জীবনে একজন সদ্‌গুরু না লাভ করলে যাবতীয় বিদ্যা, কর্ম, প্রয়াস বৃথা যাবে। এই তীব্র আকুলতা ও অনুসন্ধিৎসা থেকেই তিনি একদিন ঠাকুরকে খুঁজে পান। শুধু তাই নয়, দীক্ষাগ্রহণের পর যে মেয়েটি তাঁর ঘরে জন্ম নিল সে হল জাতিস্মর। সে জলে ডুবে যাওয়ার কথা বলত। মেয়েটি জন্মানোর পরই ঠাকুর ননীদার স্ত্রীকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন, তুই কাঁদিস কেন আগের মেয়েটির জন্য? ও-ই তো আবার তোর কোলে এসেছে।

গল্পটি তিনি এমনভাবে বলেছিলেন আমাদের মন ভারী আর্দ্র হয়ে গেল। এরপর ননীদার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা হল। ঠাকুরকে নিয়ে, দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে, সংঘ নিয়ে।

ননীদা চলে যাওয়ার পর আমরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বললাম অনেকক্ষণ। চন্দন অর্থাৎ চন্দন মজুমদার বয়সে আমাদের সকলের ছোট, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, অশোকনগরে বাড়ি এবং দর্শন শাস্ত্রে এম এ। চন্দন এমনিতে চমৎকার স্বভাবের

ছেলে, বিনয়ী, ভদ্র, ভালমানুষ। তবে দর্শনচিন্তায় বিভোর থাকত বলে সে ছিল ভীষণ অন্যমনস্ক আর ভুলোমনের মানুষ। হঠাৎ চন্দন আমাকে বলল, দাদা, আমি ভেবে দেখলাম আমাকে দীক্ষা নিতে হবে। আজই।

আমি অবাক হয়ে বললাম, বলিস কী? সত্যি দীক্ষা নিবি?

মনে আছে চন্দন হাতজোড় করে বলেছিল, আপনি বাধা দেবেন না। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের ভিড়ে আমি সামান্য একজন চন্দন মজুমদার দীক্ষা নিয়ে যদি বেঁচে থাকার পথ পাই তবে দোষ কী?

বাধা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বরং চন্দন দীক্ষা নেবে শুনে আমি মনে মনে কেমন যেন দারুণ খুশিই হয়েছিলাম। বললাম, নে দীক্ষা। আমারও ধারণা, ঠাকুরের বেশ শক্তি আছে। উনি সত্যিকারের পাওয়ারফুল মানুষ।

সেই সন্ধেবেলাতেই চন্দন ঠাকুরবাড়ি চলে গেল। ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে তাঁরই নির্দেশে শরৎদার (হালদার) কাছে সৎনাম গ্রহণ করল।

প্রসূন চাকরি করত আকাশবাণীতে। সে ভয়েস অফ আমেরিকায় সংবাদ-পাঠকের পদে ইন্টাররভিউ দিয়ে একরকম চাকরি পেয়ে বসেছিল। ডাক এলেই ওয়াশিংটনে গিয়ে কাজে যোগ দেবে। সেই চাকরির আশায় সে আকাশবাণীর চাকরিতেও ইতিমধ্যে ইস্তফা দিয়ে বসে আছে। সংসারে তখন তার প্রবল টানাটানি। কিসে কার যাজন হয় তা বলা খুবই কঠিন। হাজার কথাতেও একজন হয়তো মাথা নোয়ায় না। কিন্তু একটা কথাতেই তার হয়তো সব কাঠিন্য জল হয়ে যায়। ঠিক মনে নেই কে, তবে কেউ একজন প্রসূনকে খুব আন্তরিকভাবে বলছিল, দাদা সুদূর আমেরিকায় চলে যাচ্ছেন, সৎনামটা গ্রহণ করে যান। ভাল হবে।

এত দিন তুমুল তর্কবিতর্কে যে কাজ হয়নি একজন নাংলা লোকের এই নরম কথায় সেই কাজ হল। প্রসূন দীক্ষা নেবে বলে মনস্থ করে ফেলল। চন্দন যেদিন দীক্ষা নিল তার পরদিনই সকালবেলায় প্রসূন গিয়ে হাজির হল ঠাকুরের কাছে। তার মনোগত ইচ্ছে ছিল ননীদার কাছে নাম নেওয়া। ঠাকুর, কী আশ্চর্য, ননীদাকেই আদেশ দিলেন প্রসূনকে দীক্ষা দিতে।

আমাদের দলের দুজনের এই দীক্ষাগ্রহণ আমার কাছে একটা স্বস্তিদায়ক ঘটনা। দীক্ষান্তে এই দুজনের মধ্যে কী পরিবর্তন হয় তা পর্যবেক্ষণ করাই ছিল আমার বাসনা। যদি দেখি ওদের মধ্যে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটছে তাহলে দীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে আমিও অস্তিবাচক চিন্তা করতে পারি।

রে হাউজারম্যানকে আমার প্রথম আলাপেই বড়ো ভাল লেগে ছিল। এই ছিন্নবাধা মানুষটি তখন ঠাকুরের সঙ্গে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেছেন। মার্কিন নাগরিক হাউজারম্যান সেনাবাহিনীর অফিসার ছিলেন। ব্রহ্মদেশে তাঁর পোস্টিং ছিল। সেখান

থেকে বদলি হয়ে দেশে ফিরে যাওয়ার পথে কলকাতায় কয়েকদিন থাকতে হয়েছিল। সেই সময় আকস্মিক ভাবে স্পেন্স নামে একজন দেশবাসীর সঙ্গে দেখা।

স্পেন্স বিদগ্ধ পণ্ডিত, দার্শনিক, তদুপরি ধনীর দুলাল। তবু বহুকাল আগে তিনি স্বদেশ, আত্মীয়স্বজন ও সম্পদ ছেড়ে ঠাকুরের কাছে চলে এসেছেন, আর ফিরে যাননি। নীলচক্ষু, উদাসদৃষ্টি এই মানুষটিকে দেখলেই শ্রদ্ধা হয়।

স্পেন্স হাউজারম্যানকে ঠাকুরের কথা বললেন। বললেন, কী অনিত্য বস্তু নিয়ে মেতে আছো! বাঁচতে চাও তো, অমৃতের স্বাদ পেতে চাও তো চলো হিমাইতপুর।

হাউজারম্যানের যুদ্ধক্লান্ত হতাশাগ্রস্ত মন তক্ষুণি সায় দিল। আমেরিকার ওই উন্মত্ত জীবনস্রোত আর সুখের পিছনে নিরন্তর ছোটবার একঘেয়েমি তাঁকে আর টানছিল না। স্পেন্স-এর সঙ্গে তিনি রওনা হয়ে পড়লেন হিমাইতপুর।

তারপর দীর্ঘদিন কেটেছে। ত্রিশ বছরের ওপর তিনি রয়ে গেছেন ঠাকুরের কাছে। ঋত্বিকের পাঞ্জা পেয়েছেন। বহু মার্কিন নারী পুরুষকে তিনি এনেছেন ঠাকুরের কাছে।

আমি যখন তাঁকে আশ্রমে প্রথম দেখি তখন তাঁর বয়স চল্লিশের এধার ওধার। উৎসাহ উদ্দীপনায় টগবগে এক তরুণ। ঠাকুর বলতে পাগল। খুব বিড়ি খেতেন আর সারা আশ্রমের নানা কাজে ছুটে বেড়াতেন। ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন, সদাচঞ্চল এই মানুষটিকে আমার বেশ ভাল লেগেছিল। তুলনায় স্পেন্স ছিলেন গম্ভীর, স্বল্পবাক, চিন্তাশীল, ধীরস্থির।

(হাউজারম্যান পরবর্তীকালে আমেরিকায় ঠাকুরের মন্দির তৈরি করেছেন এবং এখন সেখানেই ঠাকুরের কাজ নিয়ে আছেন।)

আশ্রমে আরও কয়েকজন আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ডেগলাল। ডেগলাল স্থানীয় লোক। একসময়ে সে ঠাকুরের এবং আশ্রমেরও প্রবল শত্রু ছিল। লাঠিবাজি সে বড়ো কম করেনি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে ঠাকুরের অমেয় এবং অমোঘ আকর্ষণে তাঁর সান্নিধ্যে আসে। নিরক্ষর ডেগলালকে ঠাকুরই লেখাপড়া শেখান, বি-এ পাশ করান এবং আমেরিকায় পর্যন্ত যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। ডেগলালকে আমি যখন প্রথম দেখি, সে তখন ঠাকুরের একরোখা ভক্ত। ঠাকুরের বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দ করলে লাঠি নিয়ে তেড়ে যায়। প্রসূন না জেনে চায়ের দোকানের আড্ডায় কী একটু ঠাট্টা করেছিল, ডেগলাল তাকে এই মারে কি সেই মারে। ঋত্বিকের পাঞ্জাধারী ডেগলাল কাহার ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেককেই দীক্ষা দিয়েছে।

আমার সঙ্গে তার একরকম ভাবসাব হয়ে গেল।

দিন পাঁচেক অবস্থান, আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ ঘটল বটে কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হওয়ার অবকাশ ছিল না। পাঁচ দিনে অবশ্য যথেষ্ট সৌহার্দ্য ঘটল পরেশদার

সঙ্গে। এই মানুষটি আমাদের রেঁধে খাওয়াতেন, যত্নআত্তি করতেন। আর ছিলেন সদাপ্রসন্ন, হাস্যমুখ ও উষ্ণ হৃদয়ের অধিকারী। এত বছর বাদে আজও তাঁকে সেই রকম লাগে। তেমন কোনও পরিবর্তন ঘটেনি।

আমাদের প্রথম আশ্রয়স্থলটির নাম চৌধুরী ভিলা। সামনে মস্ত লন, বড় বড় ঘর, বিশাল বাথরুম, সব মিলিয়ে একটি অভিজাত বাড়ি। চারদিকে গাছগাছালি বিস্তর। তেমনই নির্জনতা। পাশেই যশিডি-দেওঘর রেল লাইন। রোদ-হাওয়ার ছড়াছড়ি ছিল চৌধুরী ভিলায়। পরিবেশটি আমার অনেক বাল্যস্মৃতি জাগিয়ে তুলেছিল। আমরা ছেলেবেলায় এরকমই নির্জন ও সুন্দর সব রেল বাংলোয় ছিলাম। চৌধুরী ভিলা থেকে ঠাকুরবাড়ির দূরত্ব এক কিলোমিটারের মতো হবে। ওই রাস্তাটুকুর বড়ই সৌন্দর্য ছিল। আজও আছে। তবে নির্জনতা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গাছপালা বেশ কেটে ফেলা হয়েছে। আর রাস্তাটি হয়েছে জরাজীর্ণ। আমরা ওই পথটুকু যখন গল্প করতে করতে হাঁটতাম তখন মনে হত এমন চমৎকার সময় তো কখনও কাটাইনি।

দীক্ষা নেওয়ার আগে থেকেই ঠাকুরের প্রতি আমার একটা প্রচ্ছন্ন ভয়মিশ্রিণত আকর্ষণ জন্মায়। ভয় কেন, তা আগেই বলেছি। মনে হত ইনি আমার ভিতরের সব কথা টের পাচ্ছেন। আর আকর্ষণ অনুভব করেছি তাঁর ওই অহংশূন্য ভাবটির জন্য। ঠাকুর এক রহস্যে ভরা মানুষ, দেবতা কিনা জানি না। তাঁর সম্পর্কে নানা অপপ্রচার আছে, সেগুলো নিয়েও ভাবছি। আবার মানুষটিকে অস্বীকারও করতে পারছি না।

প্রসূন তো বলেই ছিল, উনি যদি শত পাপও করে থাকেন তবু এঁর মতো শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ নিষ্কলঙ্ক মানুষ আমি আর দেখিনি। বহু সাধু-সন্ন্যাসী দেখেছি, কিন্তু এরকম যোগীচক্ষু জীবনে এই প্রথম দেখলাম।

পরবর্তী জীবনে সাধু-সন্ন্যাসী দেখার বিস্তর অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। আমি সকলের মধ্যে ওই উজ্জ্বলতা, ওই কাঁচ-স্বচ্ছ গাত্রত্বকের ভিতর দিয়ে বিকিরিত প্রভা, দুই আয়ত চক্ষুর অন্তর্ভেদকারী দৃষ্টি খুঁজেছি, পাইনি। আসলে তাঁর মতো দ্বিতীয়টি আর নেই কিনা।

যাই হোক, প্রথমবার ঠাকুরকে দেখে আমার অনেক দিন ধরে জমে ওঠা ধ্যান-ধারণায় একটা ঘা পড়েছিল। ভিতরে ভিতরে এক ধরনের আগ্রহ ও পিপাসা জেগে উঠেছিল। কিন্তু বাধা দিচ্ছিল অহংবোধ। দীক্ষা গ্রহণ মানেই তো মাথা নোয়ানো, নিজের স্বাধীন ব্যক্তি-সত্তাকে বিসর্জন দেওয়া এবং খানিকটা ছোট হয়ে যাওয়া। যদি অন্যের হাত ধরেই আমাকে চলতে হয় তবে আর আমার কৃতিত্ব রইল কোথায়?

এই সব ছেলেমানুষি দ্বিধাদ্বন্দ্ব তখন প্রবল। দোটানার মধ্যে পড়ে মনটা বারবার বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে।

এই দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়েই চার পাঁচদিন দেওঘরে অবস্থানের পর কলকাতায় ফিরে এলাম। কিন্তু মনে হচ্ছিল, এ যেন স্বর্গ থেকে বিদায়। জীবনে ওই তিন চারটে দিনের মতো সুন্দর সময় খুব কমই কাটিয়েছি। খুব গভীর জীবনবোধের একটা আভাস, এক রহস্যে ভরা জগৎ যেন চুম্বক পাহাড়ের মতো আকর্ষণ করছিল সর্বক্ষণ। নিজেকে এই পরিবেশ থেকে প্রায় ছিঁড়ে আনতে হল। কিন্তু চোখে মায়াঞ্জনের মতো লেগে রইল ঠাকুরের অপার্থিব মুখশ্রী; দেওঘরের অসামান্য প্রকৃতি আর নানা টুকরো স্মৃতি।

কলকাতায় পা দেওয়ার সঙ্গেই সঙ্গেই ভালুকের মতো চেপে ধরল মেলাঙ্কলিয়া। যে বিষাদ-রোগ কুরে কুরে খাচ্ছিল আমাকে এখন তা বহু গুণ বেড়ে হালুম বাঘের মতো বিশাল হাঁ করে গোটাগুটি গিলে ফেলতে চাইছিল আমাকে। ওরকম মেলাঙ্কলিয়া রোগ আমার মহা শত্রুরও যেন না হয়। তার যে কী গভীর যন্ত্রণা, কী নৈরাশ্যের খাদের মধ্যে যে বাস করতে হয় তখন, কী বান্ধবহীন ও একা লাগে নিজেকে তার বোধ হয় সঠিক বর্ণনাও হয় না। 'দুঃখ রোগ' নামে একটা গল্পের মধ্যে তার কিছু প্রত্যক্ষ বিবরণ দিয়েছিলাম।

ফিরে আসার পর মেলাঙ্কলিয়া যেমন বাড়ল তেমনি মনটা উন্মুখ হয়ে রইল ঠাকুরের দিকে। উনি কি সত্যিই পারেন আমার বিষাদরোগ সারাতে? উনি সত্যিই মহাপুরুষ? উনি কি সত্যিই ঈশ্বরত্বের অধিকারী? নাকি ভণ্ড? নাকি সবটাই সাজানো ব্যাপার? ব্যবসা? যত ভাবি তত ছটফট করতে থাকি। ঠাকুর সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচারগুলোকে তখন কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। তাঁকে যে অন্যরকম দেখে এসেছি।

ঠাকুর নিজেই বলেছেন, সন্দেহ হল ঘুণপোকার মত। প্রশ্রয় দিলে ভেতরে ভেতরে সে মানুষকে ফোঁপরা করে দেবেই। সন্দেহের বিষ তখন আমাকেও কুরে কুরে খাচ্ছে।

দীক্ষা-পূর্ব জীবনে আমার অভিজ্ঞতায় দুটি ব্যাখ্যার অতীত ঘটনা ঘটেছিল। তারই একটি ঘটনা এই সময়ে।

তখন মেলাঙ্কলিয়ার জন্য রাতে ভালো ঘুম হত না। বেঙ্গল কেমিক্যালস বা ওই ধরনের কোনও কোম্পানির একটা ব্রোমাইড মিকশ্চার তখন বাজারে চালু ছিল। আমি সেই ওষুধ এক শিশি কিনে এনেছিলাম, রাত্রে শেওয়ার সময় সেই ওষুধ খেয়ে শুলে শরীরটা কেমন যেন কাঠের মতো আড়ষ্ট বোধ হত। যাকে ঘুম বলে তা হত না বটে, তবে এক ধরনের ঝিমুনি আসত।

সেই ওষুধ খেয়ে একদিন শুয়েছি। একতলার মেসবাড়ির জানালার ধারেই আমার চৌকি। মাঝরাতে হঠাৎ এক বিকট শব্দে তন্দ্রা কেটে গেল। জানালার ধারে রাস্তার উপর অন্তত পনের কুড়িটা কুকুর প্রাণান্তকর চিৎকার করে ঝগড়া লাগিয়েছে, সেই শব্দে ঘুম ভেঙেই আমার বুকের মধ্যে এমন ধপাস ধপাস করতে লাগল যে, মনে হচ্ছিল এক্ষুণি এই চেঁচানি বন্ধ না হলে মরে যাব। শরীরের সমস্ত স্নায়ু যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল সেই শব্দে। মাথা ঝিমঝিম করছিল। এমনিতে কুকুরের ঝগড়া কতই তো শুনেছি, এখনও শুনি। কিন্তু তখন দুর্বল স্নায়ু, দুর্বল মাথা, অনিদ্রা-পীড়িত শরীর ও মস্তিষ্কে সেই শব্দ যেন মুহুর্মুহু হাতুড়ির ঘা মারছিল। আমি যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলাম। এবং কে জানে কেন অস্ফুট স্বরে বললাম, তুমি আমাকে আর যন্ত্রণা দিও না, আমি তোমার কাছেই দীক্ষা নেব।

এই কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পলকে যেন একলব্যের বান কুকুরের মুখ বন্ধ করে দিল। বিবদমান অতগুলি কুকুর কি করে যে একসঙ্গে একেবারে চুপ করে গেল তা কে বলবে? আর সেই কুকুরেরাই পালিয়ে মাড়োয়ারি হাসপাতালের কাছ বরাবর গিয়ে আবার ঝগড়া শুরু করল। কী আশ্চর্য, দূরাগত সেই কুকুরের চেঁচামেচি ঘুমপাড়ানি গানের মতোই ক্রিয়া করল আমার ওপর। বহুদিন বাদে প্রগাঢ় নিদ্রায় আমি ঢলে পড়লাম।

সকালে উঠে প্রাতকৃত্যাদি সেরেই গেলাম শশাঙ্কর কাছে। বললাম সামনে সরস্বতী পুজোর ছুটি আছে. চলো দেওঘরে গিয়ে দীক্ষা নেব।

এই কথায় শশাঙ্কর যে আনন্দ হল তা দেখার মতো। আবেগে সে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। সেই সময় পেটের এক নিদারুণ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল সে। সেই যন্ত্রণা প্রায় ভুলে গিয়ে সে যেতে রাজি হল আমার সঙ্গে।

এইখানে বলে রাখি শশাঙ্কর সেই পেটের যন্ত্রণা কিছুদিন পর পেপটিক পারফোরেশন বলে নির্ধারিত হয়। একেবারে শেষ সময়ে ডায়াগোনসিস হয়েছিল। আর চব্বিশ ঘণ্টার মতো দেরি হলে হয়তো সে বাঁচত না। মেডিক্যাল কলেজে অপারেশনের পর সে বেঁচে যায়।

যাই হোক নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরস্বতী পুজোর আগে রাত্রে আমি আর শশাঙ্ক দেওঘরে রওনা দিলাম। মনটা নানা আশঙ্কায়, অনিশ্চয়তায়, দ্বিধায় ভরা। দীক্ষা নেওয়াটা ঠিক হবে কিনা তখনও বুঝতে পারছি না। আধো ঘুমের মধ্যে কুকুরের চিৎকারে বিভ্রান্ত হয়ে অনির্দেশ্য একজনকে কথা দিয়ে ফেলেছিলাম, দীক্ষা নেবো। শুধু সেই কথা রাখতে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে চলেছি। কাজটা কি ঠিক হচ্ছে? আর অনির্দেশ্য ব্যক্তিটি যে ঠাকুরই তা জেনেও বারবার মনে হচ্ছে, আর কেউ নয় তো?

এই সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মানুষের খুবই স্বাভাবিক। আমরা তো কোন ছার, স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দেরই ছিল।

মনে আছে রাতের ট্রেনে আমি আর শশাঙ্ক রওনা হলাম। শশাঙ্ক বেশ অসুস্থ। পেটে অসহ্য ব্যথা। ভিড়ের গাড়িতে শোওয়ার জায়গা পাওয়া গেল না। বসে বসে গল্প করতে করতে চলেছি।

মাঝরাতে যশিডি পৌঁছে স্টেশনের বাইরে চা খেয়ে নিলাম। তারপর টাঙা ধরে সোজা চৌধুরী ভিলা। ভোররাত্রের দেওঘর আমার মনের ওপর এখনও সেই প্রথমবারের মতোই মায়াজাল বিস্তার করে। পরিস্কার বাতাস, বনজ গন্ধ এবং উচ্চাবচ ভূপ্রকৃতি সব মিলিয়ে একটা স্বপ্ন-স্বপ্ন পরিবেশ।

দরজায় ধাক্কাধক্কি করতে পরেশদা ঘুমচোখে এসে দরজা খুলে দিলেন এবং আমাকে দেখে সত্যিকারের খুশির হাসি হাসলেন। দীক্ষা নিতে এসেছি, ঠাকুরের আশ্রয় নিতে এসেছি, এর চেয়ে আনন্দের বিষয় যে কোনও ভক্তের কাছে আর কী হতে পারে?

স্নান সেরে, পরিচ্ছন্ন হয়ে ঠাকুরবাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। সবে সূর্যোদয় হয়েছে। নিরালা নিবেশে প্রসন্ন মুখে ঠাকুর বসে আছেন। চারিদিকে সমাসীন তাঁর প্রিয় মানুষেরা।

প্রণাম করে বললাম, ঠাকুর, আমি দীক্ষা নেব।

ঘাড় কাত করে সম্মতি দিলেন। তারপর কার দিকে যেন চেয়ে বললেন, ওরে, শৈলেনকে ডাক তো।

শৈলেন অর্থাৎ শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তখন সদলবলে ইউনিভার্সিটির জন্য কোথায় যেন জমি দেখতে যাচ্ছেন। গাড়ি প্রস্তুত। তাঁর তখন সময় নেই। খবর পেয়ে ছুটে এলেন।

ঠাকুর আমাকে দেখিয়ে দিয়ে শৈলেনদাকে বললেন, একে দীক্ষা দিয়ে দে।

শৈলেনদা সামান্য দ্বিধায় পড়ে গেলেন। তাঁকে তক্ষুণি রওনা হতে হবে। অথচ দীক্ষা দিতে গেলে যাওয়াই হবে না। হাত জোড় করে বললেন, ঠাকুর আমি যে কাজে বেরোচ্ছি, সময় নেই।

ঠাকুর সামান্য ধমকের সুরে বললেন, যা বলছি কর গা। দীক্ষা দিয়ে দে।

শৈলেনদা ঠাকুরকে তাড়াতাড়ি প্রণাম করে আমাকে নিয়ে এলেন দীক্ষাগৃহে।

কোন পূর্ব পরিচয় ছিল না শৈলেনদার সঙ্গে। সেই প্রথম পরিচয় হল। মানুষটি ভারী বিবেচক, বিনয়ী, মৃদুভাষী। আমাকে সামনে বসিয়ে দীক্ষাদানের উদ্যোগ করছিলেন।

কিন্তু তখন আমি মনের যে জ্বালায় জ্বলছি তাতে মানসিক ভারসাম্য বলতে

কিছু নেই। মনে হচ্ছিল এই যে দীক্ষা নিতে যাচ্ছি এর ফলে আমার ব্যক্তি স্বাধীনতা গেল, দাসখৎ লিখে দেওয়া হল এবং বিসর্জন দেওয়া হল আত্মমর্যাদা। কিন্তু এর বিনিময়ে আমি কী পাবো? হয়তো কিছুই নয়। হয়তো গোটা ব্যাপারটাই একটা ফক্‌কিকারি।

তাই আমি দীক্ষা নেওয়ার প্রাক্ মুহূর্তে শৈলেনদাকে বললাম, দেখুন আমি দীক্ষা নিচ্ছি একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে। আমার সেই উদ্দেশ্য যদি সফল না হয় তাহলে ছ'মাস পর কিন্তু আমি দীক্ষা ছেড়ে দেবো।

একথায় শৈলেনদা থতমত খেয়ে গেলেন। তারপর বললেন, কী উদ্দেশ্যে আপনি দীক্ষা নিচ্ছেন তা কি আমাকে বলবেন আপনি? আমি আমার মেলাঙ্কলিয়ার কথা তাঁকে সংক্ষেপে বললাম। তারপর জানালাম এই মেলাঙ্কলিয়া সারে কিনা তা আমি ছ'মাস দেখব, কাজ না হলে দীক্ষা ছেড়ে দেবো।

শৈলেনদা একটু হেসে বললেন, দেখুন, ঠাকুরের কাছে ধর্ম করতে কম লোকই আসে। সকলেই আসে কোনও না কোনও উদ্দেশ্য বা স্বার্থসিদ্ধিরর জন্য। বেশির ভাগই আর্ত মানুষ।

আমিও সেইরকমই এক উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি।

শৈলেনদা খুব নিরুদ্বেগ গলায় বললেন, আপনার চেয়ে ঢের বেশি সংকট নিয়ে লোকে এখানে আসে। সেই তুলনায় আপনার সমস্যা কিছুই নয়। আপনি ছ'মাস সময় চেয়েছেন। আমি বলি ততদিন লাগবে না। ঠাকুরের এই অমৃত মন্ত্র নিয়ে যদি সাত দিনও আপনি ঠিকমতো চলেন তাহলেই হবে। আমার প্রশ্ন হল আমি যা যা বলে দেবো তা ঠিকমতো করতে পারবেন তো?

পারব। ডুবন্ত মানুষ তো কুটো আঁকড়ে ধরে।

তাহলে ছ'মাস নয়, সাত দিনে যদি আপনার সমস্যা সমাধান না হয় তাহলেই দীক্ষা ছেড়ে দেবেন।

তাঁর ওই মনের জোর এবং বিশ্বাসের গভীরতায় আমি বেশ প্রভাবিত হলাম। যদিও তাঁকে আমার তখনও এতটা বিশ্বাস হচ্ছে না। সন্দেহ কাজ করছে ভিতরে ভিতরে।

বিনা আড়ম্বরে দীক্ষা হয়ে গেল। বীজমন্ত্রটি পাওয়ার পর থেকেই আমি ভয়ে হোক, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হোক, যান্ত্রিকভাবে জপ করে যেতে লাগলাম।

দুপুরে ঠাকুরের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করতেই তা মঞ্জুর হল। তখন ঘরে বিশেষ কেউ ছিলেনও না। আমি আর পরেশদা নিরালা নিবেশে তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম। ঠাকুরের সঙ্গে আমার দূরত্ব মাত্র দু তিন হাত। অত কাছে আর কখনো যাইনি তাঁর। সেই প্রথম তাঁর নৈকট্যে আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল।

মনে হচ্ছিল তাঁর চারিদিকে একটি অভ্রান্ত বৈদ্যুতিক বলয় রয়েছে। তাঁর অস্তিত্ব থেকে একটা কোনো শক্তি বা দ্যুতি বা ব্যাখ্যার অতীত কোনো কিছু আমাকে স্পর্শ করেছে।

ঠাকুর মন দিয়ে আমার সমস্যার কথা শুনলেন। আমি অবশ্যই খুবই সংক্ষেপে আমার কথা বলেছিলাম। দু-তিন মিনিটও বোধ হয় লাগেনি। আসলে তাঁর অত কাছাকাছি বসে আমার কেমন স্নায়ুদৌর্বল্য ঘটেছিল। বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ওরকম কোনও ভাগবৎ মানুষের দেখা তো কখনও পাইনি। ওই অভ্রভেদী ব্যক্তিত্ব, দুটি হীরকদীপ্ত চোখ, অন্তর্ভেদী গভীর দৃষ্টি এসবই আমার কাছে এক পরম বিস্ময়।

ঠাকুর আমার সমস্যাকে কিন্তু একেবারেই গুরুত্ব দিলেন না।

মাথা নেড়ে বললেন, তুমি উল্টোটা ভাবো। তুমি অজর, অমর, মৃত্যুর কথা ভাববে কেন? ওসব ভাবতে নেই।

আমি বললাম, ভাবতে তো চাই না। কিন্তু ভাবনা আসে যে।

ঠাকুর তেমনি দ্বিধাহীন ভাবে শুধু বললেন, ওসব ভাবতে নেই।

এর মধ্যেই পরেশদাকে তামাক সাজাতে বললেন। তারপর চুপ করে গেলেন। আমি তাঁর দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছি, আর তাঁর অসহনীয় দীপ্তি সহ্য করতে না পেরে মাথা নিচু করছি বারবার।

শেষে বললাম, আপনি আশীর্বাদ করবেন, যেন আমি এই মানসিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারি।

ঠাকুর মাথা হেলিয়ে সম্মতি দিলেন।

প্রণাম করে চলে এলাম। তাঁর সঙ্গে আমার একমাত্র একান্ত সাক্ষাৎকার এভাবেই শেষ হল।

ডুবন্ত মানুষ যেমন কুটো আঁকড়ে ধরে আমি তেমনি ধরে ছিলাম সদ্যলব্ধ বীজমন্ত্রটিকে। এটুকু বুঝেছিলাম বীজমন্ত্রটাই আসল। ওই শব্দটাই একমাত্র আমাকে রক্ষা করতে পারে। আর যদি বীজমন্ত্র জপে কাজ না হয় তাহলে আর কিছুতেই হবে না। তাই দীক্ষা নেওয়ার পরেই আমি পাগলের মতো জপ করে গেছি। যান্ত্রিকভাবে ভক্তি বিশ্বাস ছাড়াই এবং সন্দেহাকুল মনেই পরদিন দেওঘর ছাড়লাম। চলে গেলাম মুরি। সেখানে আমার ছোট পিসিমা তখন থাকতেন। সেখানে দু'দিন অবস্থানের পর কলকাতায় ফিরে এলাম। আর ফিরেই বুঝতে পারলাম, আমার মেলাঙ্কলিয়া বা বিষাদরোগ সম্পূর্ণ সেরে গেছে।

বিষাদের কাঁটাটি ঠাকুর কখন সন্তর্পণে তুলে নিয়েছেন তা আমি অনেক ভেবেও আজ অবধি বুঝে উঠতে পারিনি।

মাঝে মাঝে অলৌকিক নিয়ে আমাকে কেউ কেউ প্রশ্ন করে। আমি তার সদুত্তর দিতে পারি না। অলৌকিককে তো ব্যাখ্যাও করা যায় না। কিন্তু জানি, আমাদের

বুদ্ধির যুক্তির অতীত কত কি ঘটে যায়।

ঠাকুরের কাছে যাওয়ার আগে আমার জীবনে ঠিক এরকম ঘটনা কখনও ঘটেনি। কিন্তু পৃথিবীর এমন কোনও ঘটনাই ঘটে না যার পিছনে পারম্পর্য নেই বা যা অযৌক্তিক বা অলৌকিক। ঠাকুর নিজেও তাই বলতেন, কোনও ঘটনা আমাদের স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না বলেই যে তা অলৌকিক তা কিন্তু নয়। কারণ থাকেই, তবে হয়তো তা আমাদের সাধারণ যুক্তি বা বোধের অগম্য।

বীজমন্ত্র বা নাম জপ করলে রোগ সারে, অনেক সংকটের সমাধান হয় তা আমি নিজের বত্রিশ বছরের দীক্ষিত জীবনে অসংখ্যবার দেখেছি। নাম যে কতখানি অঘটনঘটনপটীয়সী তা আমার ঠেকে শেখা।

॥ দুই ॥

যে তিনটি স্তম্ভের ওপর ঠাকুর তাঁর জীবনসত্যকে স্থাপন করেছেন তা হল যজন যাজন ইষ্টভৃতি। এই আপাতসহজ তিনটি আদর্শকে অনুসরণ করলে যে কোনও মানুষের ভিতরকার সুপ্ত ক্ষমতা জেগে উঠতে থাকে। সে যে কতখানি হয়ে উঠতে পারে তার ঠিক ঠিকানা নেই। কিন্তু এই তিনটি করণীয়কে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আপাতসহজ মনে হলেও মোটেই তা সহজ নয়। ওই তিনের মধ্যে একজন মানুষের গোটা জীবনের সব কিছুই পোরা রয়েছে। ওই তিনের মধ্যেই জীবন-রহস্যের সব সমাধান। আর করতে গেলে দেখা যায় যজন যাজন ইষ্টভৃতি এই তিনটি পরস্পর এতই সম্বন্ধযুক্ত যে একটি না করলে অন্যটি হয়ে ওঠে না। যজন যাজন ইষ্টভৃতি নিয়ে বহু জন বহু কথা বলেছেন, বহু ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তবু শেষ হয়নি। আরও বহুকাল ধরে এই নিয়ে আলোচনা গবেষণা হতেই থাকবে।

ঠাকুর স্বয়ং এক অতলান্ত রহস্য। একদিকে চূড়ান্ত বাস্তববাদী অন্যদিকে এক অপার্থিব অলৌকিক প্রেমিক পুরুষোত্তম। কীর্তনের যুগে, অর্থাৎ ঠাকুর যখন নব্য যুবা, তখন নিজেকে ঘিরে এক ভাবপরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলেন। তখন তিনি সমাধিস্থ হতেন প্রায়ই, আর তাঁর যাঁরা ঘনিষ্ঠ তাঁরাও উন্নীত হতেন ভাবময় এক পর্যায়ে। তখন ধ্যান করতে বসলেই নানা জনের নানা দর্শন ও শ্রবণ হত। ঠিক কতদিন চলেছিল এই অবস্থা তা সঠিক বলা মুশকিল। তবে ক্রমে ক্রমে এই ভাবমুখিনতা হ্রাস করে কর্মকাণ্ডের দিকে ঝুঁকলেন ঠাকুর। তার কারণ খুবই সহজ। কর্ম ছাড়া মানুষের মুক্তি নেই, মোচন নেই, সম্পূর্ণতা নেই। কর্মের কথাই বারংবার আমাদের শাস্ত্রাদিতে বলা হয়েছে।

এই কর্মযুগ যখন শুরু হল তখন ঠাকুর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গতিবেগ সঞ্চার করে দিলেন তার মধ্যে। কাজের সেই দ্রুত তালের সঙ্গে কীর্তন যুগের সঙ্গীরা তেমন সঙ্গতি রাখতে পারলেন না। একটু থতমত খেয়ে গেলেন। হয়ত একটু ক্ষুব্ধও হলেন কেউ কেউ। বেশ তো ছিল ভাবে মাতোয়ারা হয়ে থাকার ভক্তিময় যুগ। তবে এই কর্মকাণ্ড কেন?

আসলে ঠাকুরকে প্রাকৃতজনদের বুঝতে একটু অসুবিধে হয় এই কারণেই। জীবনের অতি দ্রুত তাল তাঁর। এক আয়ুর মধ্যে যেন দশ বিশ হাজার বছরের কর্মকাণ্ডের ভার নিয়েছিলেন তিনি। এই দ্রুততার সঙ্গে তাল রাখতে পারে কোন মানুষ?

শুনেছি ঠাকুর এত দ্রুতবেগে হাঁটতেন যে তাঁর ভ্রমণসঙ্গীরা দৌড়েও তাঁর সঙ্গে পেরে উঠতেন না। হাঁটার ভঙ্গির মধ্যে এক ভাসমানতাও ছিল তাঁর। যা কিছু কাজের কথা তাঁর মাথায় আসত তা তৎক্ষণাৎ রূপান্তরিত না করে শান্তি পেতেন না। মাঝে মাঝে ভক্ত শিষ্যদের কাছে এমন সব আব্দার করতেন যেটাকে প্রায় অসম্ভব বা অসাধ্য বলেই মনে হত।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁর সেইসব অসম্ভব আব্দার পূরণ করতে নিতান্ত নাংলা সব শিষ্যরাও ঠিক পেরে উঠত। মানুষের যোগ্যতা বৃদ্ধির দিকে ঠাকুরের লক্ষ্য ছিল সর্বাধিক। অধিকাংশ মানুষই যে নিহিত গুণাবলীর সম্যক ব্যবহার করে না, ঠাকুর সেই লুকানো গুণাবলীই টেনে বের করতেন। তাই সামান্য মানুষকে অসামান্য কাজের দায়িত্ব দিতে দ্বিধা বোধ করতেন না। আর এইভাবে কত অযোগ্যকেই যে ঠাকুর যোগ্য করে তুলেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

এই অলোকসামান্য দার্শনিক এবং অনন্য চিন্তাবিদ যে বাস্তববোধেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তার দৃষ্টান্ত তাঁর কর্মকাণ্ড। পাবনার হিমাইতপুর গ্রামে তিনি যা গড়ে তুলেছিলেন সেটা বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। ব্রিটিশ আমলে অলস বাঙালি যখন মোটামুটি কোনও রকমে বেঁচে থাকাটাই বেঁচে থাকার চূড়ান্ত বলে ধরে নিয়েছিল, তখন ঠাকুর স্বনির্ভরতার পথ খুলে দিয়েছেন মানুষের কাছে। ইংরেজ বিতাড়নই যে স্বাধীনতা এটা তিনি কখনোই মানতেন না। স্বনির্ভর কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন, বাস্তববোধের অধিকারী স্বনির্ভর সমাজ গঠিত না হলে স্বাধীনতা বা স্বরাজ যে নজরুলের ভাষায় 'পোড়া বার্তাকু'-তে পরিণত হবে তা তিনি বহুবার বলেছেন। মানুষের চরিত্র গঠনের কোনও প্রকৃত প্রয়াস যেমন পরাধীন যুগেও ছিল না, তেমনি এ যুগেও নেই। কিংবা যা আছে তা মনুষ্য চরিত্র অনুধাবন না করেই এক ধরনের ভাসা ভাসা জ্ঞানের ওপর মানুষের চরিত্র গঠনের বিচ্ছিন্ন ও অপ্রতুল প্রয়াস।

ঠাকুরের সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন তাঁরাই জেনেছেন প্রতিটি মানুষই তাঁর কাছে

কেমন পরম সম্পদের মতো ছিল। কোনও মানুষকেই তিনি কখনো তুচ্ছ বা সামান্য ভাবতেন না। প্রত্যেককেই দিতেন তাঁর নিজস্ব মূল্য। আর প্রত্যেকের ভিতরেই দেখতে পেতেন যার যার বৈশিষ্ট্যমাফিক সম্ভাবনার বীজ। মানুষের উপরেই ঠাকুরের নির্ভর ছিল বলে মানুষকে সম্পদ করে তোলা কত সহজ হয়েছিল তাঁর পক্ষে।

হিমাইতপুরের মতো গ্রামে তিনি সেই আমলে যে সংগঠন গড়ে তোলেন তা অবিশ্বাস্য। বিশ্ববিজ্ঞান থেকে শুরু করে গেঞ্জিকল, ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে ছুতোর কামারের কাজ অবধি সব ব্যাপারেই সৎসঙ্গ এক বিশাল কর্মযজ্ঞ খুলে বসেছিল। ছিল ওষুধ তৈরির কারখানা, প্রেস ইত্যাদিও। আর এই সব ঠাকুর গড়ে তুলেছিলেন অতি সাধারণ সব মানুষকে নিয়েই।

মানুষের পরিশ্রম করার ক্ষমতা কতখানি তার সম্যক ধারণাই আমাদের নেই। আমরা একটু কাজ করেই বিশ্রাম খুঁজি। ঠাকুরের সঙ্গে যাঁরা করেছেন তাঁরাই জানেন ঠাকুর তাঁর সঙ্গীসাথীদের দিয়ে অতি-মানুষের খাটুনি খাটিয়েছেন। কিন্তু তাতে তাঁদের আয়ুক্ষয় তো হয়ইনি বরং আয়ুবৃদ্ধি ঘটেছে, স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য ও কর্মক্ষমতা বেড়েছে বহুগুণ। ডাক্তাররা মানুষকে দিনে আট ঘণ্টা ঘুমোনোর পরামর্শ দেন, কিন্তু ঠাকুর বলতেন, চার ঘণ্টা ঘুমই বহুত। এবং ওই চার ঘণ্টা ঘুমও তিনি বোধ হয় কখনোই ঘুমোননি। দিনের পর দিন ঘুমহীন কেটে যেত তাঁর এবং সঙ্গীদের। এই নিদ্রাহ্রাসের অভিজ্ঞতা আমারও আছে। দেখেছি, ঠাকুরের কাজকর্ম যজন যাজন নিয়ে থাকলে ঘুম খুব কমে যায় এবং শরীরে আসে বাড়তি উদ্যম।

ঠাকুর ফ্যাটিগ লেয়ার পার হয়ে যাওয়ার কথা বলতেন। অর্থাৎ খুব কঠিন পরিশ্রমের পর যে শ্রান্তি আসে তা সাময়িক এবং মানুষ যদি তার পরও কাজ চালিয়ে যেতে থাকে, তাহলে এক সময় ওই শ্রান্তির ভাবটা কেটে বাড়তি উদ্যম দেখা দেয়। এটা শুধু মুখে বলেই ঠাকুর ক্ষান্ত হননি, করে এবং করিয়ে তবে ছেড়েছেন। ঘুমের ক্ষেত্রেও তাই। মানুষের যখন ঘুম পায় তখন একটু জোর করে জেগে থাকলে ঘুমের ভাবটা কেটে গিয়ে মানুষ আবার চনমনে হয়ে ওঠে।

ঠাকুর অনেক কাজই করতেন প্রচলিত ধ্যানধারণা ও যুক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতিতে। যুক্তির পরিধি বড়োই ছোট। বুদ্ধি বা যুক্তি দিয়ে পৃথিবীর সব রহস্যের উন্মোচন অসম্ভব।

ঠাকুরের সব ব্যাপারেই ধ্যানধারণা ও বক্তব্য এত স্পষ্ট, দ্বিধাহীন ও পরিষ্কার ছিল, যা এই যুগের দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতার কাছে খুবই বিস্ময়কর মনে হবে। কখনো কোনো অবস্থাতেই নিজের বক্তব্য থেকে তিনি এক চুল সরে যাননি, আবার কখনো কোন বিতর্কেও জড়িয়ে পড়েননি। যে কথা সত্য ও যা মঙ্গলপ্রদ তা অকপটে বলতে তাঁর কোনও দ্বিধা ছিল না, কিন্তু বলার মধ্যে বিনয় ও হৃদয়গ্রাহিতা ছিল গভীর।

আমার নিজের কাছে ঠাকুরের অনেক কথাই তেমন মনঃপুত হয়নি প্রথম প্রথম। বিশেষ করে বর্ণাশ্রম ও বিবাহ সংক্রান্ত কঠোর মনোভাবে আমার সায় ছিল না। খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচার, অন্যের হাতে অন্নগ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারও পছন্দ ছিল না। অত্যধিক ভক্তি ও প্রেমকেও কেমন যেন দাসত্ব বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই সব ধোঁয়াশা কেটে যেতে লাগল। আপোসহীন ঠাকুরের সঙ্গে আপোস করে নিতে আমার একটু সময় লেগেছিল এই যা।

তারপর ক্রমে ক্রমে যতই ঠাকুরকে বুঝবার চেষ্টা করেছি ততই সত্যের অনন্ত মুখ খুলে গেছে। তাঁর মধ্যে অবগাহন করতে একবার শুরু করলে আর অন্য কোথাও ডুব দেওয়ার ইচ্ছে হয় না। ঠাকুর কাউকে সর্বত্যাগী সাধু বানাননি, এমনকি যতিদেরও এক ধরনের বাঁধনে বেঁধে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর নিয়তকর্মীরা অনেকেই ছিলেন কঠোর তপস্বীদের চেয়েও অধিক কৃচ্ছ্র সাধনে অভ্যস্ত। সাধুদের জীবন-যাপনে ততটা সংযম এবং কৃচ্ছ্র সাধন নেই। ঠাকুর যেমন চলনায় নিজে চলতেন এবং যেমন চলনা শিষ্যদের মধ্যেও তাঁর অভিপ্রেত ছিল তা বড়ো সহজ নয়।

ঠাকুরের সাংগঠনিক যুগে এই সন্ন্যাসীপ্রতিম নিয়তকর্মীরাই ঠাকুরের বাণী বহন করে গেছেন ভারতবর্ষের দূর ও দুর্গম প্রত্যন্তে। তাঁরা যে অসাধ্য সাধন করেছেন তার প্রকৃত মূল্যায়ন এখনও হয়নি। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, দীর্ঘ-প্রবাস, ভর্ৎসনা, লাঞ্ছনা এসবই তাঁদের সয়ে নিতে হয়েছে। আর এর ভেতর দিয়েই ঠাকুর তাঁদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার পথে ঠেলে নিয়ে গেছেন।

গুরু কে এবং কেমন, গুরুর গুরুত্ব কতখানি তা চোখে আঙুল দিয়ে ঠাকুরই আমাদের প্রথম বুঝিয়ে দিলেন, দেখিয়ে দিলেন। আজকাল সাধক পুরুষেরা মানুষকে আধ্যাত্মিকতার দীক্ষা দেন বটে কিন্তু সংকোচবশে কঠোর অনুশাসন তাদের ওপর আরোপ করেন না। খাদ্যাখাদ্য, সদাচার, বর্ণাশ্রম, ব্যক্তিগত সততা, শৃংখলাপরায়ণতা ইত্যাদি ব্যাপারে শিষ্য-শিষ্যাদের তাঁরাও ঢালাও স্বাধীনতা দিয়ে দেন। এর ফলে তাঁরা দীক্ষার ভিতর দিয়ে দক্ষ হয়ে ওঠার সুযোগ কমই পান। দীক্ষার পর তাঁদের চরিত্রে তেমন কোনো পরিবর্তনও আসে না। গুরু একজন মাথার ওপর আছেন, শুধু এই ভরসায় তাঁরা যেমন খুশি চলেন।

ঠাকুরের পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি যেমন প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিতেন, তেমনি প্রত্যেককে নিত্য পালনীয় অনুশাসনেরও আওতায় আনতেন। শুকনো উপদেশ দিয়ে ছেড়ে দেওয়ার মানুষ তিনি ছিলেন না। যারা তাঁর আশ্রয় নিয়েছে তাদের ভালমন্দের দায়িত্বও সুতরাং তিনি স্বীকার করে নিতেন। এখনও নেন। তারা কেউ অনিয়ম করলে, বিধিভঙ্গ করলে, উল্টোরকম চললে যা ঘটবার তা ঘটত। তার পরেও তিনি ক্ষমা করতেন এবং বিধিমতো আবার তাকে সঠিক

পথে চালানোর চেষ্টা করতেন।

আধুনিক যুগে ঠাকুর কিছু কালপ্রাচীন প্রায়শ্চিত্তবিধি পুনঃ প্রচলন করেছেন। এ এক অদ্ভুত দুঃসাহস ও দূরদর্শিতা যুগপৎ তাঁর মধ্যে দেখা গেল। দুঃসাহস এই কারণে যে এই সব ক্লেশদায়ক প্রায়শ্চিত্ত এ যুগের ধৈর্যহীন মানুষের গ্রহণ বা স্বীকার করার কথাই নয়। দ্বিতীয়ত, এই প্রায়শ্চিত্ত কতদূর ফলপ্রসূ তা নিয়েও সন্দেহ থাকাটা স্বাভাবিক। ঠাকুরের দেওয়া এই প্রায়শ্চিত্তবিধি নিয়ে দু'চার কথা বলার প্রয়োজন তো আছেই, তার চেয়েও বড় কথা এই প্রায়শ্চিত্ত জিনিসটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তাও দেখা দরকার।

ঠাকুর পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, প্রায়শ্চিত্ত দণ্ড নয়। শাস্তি নয়। মানুষ যখন সত্তা-বিরোধী কিছু করে তখন সে তার স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে আবার সে চিত্তে অর্থাৎ মঙ্গলে অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কোনও কার্যের জন্য অনুতপ্ত হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার পর আর ওই কার্যটি কখনো করতে নেই। বারবার অপরাধ করা আর বারবার প্রায়শ্চিত্ত করা কিন্তু মানুষকে ভ্রষ্টই করে।

সামান্য কোনও বিচ্যুতির জন্য সহজ প্রায়শ্চিত্তের বিধান হ'ল, একদিন হবিষ্য করা। বিভিন্ন রকম লঘু বা গুরু বিচ্যুতির জন্য শিশু প্রাজাপত্য, প্রাজাপত্য, পিপীলিকামধ্যস্থ চান্দ্রায়ণ, যবমধ্যস্থ চান্দ্রায়ণ, মহাসান্তপন ইত্যাদির বিধান রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এর মধ্যে এমনই জীবনীয় এক শুদ্ধিকরণ রয়েছে যার কোনও তুলনা হয় না। ঠাকুর লুপ্তপ্রায় এই সব প্রায়শ্চিত্ত বিধিকে আবার প্রচলিত করেছেন মানুষের ক্লিষ্ট, বিচ্যুত চলনাকে আবার গতিবেগসম্পন্ন ও উজ্জ্বল করতে। তার চেয়েও বড় কথা, এই সব প্রায়শ্চিত্ত যে নিতান্তই কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথা নয়, এসব যে অতিশয় বাস্তবভাবে ফলপ্রসূ এবং অমৃতবাহী তাও সুপ্রমাণিত হয়েছে। ধর্মীয় বিধিনিষেধের মধ্যে অনেকগুলোই নিছক গোঁড়ামি এবং অন্তঃসারশূন্য। কিন্তু কিছু বিধিনিষেধ এবং নিদান অতিশয় কার্যকরী। কিন্তু কোনটা গ্রহণীয় কোনটা বর্জনীয় তা বিচার করার মতো সত্যদৃষ্টি তো আমাদের নেই। ঠাকুর সেই অতি প্রয়োজনীয় নির্বাচনটি করে দিয়েছেন দয়া করে।

এই সব প্রায়শ্চিত্ত যাঁরা করবেন তাঁরা প্রভূত উপকার পাবেন ঠিকই, কিন্তু মনে রাখতে হবে অপরাধ, পাপ বা বিচ্যুতির জন্য প্রকৃত অনুতাপ আসা চাই এবং পাপস্খালনের জন্য স্বতঃসিদ্ধ আগ্রহের সঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। অনুতাপই হ'ল গোড়ার কথা এবং পাপ বিনির্মুক্ত হওয়ার আগ্রহই প্রায়শ্চিত্তের সার্থকতা এনে দেয়।

তবে অদীক্ষিত কারও পক্ষে এই প্রায়শ্চিত্ত করা সম্ভব নয়। কারণ, নামধ্যান-পরায়ণতা এবং ইষ্টনিষ্ঠা ধরে না রাখলে প্রায়শ্চিত্ত উল্টো ফলই দিতে পারে।

প্রায়শ্চিত্ত করা মানেই আরও বেশি ইষ্টমুখী হওয়া।

ঠাকুরের দেওয়া এরকম প্রায়শ্চিত্তবিধি অন্যত্র দেখতে পাওয়া যায় না। মানুষ আজকাল স্বেচ্ছায় এসব কষ্টকর ব্যাপারে যেতে চায় না বলে অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠনে এগুলোর প্রচলন নেই। কাজেই ঠাকুরকে এ ব্যাপারে পথিকৃৎ বলতেই হয়।

আমার নিজের জীবনে এই প্রায়শ্চিত্তের যে কী বিশাল ও গভীর তাৎপর্য আছে তা বোধ হয় ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না। তবে প্রায় পাঁচ-ছয় বছরে দারিদ্র্য ব্যাধি একটিমাত্র শিশু প্রাজাপত্যে কেটে গিয়েছিল। অবশ্য অনুতাপও ছিল গভীর।

কতরকমের ভুলচুক যে আমরা সব সময়ে করে চলেছি, নিত্য পাতিত্যের দোষ ঘটে যাচ্ছে তা দেখবার চোখই আমাদের নেই। মানুষ তো নিজের ব্যাপারে ভীষণ রকমের অন্ধ। কিন্তু ভুলচুক ধরতে দ্বিধা করা উচিত নয়। নিজেকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নিয়মিতভাবে জবাবদিহি আদায় করতে হয়। যত বড় অপরাধই ঘটে থাকুক না কেন ঠাকুর ক্ষমাশীল, ঠিকই আবার পাপ থেকে বিনিমুক্ত করে তুলবেন। আর তাঁর দেওয়া অমৃতবাহী প্রায়শ্চিত্ত করবে শুদ্ধ ও পবিত্র।

এই যুগে বসে ঠাকুর যে সব অমোঘ মুষ্টিযোগ আমাদের দিয়ে গেছেন তা তুলনারহিত। এ যুগের ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ যুগের মানসিকতার সঙ্গে বেখাপ্পা। এই সব মুষ্টিযোগকে আপাতদৃষ্টিতে বিচার করলে আমরা ঠকে যাব। এ হাতে-কলমে অনুরাগ ও আগ্রহ নিয়ে করে দেখলে তবেই এর গভীরতা ও সার্থকতা বোঝা যায়। তাছাড়া মানুষের নিহিত গভীর পাপবোধ এবং অনুতাপের দাহ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথও তো ঠাকুর ছাড়া আর কেউ হাতে কলমে করে দেখাননি।

পাপবোধের যন্ত্রণা যে কী সাংঘাতিক তা আজকালকার মানুষেরা কে-ই বা না জানে? এই পাপবোধ থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও উপায় জানা নেই বলে সারা জীবন তাকে এক দুরারোগ্য যন্ত্রণা কুরে কুরে খায়। নানা আধি ব্যাধি এবং পাগলামিরও সৃষ্টি হয় এই মানাসিক চাপ থেকে। জীবনটা তার কাছে উপভোগ্য, গতিময়, সৌন্দর্যমণ্ডিত মনে হয় না।

অথচ কত সহজেই, সামান্য আয়াসেই যে এগুলোকে কাটিয়ে ওঠা যায় তা ঠাকুরের কাছে না এলে বুঝতে পারতাম না। মানুষের জন্য ঠাকুর যে কত করেছেন তার বুঝি হিসেব হয় না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তবিধি তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা বোধকে গভীর করে তোলে।

অবশ্য মনে রাখতে হবে অদীক্ষিতদের পক্ষে এসব প্রায়শ্চিত্ত করা সম্ভব নয়। মনে হয়, ঠাকুরের আশ্রয় ভিন্ন অন্য কোনও ভাবেই এইসব প্রায়শ্চিত্ত তেমন ফলবতী হবে না। কারণ প্রকৃত নামধ্যান-পরায়ণতা ছাড়া কঠোর ব্রতধারণ অর্থহীন। খ্যাপন ও প্রকৃত অনুতাপই হচ্ছে প্রায়শ্চিত্তের মূল কথা। আর প্রগাঢ় নাম ধ্যান করলে

প্রায়শ্চিত্তের কষ্টটাও তেমন বোধ করা যায় না।

ঠাকুরের বর্ণাশ্রম বিষয়ে মতামত নিয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। এই একটি বিষয়, যা নিয়ে সারা দেশেই তুমুল আপত্তি উঠেছে বিশেষ করে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহল থেকে। বর্ণাশ্রম যে অতিশয় অর্থহীন, যুক্তিহীন কুসংস্কার, এ যে বর্ণহিন্দুদের অপরাপর শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখার কৌশলমাত্র সে বিষয়ে অনেকেই সোচ্চার।

কথাটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিকও নয়। ঠাকুরের কাছে আসবার আগে এ ব্যাপারে আমার মতামতও অনুরূপ ছিল। মানুষে মানুষে সমান এই আপ্তবাক্যে আমার গভীর বিশ্বাস ছিল।

ঠাকুরের কাছে আসার পর তাঁর মতামতের যে দু'একটির সঙ্গে আমার দ্বিমত ঘটেছিল তার মধ্যে একটা ওই বর্ণাশ্রম। বর্ণাশ্রম মানেই যে জাতিভেদ এবং বিদ্বেষ এটা আমাদের সমাজেও মাঝে মাঝে প্রকট হয়ে পড়ে। তার ওপর এই প্রথা খুব একটা কালপ্রাচীন নয়। চার বেদের মাত্র একটিতে বর্ণাশ্রমের সামান্য উল্লেখ পাওয়া যায় বলে শিবনাথ শাস্ত্রী দেখিয়েছেন।

কিন্তু কথা হল, বর্ণাশ্রম নিয়ে হিন্দু সমাজে যতই জল ঘোলা হয়ে থাকুক এটির মূলে যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এ বিষয়ে দ্বিমত থাকা উচিত নয়। ঠাকুর যখন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন যে প্রকৃতিতে কোথাও সাম্য নেই, সর্বত্রই এই সৃষ্টির বিচিত্র প্রকাশের ভিতরে ওই বর্ণাশ্রমই রয়েছে। আম, জাম, কলা, কমলালেবু, ঘোড়া, ভেড়া, কুকুর, গরু, ধান, গম সব কিছুর ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে প্রকৃতিতে কোনও একঢালা ব্যবস্থা নেই। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণী ভাগ ঘটেই আছে। মানুষের মধ্যেও যে আছে তা তো অনস্বীকার্য। তবু যে অনেকে আধুনিক বর্ণাশ্রমকে স্বীকার করতে চায় না তার প্রধান কারণ, বর্ণাশ্রমের চোরা পথ দিয়ে দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের ওপর শোষণ ও অত্যাচার চালানো সহজ। আর সে ঘটনা ঘটেছেও অনেক। কিন্তু সেইজন্য ধর্ম জিনিসটাকেই যাঁরা দায়ী করেন তাঁদের বুদ্ধি বিবেচনার প্রশংসা করা যায় না। পৃথিবীতে মানুষে মানুষে সংঘাত নানা কারণেই ঘটে থাকে, দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারও ঘটে তাকে, দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারও ঘটে প্রকৃতির নিয়মে। ধর্ম বরং মানুষে মানুষে বিভেদের অবসান ঘটানোর জন্যেই যা কিছু নীতিবিধি দেয়। মনুর অনুশাসন নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠেছে সঙ্গত কারণেই। কিন্তু মনুর সংহিতায় যেসব পৈশাচিক ব্যবস্থার বিধান দেওয়া আছে সেগুলোকে প্রক্ষিপ্ত অংশ বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। সে আমলে এরকম তো পুঁথির লিপিকররা হামেশাই করত।

ধর্মকে নানা ধরনের বিকৃতির পাঁক থেকে ঠাকুর উদ্ধার করেছেন তাঁর অনবদ্য

সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এবং প্রয়োগের দ্বারা। ঠাকুর কঠোরভাবে বর্ণাশ্রম মানতেন, কিন্তু তার মধ্যে বিভেদের বালাই ছিল না, সৎসঙ্গে চার বর্ণের হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেই কি মিলেমিশে যায়নি? ধর্মের উদ্দেশ্য জীবনমুখী, ধর্মের উদেশ্য মানুষকে মঙ্গলে অধিষ্ঠিত করা, ধর্মের উদ্দেশ্য মানুষকে যোগ্য সফল ও সার্থক করে তোলা। ঠাকুর যে বর্ণাশ্রম মানতেন তার পিছনে একটা অর্থনৈতিক কারণও ছিল। বর্ণ অনুযায়ী বৃত্তিকে আশ্রয় করলে আজ দেশে যেমন বেকার সমস্যা থাকত না, তেমনি আবার বিচিত্র উৎপাদনে দেখা যেত অতিশয় দক্ষতা।

আজকাল গ্রামীণ সমাজে বেকারের সমস্যা যে এত ভয়াবহ তার কারণ কুটিরশিল্পগুলির অকালমৃত্যু। আমাদের অদূরদর্শিতার ফলে আমরা কুটিরশিল্পের জিনিসগুলি বৃহৎ শিল্পে উৎপাদন করতে শুরু করেছিলাম। ফলে লাঙলের ফাল, কোদাল, কুড়ুল, দা সবই তৈরি হতে লাগল বৃহৎ ইস্পাত কারখানায়। গাঁয়ের কামার বৃত্তি হারাল। তাঁতীদেরও দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো কলের বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়। গ্রামের অর্থনীতির বুনিয়াদ এইভাবে ভেঙে পড়ল। ঠাকুর বারবার বর্ণানুযায়ী বৃত্তির কথা বলতেন, যাতে বংশগত দক্ষতা থেকে পরম্পরায় উন্মেষশালিনী বুদ্ধি ও দক্ষতা গজিয়ে ওঠে। বৃত্তি তাহলে অটুট থাকত। গ্রামভিত্তিক ভারতবর্ষকে রাতারাতি শিল্পায়নের মাধ্যমে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে গিয়ে আমরা এই বিপুল অনাবশ্যক বেকার সমস্যা তৈরি করতাম না।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ঠাকুরকে গ্রহণ করেন শেষ বয়সে। তাঁর অনেক ধাঁধা ও মানসিক দ্বন্দ্ব ঠাকুর মোচন করেছিলেন বটে কিন্তু তিনিও ঠাকুরকে বুঝতে পেরে উঠে পড়ে কাজে লাগবার উদ্যোগ করেছিলেন। কিন্তু তখন আর তাঁর আয়ুর সময় বিশেষ ছিল না। তার মধ্যেই গান্ধীজীকে অনুরোধ করে তিনিই আশ্রম পরিদর্শনে পাঠিয়েছিলেন। এসেছিলেন দেশবরেণ্য অনেক নেতাই। আশ্রমের কর্মকাণ্ড দেখে তাঁরা প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, একথাও সত্যি। কিন্তু ঠাকুরের জীবনমুখী দর্শনের ভিতরে তাঁরা তো গভীভাবে প্রবেশ করেননি। ফলে ঠাকুর সম্পর্কে তাঁদের বোধটা হল ওপরসা ওপরসা।

বৃহৎ ব্যক্তি বা নেতাদের দিয়ে যে এই আন্দোলন হওয়ার নয় তা বাস্তববাদী এবং প্রবল কাণ্ডজ্ঞান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর ভালোই জানতেন। বিশেষ করে বড় মানুষদের অহং ও নিজস্ব অবসেশন প্রবল হওয়ায় তা এই কাজেই বাধা হয়ে দাঁড়াবে। ঠাকুর তাই নির্ভর করেছিলেন সাধারণ মানুষদের ওপর। তারা খুবই সাধারণ, অনেকেরই শিক্ষা দীক্ষা নামমাত্র, অনেকের নানাবিধ দুঃখ দুর্দশা। ঠাকুর এইসব মানুষকেই তাঁর মতো করে গড়ে পিটে নিতে লাগলেন। তাঁর কর্মশালা তো মানুষ তৈরির কারখানাই।

সজনীকান্ত দাস ও কতিপয় মানুষ ঠাকুর সম্পর্কে যে প্রতিকূল প্রচার শুরু করেছিলেন তার পিছনে কতকগুলো মোটা কারণ ছিল। সজনীকান্ত মোহিতলালকে লেখা কতিপয় চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন যে, 'নকুড় ঠাকুরের আশ্রম' নিয়ে বাজার গরম করা লেখার জন্য তাঁর 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার প্রচার সংখ্যা বেড়ে গেছে। এরকম চললে অচিরেই তিনি নিজস্ব প্রেস কিনে ফেলতে পারবেন। সোজা কথা ঠাকুরের স্ক্যান্ডাল করে সজনীকান্ত দু'পয়সা আয় করতে চেয়েছিলেন এবং সে কাজে তিনি সফলও হন।

ধর্মীয় পুরুষেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিরূপ সমলোচনা ও স্ক্যান্ডালের শিকার হয়ে থাকেন, এটা দেখা গেছে। ঠাকুরের ক্ষেত্রে এরকম ঘটা স্বাভাবিক ছিল। তবে তাঁর ওপর অত্যাচার হয়েছে নানা রকম। এইসব অপবাদ তাঁর উদ্দেশ্যে বর্ষণ করেছিল সেইসব লোক যাদের কায়েমী স্বার্থে এই মানবদরদী বাধা হয়ে উঠছিলেন।

দীক্ষা-পূর্ব জীবনে ঠাকুর সম্পর্কে এই সব অপবাদ আমিও বিশ্বাস করতাম।

অপবাদের আরো কারণ ঘটেছিল ঠাকুর শ্রেষ্ঠ পুরুষের বহুবিবাহের সপক্ষে মত প্রকাশ করায়। সুপ্রজননের জন্য বরেণ্য পুরুষদের একাধিক বিবাহ প্রাচীন কাল থেকেই চলে এসেছে। ঠাকুরের নিজেরও একাধিক বিবাহ হয়। আর এই নিয়ে জল ঘোলা হয়েছিল বড়ো কম নয়।

ঠাকুরের প্রথম বিবাহ সরসীবলা দেবী অর্থাৎ বড়মার সঙ্গে। বলাই বাহুল্য, খুব অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরকে শিষ্য ভক্ত পরিবৃত এক ব্যস্ত জীবন কাটাতে হত। গভীর রাত অবধি শিষ্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, ভোর না হতেই নামধ্যান। বেশিরভাগ রাতে আদৌ ঘুমই হত না কারো। নববিবাহিতা বড়মাকে তাই স্বামীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে বরাবরই। হাড়ভাঙা পরিশ্রমে তখন গড়ে উঠছে আশ্রম। ঠাকুরের তখন ব্যক্তিগত জীবন যাপনের সুযোগ কোথায়? ঠাকুরকে বরাবরই ব্যক্তিগত জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। যাঁরা ঠাকুর সম্পর্কে কিছু মাত্র জানেন তাঁরাই এই কথার সত্যতা স্বীকার করেন। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, তাঁর যে জীবন তাতে একটি বিয়েও করে ওঠা বোধ হয় সম্ভব ছিল না। মা বাবার আদেশে এবং সংসারী সন্ন্যাসীর আদর্শ রক্ষার্থেই তিনি বিবাহ করেন।

দ্বিতীয়া স্ত্রী সর্বমঙ্গলা দেবী সরসীবলারই কনিষ্ঠা ভগ্নী। তিনি ছোটমা হিসেবেই পরিচিত। তিনি যখন ঠাকুরকে বিয়ে কররতে চাইলেন তখন ঠাকুর তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করার অনেক চেষ্টা করেন। তাঁর যে জীবন তাতে যে স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপনের সম্ভাবনা নেই, এমনকি শারীরিক নৈকট্যও যে দুর্লভ সব বুঝেও ছোটমা তাঁকে পতি হিসেবে বরণ করতে চেয়েছিলেন।

ঠাকুরের বিবাহ-নীতি অনুসারে, পুরুষ কখনোই বিবাহে আগ্রহ প্রকাশ করবে

না। বিবাহে আগ্রহী হবে নারীই। তাঁর ভূমিকাই মুখ্য হবে। বর্ণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্বভাব ও মেজাজ-মর্জির সাম্য ঘটলে তবেই বিয়ে। দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে ঠাকুর আরো কঠোর। কোনো মহিলা যদি কোনো বিবাহিত পুরুষের শৌর্যে-বীর্যে স্বভাব- চরিত্রের আকৃষ্ট হয়ে তাকে বরণ করতে চায় তবে তাকে প্রথমে অভিভাবকের অনুমতি নিতে হবে। তারপর সেই পুরুষের অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা সেই পুরুষের প্রথমা স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। প্রথমা স্ত্রীর যদি সন্তুষ্ট হয়ে সম্মতি দেন তবেই বিবাহ সম্ভব। অন্যথায় নয়।

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, বহুবিবাহ পুরুষের কামুক ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়। আর এই নীতিবিধি সঠিক ভাবে অনুসরণ করলে পুরুষদের বহুবিবাহ যে আকছার ঘটবে না, এ কথা বলাই বাহুল্য।

বহুবিবাহ প্রচলনের পিছনে ঠাকুরের আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, বিহিত অনুলোম অসবর্ণ বিবাহকে পুনঃপ্রচলিত করা। বর্ণ সংমিশ্রণের ফলে তেজবীর্য সম্পন্ন প্রতিভাবান মানুষের আবির্ভাব ঘটে থাকে। উচ্চ বর্ণের শ্রেষ্ঠ পুরুষ প্রথম বিবাহ শাস্ত্রানুসারে অবশ্যই স্ববর্ণে করবেন। পরবর্তী বিবাহ অন্য বর্ণে করার অধিকার তাঁর থাকবে। তবে উচ্চ বর্ণ বা বংশের কন্যাকে বিবাহ করা বিধি নয়। তাতে প্রতিলোম সংমিশ্রণ ঘটে এবং বর্ণসংকর জন্মায়।

এই নিয়ে কিছু লেখালেখি করতে গিয়ে আমাকে বিস্তর সমালোচনা, গালমন্দ ও অভিসম্পাতের লক্ষ্যস্থল হতে হয়েছে। কারণটা খুবই স্বাভাবিক। এই তথাকথিত প্রগতির পাগলা স্রোতে সর্বপ্রথাকে ভাসিয়ে দেওয়ার এক অবিমৃশ্যকারী খুনে জেদ মানুষকে পেয়ে বসেছে। গভীর চিন্তা, অনুধ্যান, কোনও বিষয়কে পূর্বাপর পারম্পর্যে বিচার গবেষণা, অনুসন্ধান ইত্যাদির ধার আজকালকার ধৈর্যহীন মানুষেরা ধারেন না। সমাজে একটা লুটমারের চেহারা সর্বত্র প্রকট। এই এলোমেলো মানসিকতার মানুষকে কোনও প্রথা বা মূল্যবোধের যথার্থতা বোঝাতে যাওয়া বেশ ঝকমারি ব্যাপার। বিশেষ করে বর্ণাশ্রম নিয়ে কথা তুললে কিছু মানুষ প্রবল রকম অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন।

কিন্তু এরকম হওয়া উচিত নয়। স্বজাতিতে ও স্ববর্ণে কোনও মানুষই ছোট নয়। বর্ণাশ্রম যদি গুণ ও কর্ম অনুসারেই সৃষ্ট হয়ে তাকে তবে কোন গুণ অন্য গুণের চেয়ে খাটো?

মানুষে মানুষে সকলেই সমান এই আপ্তবাক্য যাঁরা আওড়ে বেড়ান তাঁরা নিজেরাই ওই কথাটিকে বিশ্বাস করেন কিনা সন্দেহ। প্রকৃতিতে যখন কোথাও এরকম সাম্যের ব্যবস্থা নেই তখন মানুষের মধ্যেই বা থাকবে কোন যুক্তিতে। পশু পাখি গাছপালা ফল ফসল সব কিছুতেই প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে রয়েছে অসংখ্য বৈচিত্র্য। প্রকৃতি

কখনো একঢালা নিয়মে একঘেয়েমি সৃষ্টিকর্মে রত নয়। আর সেই বৈচিত্র্যের পথেই মানুষেরই সৃষ্টি। কট্টর সাম্যবাদীও বাজারে গিয়ে ল্যাংড়া আমটিই খোঁজেন, গঙ্গার ইলিশ খোঁজেন, পাকা রুই খোঁজেন, কাশ্মীরী আপেল বা দার্জিলিঙের কমলালেবুই তাঁর পছন্দ। পোষেণ ভাল জাতের আলসেশিয়ান কুকুর বা কাবলি বেড়াল। রেস-এর দিন স্টেটসম্যানে আগে দৌড়বাজ ঘোড়াদের বংশতালিকা ছাপা হত, যাতে ভাল ঘোড়া বাছতে পাণ্টারদের সুবিধে হত। ফসলের ক্ষেত্রে কতরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে জলদি জাতের সঠিক ফলনশীল শস্যের বীজ তৈরি করতে। গরু, ঘোড়া, ভেড়া, কুকুর এ নিয়েও তো পরীক্ষা ও গবেষণার অন্ত নেই! আর এই সবটাই প্রজনন নির্ভর। সুপ্রজননই এই কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য।

মানুষ শুধু তার নিজের বেলাতেই এই নীতি প্রয়োগ করতে নারাজ। এই অবৈজ্ঞানিক মনোভাব নিন্দার্হ।

কেউ কেউ অবশ্য বলেন, মানুষের মধ্যে গুণ ও প্রকৃতিগত ভেদ থাকতে পারে, কিন্তু বর্ণাশ্রম সঠিক গুচ্ছিকরণ নয়।

একথাও মানা যায় না। ভারতবর্ষেই বর্ণাশ্রম নামক গুচ্ছিকরণ খানিকটা বৈজ্ঞানিক ভাবে হয়েছিল। অন্যত্র হয়নি। এই গুচ্ছিকরণ পরে অবশ্য জাতপাতের লড়াই এবং গুণভেদ সৃষ্টি করেছে কিছু সমাজপতি ও শাস্ত্র-জ্ঞানহীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন গুরু পুরোহিতের হাতে। বিদ্বেষ ও ঘৃণার মনোভাবও যে দেখা দেয়নি এমন নয়। কিন্তু এর মুখ্য কারণ আমাদের অনুন্নত ও পরাধীন দেশে প্রকৃত শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদির অভাব এবং দেশে দীর্ঘকালীন নানা বিশৃঙ্খলা। গ্রাম জীবনের কূপমণ্ডুকতায় আবদ্ধ সমাজে পচন লাগা খুবই স্বাভাবিক। আলস্য, মূঢ়তা, অশিক্ষা, কুসংস্কার আমাদের মানসিকতাকে অসাড় করে রেখেছিল।

আজ যদি বর্ণাশ্রমকে জেনেটিক ইনজিনিয়ারিং-এর আওতায় আনা হয় তাহলেও না হয় বুঝতে পারতাম বর্ণাশ্রমের যথার্থতা যাচাইর করার কিছু উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যাচাই না করে নিতান্তই ভাবালু প্রগতিপরায়ণতার নামে বর্ণাশ্রমকে তাচ্ছিল্য করা যুক্তিসিদ্ধও তো নয়। মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগ হয়েই আছে। চরিত্র, প্রবণতা, দক্ষতা, বর্ণ অনুসারে মানুষ আলাদা রকমের হয়।

আমাদের দেশে জাতপাতের লড়াই বা শ্রেণীবিদ্বেষের মূলে অর্থনৈতিক বৈষম্যও একটা বড় রকমের কারণ। মোটামুটি সকলেরই যদি জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম ভদ্র উপার্জন থাকে এবং সমাজে যদি সে নিজের ভূমিকা ও গুরুত্বটিকে উপলব্ধি করতে পারে তাহলে এই বৈষম্যের বোধ হ্রাস পেয়ে যায়। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্যই যে বড়ো বেশি প্রকট।

ঠাকুরের একটা প্রধান লড়াই ছিল এই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। আরও বিশদ করে

বলতে গেলে দারিদ্র্য ব্যাধির বিরুদ্ধে। দারিদ্র্যের মূলে যে মানুষের অকর্মণ্যতা আলস্য মূঢ়তা অনেকটাই কাজ করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এখানে একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করা যায়। একবার ঠাকুরের এক মুসলমান শিষ্য তাঁর কাছে এসে নিজের দুঃখ দুর্দশার কথা বলছিলেন। ঠাকুর সবই শুনলেন, কিন্তু কোনো সমাধান না দিয়ে শুধু বললেন, তুই আমাকে সীতাশাল চাল খাওয়াতে পারিস?

চাষীটি অসহায় ভাবে বলল, সীতাশাল ধানের চাষ করতে মেলা জল লাগে, অনেক অসুবিধা।

এই বলে সে তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ মামলা মোকদ্দমা, দুঃখ দুর্দশার কথা ফের বলতে লাগল। কিন্তু ঠাকুর বারবারই তার কাছে আব্দার করতে লাগলেন, ও মণি, আমারে সীতাশাল চাল খাওয়াতে পারিস না?

চাষীটি যখন তার অসুবিধের কথা বলল তখন ঠাকুর সকৌতুকে বললেন, তোর ক্ষেতের কাছে তো একটা খাল আছে। সেখান থেকে নালা কেটে জল আনতে পারবি না ক্ষেতে?

চাষীটি বলল, তা কি করে হয়? অন্যের ক্ষেতের ওপর দিয়ে নালা কাটলে ওরা কি ছেড়ে দেবে?

ঠাকুর মৃদু হেসে বললেন, ওদের বুঝিয়ে বলবি যে, এতে ওদের সুবিধাই হবে। সকলের সঙ্গে ভাবসাব করে দেখিস, পারবি।

এই ঘটনার বছর খানেক বাদে সেই মুসলমান চাষীটি গরুর গাড়ি বোঝাই সীতাশাল চালের বস্তা নিয়ে হাজির হল আশ্রমে। তার পরনে নতুন লুঙ্গি, গায়ে নতুন পিরাণ, মুখে হাসি। ঠাকুরকে সীতাশাল চাল খাওয়াতে হবে, শুধু এই অনুরাগের টানে সে তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাব করেছে, খাল কেটে জল এনেছে, আর সদ্ভাব বজায় রাখার ফলে মামলা মোকদ্দমা ঝগড়া কাজিয়া মিটেছে, ফলে দূর হয়েছে তার দারিদ্র্য-ব্যাধি। এর মধ্যে কোন অলৌকিক নেই বটে, কিন্তু আছে গভীর বাস্তববোধ ও মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা।

ঠাকুরের জীবনে অযোগ্যকে যোগ্য করে তোলার উদাহরণ অসংখ্য। মানুষকে ধর্ম দান করাই শ্রেষ্ঠ দান বলে মনে করতেন ঠাকুর। বিপন্ন বা অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করাই বড় কথা নয়, তাকে যোগ্য ও দক্ষ করে তোলাই হল আসল। আর মানুষের উন্নতি শুধু একমুখী হোক তা নয়, সর্বতোমুখী হোক। এইটেই ঠাকুর চাইতেন। ঠাকুরের জীবন মানুষ অর্জনের জীবন। তাই নির্বোধ, বাচাল, পাগল, দুঃস্থ, মতলববাজ, চতুর কোনও মানুষকেই অবহেলা করেননি। যে এসেছে তাকেই তাঁর

পরিমণ্ডলে সস্নেহে গ্রহণ করেছেন। ধৈর্য ধরে শুনেছেন তার কথা, সমাধান দিয়েছেন। ঠাকুরকে এর জন্য গুনোগার দিতে হয়েছে অনেক, কিন্তু শেষ অবধি মানুষের নেশা তাঁকে ছাড়েনি।

ঠাকুরের জীবনের অজস্র ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা আমাকে খুব আকর্ষণ করে। এর মধ্যে কেউ হয়তো অলৌকিকত্বের গন্ধ পাবেন। আমি তা মনে করি না। ঠাকুরের জীবনে অসম্ভব ঘটনাগুলোও এত অনায়াসে ঘটেছে যে, সেগুলোকে তাঁর কাছের মানুষেরা অস্বাভাবিক বলে মনে করেনি। মজার কথা হল ঠাকুরের বিরুদ্ধপক্ষের লোকেরাও তাঁদের প্রচারে বিশেষ ভাবে ঠাকুরের অলৌকিক ক্ষমতার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেছেন। এটা তো এক সময়ে বিশালভাবেই প্রচার লাভ করেছিল যে অনুকূলচন্দ্র হিপ্‌নোটিজম জানেন এবং তাঁর কাছে যে যায় তাকেই বশীভূত করে ফেলেন। কেউ কেউ বলেছেন, ঠাকুরের কাছে নাকি একটি অত্যাশ্চর্য পাথর ছিল, যা দিয়ে তিনি নানা রকম ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা ঘটাতেন। তাঁর পোষা ভূত-টুত আছে এমন ধারণাও তাঁর গ্রাম হিমাইতপুর ও আশেপাশের অঞ্চলের লোকদের ছিল। অবশ্য এসব ধারণার উৎপত্তি হয়েছিল কিছু অঘটন থেকেই। ঠাকুরের বিরুদ্ধপক্ষের লোকেরা তাই তাঁর সম্পর্কে একটু ভয়ও পোষণ করেছেন।

আমি যে ঘটনার কথা বলছি তা তাঁর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় খানিকটা বোঝানোর জন্য। তাঁর এক শিষ্য এবং নিয়তকর্মী আশ্রমে থাকেন। দেশ থেকে হঠাৎ একদিন চিঠি পেলেন তাঁর একমাত্র প্রিয় পুত্রটির সাঙ্ঘাতিক অসুখ। ডাক্তার একরকম জবাব দিয়ে গেছে। ছেলে বাবাকে একবার দেখতে চায়। স্ত্রীর কাছ থেকে এই মর্মান্তিক চিঠি পেয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। কম্পিত গলায় শুধু বললেন, ঠাকুর—

ঠাকুর তাঁর দিকে চেয়ে শশব্যস্তে বলে উঠলেন, আরে আমি তো আপনাকেই ডাকতে লোক পাঠিয়েছি। ভীষণ জরুরি দরকার। আপনাকে এক্ষুনি উড়িষ্যায় রওনা হতে হবে। আধ ঘণ্টার মধ্যে। যান, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন!

শিষ্য ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, আজ্ঞে আমার বিপদ—

ঠাকুর কথাটা একেবারেই কানে তুললেন না। ভীষণ ব্যস্ত হয়ে বললেন, কথা কওয়ার সময় নেই। যা বলার ফিরে এসে বলবেন। গাড়ি যে ছাড়ে! যান তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিন।

শিষ্যটি একটু দ্বিধায় পড়লেন। একদিকে গুরুর আদেশ, অন্যদিকে ছেলের আয়ু। কী করেন? শেষ অবধি ভাবলেন, ছেলেকে বাঁচানোর ক্ষমতা তো আমার নেই। যা হওয়ার তা হবে। গুরুর যখন এত ইচ্ছা তখন উড়িষ্যাতেই যাই।

তিনি কম্পিত হৃদয়ে অশান্ত মনে রওনা হয়ে গেলেন।

উড়িষ্যায় কাজকর্ম মিটতে কুড়ি পঁচিশ দিন লেগে গেল। তারপর আশ্রমে ফেরা: পালা। যত আশ্রমের কাছে আসছেন ততই বুক কাঁপছে। কী সংবাদ অপেক্ষা করছে সেখানে কে জানে!

ঘরে এসে একটি পোস্টকার্ড পেলেন। স্ত্রীর লেখা। খোকা ভাতপথ্য করেছে। সুস্থ হয়ে উঠছে।

বুক থেকে জগদ্দল পাথর নেমে গেল। পোস্টকার্ডটি নিয়ে চললেন ঠাকুরের কাছে। একথা সেকথার পর ঠাকুর নিজেই হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, আমার কাজে তো খুব খাটছেন, ওদিকে বাড়ির খবরটবর সব ভাল তো?

শিষ্যটি কেঁদে বললেন, আজ্ঞে সেই কথা বলতেই আসা।

চিঠি দুটিই তিনি ঠাকুরের হাতে দিলেন। বললেন, ঠাকুর আমার খোকার যে অসুখ তা আপনি সর্বজ্ঞ নিশ্চয়ই জানতেন। আমি জানতে চাই আপনি কেন খোকার কাছে আমাকে যেতে না দিয়ে উড়িষ্যায় পাঠালেন?

ঠাকুর প্রথমটায় হেসে টেসে অন্য কথা বলে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু নাছোড় শিষ্য কিছুতেই না ছাড়ায় ঠাকুর অবশেষে সখেদে বললেন, মানুষ অনেক সময়ই আমার অনেক আচরণ দেখে আমাকে নিষ্ঠুর বলে মনে করে। কিন্তু ওই নিষ্ঠুরতার মধ্যে বৃহৎ মঙ্গলই লুকিয়ে থাকে। আপনার ছেলে শুনেছি আপনাকে ভীষণ ভালবাসে। মুমূর্ষু ছেলে অধীর আগ্রহে বাপের জন্য অপেক্ষা করছে, তার সেই আগ্রহ, আর তীব্র ইচ্ছাশক্তিতে সে মৃত্যুকেও ঠেকিয়ে রেখেছে, লড়াই করছে রোগের সঙ্গে। ঠিক সেই সময় যদি তার বাবা গিয়ে তার সামনে দাঁড়ায় অমনি তার সব লড়াই শেষ হয়ে যাবে, 'বাবা এসে গেছে' এই আনন্দেই সে তৎক্ষণাৎ আবার ঢলে পড়বে রোগের কবলে। মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু বাবা আসছে না বলে ছেলে সারাক্ষণ লড়াই চালিয়ে যেতে থাকবে, আর ক্রমে ক্রমে রোগ হার মানতে থাকবে তার ভালবাসার কাছে। এখন বুঝলেন তো?

এটা মোটে একটি ঘটনা। এরকম হাজার হাজার ঘটনা ছড়িয়ে আছে ঠাকুরের একাশি বছরের আয়ুষ্কালে। কিন্তু ঘটনাগুলির অলৌকিকত্বের আলোয় ঠাকুরকে আলোকিত করতে গেলে তাঁর জীবনদর্শনকেই অপমান করা হয়। ঠাকুর এই ঘটনাগুলোকে যখন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন তখন তাঁর বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি আর বাস্তববোধ আমাদের মুগ্ধ করেছে।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বাংলা ভাষা নিয়ে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন তাঁর তুলনা গোটা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভাষাজ্ঞানেও তিনি সম্পূর্ণ

অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও একক। বাক্য গঠন, শব্দ চয়ন ও অনবদ্য সব শব্দকে প্রায় হিমঘর থেকে তুলে এনে তিনি প্রয়োগ করেছেন তাঁর গদ্যে। মেকানিজম শব্দটির সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ আমি কোথাও খুঁজে পাইনি। ঠাকুর 'মরকোচ' শব্দটি যখন ব্যবহার করলেন তখন চোখের ঠুলি সরে গেল। ইন্টারেস্ট শব্দটিরও সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ নেই। ঠাকুর অন্তরাস শব্দটি আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন। এরকম অজস্র ও অসংখ্য শব্দ ও ধাতুর মূল অর্থ ধরে তিনি যে কত কিছুকে ব্যাখ্যা করেছেন তারও ইয়ত্তা নেই। অথচ নিজের হাতে তিনি তো এসব লেখেননি, মুখে বলে গেছেন এবং তা লিখে নেওয়া হয়েছে! আর মুখে বলে যাওয়া ওই নির্ঝরের মতো গদ্য কী করে যে পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে সেটাই পরম বিস্ময়ের। এক এক জায়গায় এক পৃষ্ঠা ব্যাপী একটিই বাক্য তিনি রচনা করেছেন কিন্তু কোথাও বাক্যের ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হয়নি। কোনো কোনো গ্রন্থে তাঁর গদ্য এতই জটিল ও কঠিন যা কমলকুমার মজুমদারকেও ধাঁধায় ফেলে দিতে পারত। আজ থেকে পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছর আগেকার ওইসব রচনা থেকে আমরা বাংলা গদ্যের প্রকৃত ধ্রুপদী রূপ পাই, যা আজ অবধি অন্য কারও রচনায় পাইনি। ঠাকুরের গদ্য নিয়েও অদূর ভবিষ্যতে বিস্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা ও আলোচনা হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ঠাকুরকে পরিপূর্ণ দার্শনিক বলে অভিহিত করতে হয় একটি কারণে। তিনি কোনো প্রসঙ্গকেই আলোচনার অযোগ্য মনে করেননি বলে পৃথিবীর দুর্মরতম পাপ থেকে আধ্যাত্মিকতার দুরূহতম কূট প্রসঙ্গ নিয়ে অভিমত দিয়েছেন। আর কী প্রাঞ্জল ও সুগভীর সেই কথা! ঠাকুরের এইসব আলোচনার মধ্যে সকলেই স্বীয় প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেয়ে যান। এই সম্পূর্ণতা আমি কোনো মহাপুরুষের গ্রন্থে খুঁজে পাইনি। সেইজন্য তাঁকে অধিকতর সম্পূর্ণ বলে অভিহিত করা ছাড়া উপায় নেই।

কারও প্রতি অশ্রদ্ধা ঠাকুর ভীষণ অপছন্দ করতেন। এবং জগতের পূর্ব পূর্ব অবতার পুরুষদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও নতি এতই প্রগাঢ় ছিল যে, প্রার্থনার মন্ত্রে রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যীশু মহম্মদ চৈতন্য রামকৃষ্ণ সকলকেই প্রণাম করার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। রামকৃষ্ণদেবকে কখনো ভগবান ছাড়া বলতেন না। এই শ্রদ্ধাবনত প্রেমিক মানুষটিকে, দুঃখের বিষয়, তাঁর সমকাল সঠিক চিনতে পারেনি। অবশ্য এরকম ব্রাহ্মী পুরুষকে কদাচিৎ তাঁর সমসাময়িকেরা চিনতে পেরে থাকে। বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীরা এইসব মানুষকে যদিও বা খানিকটা বুঝতে পারেন, কিন্তু নিজের অহংবোধ আহত হয় বলে কদাচ এঁদের কাছে নতি স্বীকার করেন না।

দেশ ভাগের এক বছর আগে ঠাকুর হিমাইতপুরে তাঁর সযত্নে গড়ে তোলা

আশ্রম এবং সেখানকার বিশাল লোকসেবামূলক নানা প্রকল্প অবহেলায় ফেলে দেওঘরে চলে এলেন। তখন তাঁর এই স্থানত্যাগের কারণ কেউ বুঝতেই পারছিলেন না। বছর না ঘুরতেই বুঝতে পারলেন। দেওঘরে তাঁর তো প্রায় কিছুই ছিল না। যথেষ্ট ঘর বাড়ি নেই, তেমন টাকাপয়সা নেই, অব্যবস্থা এবং বিশৃঙ্খলা চরমে। তবু তার মধ্যেই আবার তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠতে লাগল একটি নানা কর্মকাণ্ড মুখরিত লোকপালী আশ্রম। এখানেও তাঁকে স্থানীয় লোকদের নানা বিরোধিতা ও শত্রুতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, মারদাঙ্গা বড়ো কম হয়নি। কিন্তু সব প্রতিকূলতাকেই তিনি তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব দিয়ে অনুকূল করে নিতে পারতেন।

১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন নানা সন্দেহের দোলায় দুল্লেও আমি তাঁর সৎনাম গ্রহণ করি তখনও তাঁর সম্পর্কে সম্যক কোনো ধারণা ছিল না ধারণা যে আজও হয়েছে তাও নয়। আমাদের অবস্থা অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো। তাঁর জীবনদর্শন এত ব্যাপক, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ভরা যে গড়পড়তা মস্তিষ্ক সম্পন্ন কোনো মানুষের পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন এবং অসম্ভব। তবে যেটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে তাঁর বিশালত্বের আভাস পেতে কোনো অসুবিধে হয় না। স্বাস্থ্য, সদাচার, শিক্ষা, বিবাহ, সন্তান পালন থেকে শুরু করে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কিছুই তার বিষয় বহির্ভূত নয়।

বিংশ শতাব্দীর এই অনন্যসাধারণ মানুষটিকে নানা অপপ্রচারের অন্তরালে নির্বাসিত রাখা হয়েছিল দীর্ঘদিন। তবু তাঁর সন্নিধানে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্রের বাবা ও মা, জানকীনাথ বসু ও তাঁর স্ত্রী। বিভূতিভূষণ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে মোহিত হয়েছিলেন। গিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রাধারাণী ও নরেন্দ্র দেব। দেশনেতাদের মধ্যে অনেকে। তাছাড়া হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বাঙালী অসমিয়া ওড়িয়া মারাঠী বিহারী শিখ দক্ষিণী অজস্র অগুন্তি শিষ্যকে একটি ভাবসূত্রে গ্রথিত করা কত অনায়াসে সিদ্ধ হয়েছিল তা আশ্রমে এলেই বোঝা যায়। জাতীয় সংহতি জিনিসটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যতই কঠিন হয়ে পড়েছে ততই চোখে বেশি করে পড়ছে সৎসঙ্গ সংগঠনে এক আদেশে বাঁধা একটি সংহত গণচরিত্রকে।

ঠাকুর কে বা কী তা এই সামান্য রচনার দ্বারা আর কতটুকু প্রকাশ করা সম্ভব? এ যেন পিদিম জ্বেলে সূর্যকে চেনানোর অক্ষম চেষ্টা। তবে বিশ্বাস করি, পরবর্তী প্রজন্মের মানুষেরা তাঁকে আবছায়া বোধের অন্তরাল থেকে নিজেদের মেধা, বোধ ও বিশ্বাস দিয়ে প্রকটিত করে দেবে জগৎ সমক্ষে। আমরা অপেক্ষা করব।

॥ তিন ॥

ঠাকুর কবে থেকে এবং কী প্রক্রিয়ায় আমার জীবনের অচ্ছেদ্য এক অংশ হয়ে গেলেন তা সঠিক জানি না। এঘটনা ঘটেছে অলক্ষে, আমার জ্ঞান ও ধারণার জগতের নেপথ্যে। যে কোনও অবস্থাতেই পড়ি না কেন, যতই সংসার সমস্যায় জড়িয়ে থাকি না কেন, তার মধ্যে হঠাৎ করে ঠাকুরের কথা মনে পড়লেই যেন অলক্ষ্যে এক দক্ষিণের জানালা খুলে যায়, আর অসীমের বাতাস এসে লাগে।

ঠাকুর এরকমই। তাঁর সংস্পর্শে আসা, তাঁর চার অক্ষরী সৎনামের আশ্রয় নেওয়া মানেই জীবনের আনন্দের একটি অনাবিষ্কৃত উৎসকে খুঁজে পাওয়া। ঠাকুর যেন দেওয়ার জন্যই বসে আছেন, পাওয়ার জন্য আমাদের হাত বাড়ানোর অপেক্ষা।

কিন্তু কথা একটিই, করে পাওয়া। অহেতুকী কৃপা বলে কিছু নেই। পেতে হলে করতে হবে এবং করলেই পাওয়া যাবে। ঠাকুরের হিসেব এতই সহজ ও বাস্তব। কিন্তু ওই করা বা পাওয়ার ফাঁকেই থেকে যায় আমাদের দুর্মর আলস্য, উদাসীনতার অসতর্কতা, ঢিলেমি এবং নানা অভিভূতি ও সংস্কার। তাই এই পরম ধন হাতে পেয়েও আমরা তার সম্যক ব্যবহার করতে পেরে উঠি না। শুধু ঠাকুরকে নিয়ে থাকলেই দুনিয়ার সব প্রাপ্য বস্তু অধীগত হয়। কিন্তু তাঁকে নিয়ে থাকতে গিয়েই যত গণ্ডগোল, যত হিসেব নিকেশ।

আমার নিজের কথাই বলি। এই যে দুবেলা বিনতি প্রার্থনা করি ঠাকুরের সামনে বসে প্রতিদিন, তার মধ্যে ক'বার ওই প্রার্থনা সঙ্গীতের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়? দিনের পর দিন অভ্যাসবশে প্রার্থনা করে যাই বটে, কিন্তু নানা চিন্তা ভাবনা অভিভূতিতে মন এমনই সংলগ্ন থাকে যে প্রার্থনা করাটা একটা নিয়মরক্ষায় দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ এক একদিন প্রার্থনা করতে করতে মনটা ঠাকুরমুখী হয়ে যায় আর তখন প্রার্থনার প্রতিটি কথাই যেন ঠাকুরের উদ্দেশ্যে ছুটে যায়। তখন দুচোখ ভরে জল আসে। আমাদের দৈনন্দিন ঠাকুর সত্যিকারের দয়াল ঠাকুর হয়ে চোখের সামনে স্মিত হাস্যে এসে উপস্থিত হন। কথাটা হল ভক্তি নিয়ে। ভক্তি জিনিসটা শুনতে সহজ বটে,. কিন্তু কাজে কঠিন। এই কলিযুগে মানুষ যে কত রকম মানসিক টানাপোড়েনে শতধা বিভক্ত মন নিয়ে জীবন কাটায় তা ঠাকুরের মতো আর কে জানবে? ঠাকুর তাই ভক্তিকে সহজসাধ্য করে তুলতে নানা মুষ্টিযোগ ও দৈনন্দিন কৃত্য নির্দেশ করে গেছেন।

ঠাকুরকে আশ্রয় করার পর আমার নানা অভিজ্ঞতা হয়েছে। এইসব অভিজ্ঞতা অভিনব, অদ্ভুত। অনেক সময়েই ওই রহস্যময় পুরুষের ব্যাখ্যা আমি করতে পারিনি। যেটুকু আবছা তাঁকে বুঝেছি, তাতে মনে হয়, তাঁকে ধরলে আমাদের অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না।

মনে আছে দীক্ষা নেওয়ার আগে আমি ছিলাম অত্যন্ত অহংকারী উগ্র স্বাভবের এবং খানিকটা খেয়ালী। বাস্তববোধেরও বেশ অভাব ছিল। আমার কফি হাউসের বন্ধুরা আমাকে রীতিমত সমঝে চলত। তাছাড়া জীবনযাপনটাও ছিল লাগামছাড়া। একটু আধটু মদ্যপানের বদ অভ্যাস রপ্ত হচ্ছিল। সেই সময়ে ঠাকুর আমার জীবনে দেখা না দিলে আজ আমি অবশ্যই এক কুখ্যাত মাতালে পরিণত হতাম। শুধু তাই নয়, হয়তো এতদিন বেঁচেও থাকতাম না। কারণ যে সময়ে আমি দীক্ষা নিই সেই সময়ে মানসিক সংকটে এমনই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে আত্মহনন ছাড়া আমার সামনে আর কোনও পথ খোলা ছিল না। এক জ্যোতিষী বহুকাল আগেই আমার সেই বয়সে যে মানসিক সংকট দেখা দেবে এবং তা পেরোনো যে খুব কঠিন হবে তা বলে রেখেছিলেন। জ্যোতিষীতে আমার তেমন আস্থা নেই। কিন্তু এই একটা ব্যাপার খুব মিলে গিয়েছিল। ঠাকুর না হলে এই সংকট কী করে যে কাটাতাম তা ভেবে পাই না। ঠাকুর যে আমাকে আশু বিনাশ থেকে রক্ষা করেছেন তা-ই নয়, আমার জীবনের একটি লক্ষ্যও স্থির করে দিয়েছেন। নইলে কোন আঘাটায় গিয়ে এই অস্থির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটত তা কে জানে ; তা বলে এমন কথা বলব না যে, আমি ঠাকুরের পথে ঠিক ঠিক চলেছি। আমার নিজস্ব খামতি অনেক, অভিভূতি নানা ধরনের। তবে আমার মস্ত ভরসা এই, ঠাকুর বিপথ থেকে ঠিকই পথে টেনে আনেন। বিপথও অনেক ছিল তখন। হাঁ করে ছিল গিলবার জন্য। এখন সেইসব বিপথের সংখ্যা আরও বেড়েছে। যেসব অশুভ শক্তি কেন্দ্রাভিগ আকর্ষণে আমাদের বারবার জীবনের অস্তির পথ থেকে ভ্রষ্ট করতে চেষ্টা করে ঠাকুরের লড়াই সেগুলোরই বিরুদ্ধে। নিরন্তর মানুষকে অস্তিবৃদ্ধির পথে চালনা করার প্রয়াসে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। ঠাকুরকে প্রথম থেকেই যে গভীর ভাবে ভালবেসে ফেলেছিলাম তার কারণ, এই মানুষটির ভিতর থেকে অবিরাম বিকীর্ণ হচ্ছে মানুষের প্রতি ভালবাসা।

যত দিন যাচ্ছে ততই ঠাকুরের অপরিহার্যতা নিজের জীবনে গভীরভাবে অনুভব করছি। ঠাকুর ছাড়া কী অসম্ভব ছিল আমার আজ অবধি বেঁচে থাকা! আর এই যে বেঁচে আছি এরও অস্তি জুড়ে ঠাকুরেরই নিরন্তর কৃপা বর্ষিত হচ্ছে। তাই বেঁচে আছি বলেই ঠাকুরের কাছে কৃতজ্ঞতায় বারবার মাথা নুয়ে আসে। স্রেফ এই বেঁচে

থাকাটাই মাঝে মাঝে আমাকে বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। ঠাকুর ছাড়া শুধুমাত্র এই বেঁচে থাকাটাই আমার পক্ষে কত অসম্ভব ছিল।

আগেই বলেছি, তখন পর্যন্ত—অর্থাৎ ঠাকুরকে আশ্রয় করার আগে অবধি আমার জীবন ছিল সব দিক দিয়েই বিবর্ণ, অসফল এবং গতিহীন, বৈচিত্র্যহীন। আর্থিক অনটন তো ছিলই, কোনও সামাজিক মর্যাদাও ছিল না। এলেবেলে একটা জীবন হেলাফেলা করে কাটিয়ে দিচ্ছিলাম। ভবিষ্যতের কোনও কল্পনা বা আশাও ছিল না। সামান্য একটা হত দরিদ্র স্কুলে নিতান্তই তুচ্ছ একটা মাস্টারির চাকরি, আর মাঝে মাঝে পত্র পত্রিকায় গল্প লেখা। এছাড়া আর কোনও সাফল্য নেই। কিন্তু ঠাকুরকে ধরবার পর থেকেই সেই বর্ণহীন অর্থহীন জীবনে যেন অলক্ষ্যে একটা মাত্রা যোগ হল। তারপর ধীরে ধীরে জীবনের নিহিত গভীর অর্থ আর আনন্দ পাপড়ি মেলতে লাগল। আমার মতো আধার তো খুব বেশি ধারণ করার ক্ষমতা রাখে না। তবু এই সামান্য আধারেই ঠাকুর তাঁর অনির্বচনীয় সুধা ভরে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা কথাটা বললাম, তার কারণ, ঠাকুরের দেওয়ার ক্ষমতা সীমাহীন হলেও আমাদের গ্রহণক্ষমতা কিন্তু সীমাবদ্ধ।

মনে আছে, দীক্ষা নিয়ে আসার পরই নানাজন নানা প্রশ্ন করত। ঠাট্টা ইয়ার্কি, শ্লেষ, বিদ্রূপ ইত্যাদি তো ছিলই। একজন আদ্যন্ত আধুনিক মানসিকতার যুবক কী করে দীক্ষাটীক্ষা নেয় এবং ধ্যান ট্যান করে এটাই ছিল সকলের জ্বলন্ত প্রশ্ন। ফলে কফি হাউসে প্রায়ই বিভিন্ন বন্ধু বা পরিচিতদের সঙ্গে আমার তুমুল তর্ক বা বিবাদ হত। হাতাহাতিরও উপক্রম হয়েছে। রণবীর নামে আমার এক ফিল্ম ডিরেক্টর বন্ধু ছিল। এমনিতে সে অতিশয় ভদ্র ও সজ্জন। কিন্তু সেও একবার কিছু কটূকাটব্য করে ফেলেছিল ঝোঁকের মাথায়। আমি এত ক্ষেপে গেলাম যে তাকে মারতে উঠেছিলাম। রণবীর অবশ্য নিজের ভুল বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা চেয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেয়।

এদিকে প্রসূনের আমেরিকা যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু তার বাড়িতে হাঁড়ির হাল। কিছুদিন পরেই সে সব পেয়েছি-র দেশে চলে যাবে। গাড়ি বাড়ি হবে, দেদার ডলার ওড়াবে এই আশায় সে মুখ বুজে কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছিল। তবে সে সময়ে সে বারকয়েক অভাবে পড়ে ইষ্টভৃতির টাকা খরচ করে ফেলেছিল। আমি তাকে খুব বকলাম। সে বললে, ওরে, ঠাকুরকে ভরণ করবো কি আমার মেয়ে-বউ যে না খেয়ে আছে।

এটা কোনও যুক্তি নয়। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি অনেক। কিন্তু প্রসূন বুঝতে চাইত না। অনেক জ্ঞান ও গুণ থাকা সত্ত্বেও প্রসূনের মধ্যে একটা অবুঝপনা ছিল, ছেলেমানুষি ছিল।

চন্দনেরও এই অবুঝপনা ছিল। তার খেসারত তাকে দিতে হয়েছে।

ঠাকুরকে নিয়ে চলতে গেলে ঠাকুরের মতোই চলতে হয়। নিজের খেয়ালখুশি অনুযায়ী ভজনা করতে নেই। এই খেয়ালখুশির ভজনায় যে কত গণ্ডগোল তা বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। ঠাকুর এ বিষয়ে আমাদের বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন। ইষ্টস্বার্থের পথে আত্মস্বার্থ এমনভাবে এসে হাজির হয় যে ইষ্ট আবার আত্মতে গন্ডগোল পাকিয়ে যায়। ঠাকুর বলেছেন, নিজ খেয়ালে ভজলি গুরু, মানুষ হতে হলি গরু।

কিন্তু এই ঘোর কলিকালে, মানসিক জটিলতা ও সংকটের এই মাহেন্দ্রযোগে, ইষ্টস্বার্থ আর আত্মস্বার্থের গন্ডগোল হবেই। আর ঠাকুর তা ভাল করেই জানতেন। তাই নানাভাবে আমাদের বিপথগামিতায় বাঁধ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যজন, যাজন ইষ্টভৃতি; স্বস্ত্যয়নী, সদাচার হচ্ছে সেই বাঁধ। নিত্য পালনীয় এই সব কৃত্য ধীরে ধীরে জীবনে শৃঙ্খলা এনে দেয়। আর আমাদের অজান্তেই নানা আপদ বিপদ আপতনকে নিরুদ্ধ করতে থাকে। আমাদের অভ্যন্তরেই গড়ে ওঠে অশুভের বিরুদ্ধে, রোগ-ভোগ-মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা। ঠাকুর কতটা বিজ্ঞানসম্মত ছিলেন তা বুঝতে হলে তত্ত্বগতভাবে বোঝার চেয়ে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে বোঝা অনেক বেশি ভাল।

ঠাকুরকে নিয়ে আমাদের মধ্যে বেশ এটা মধুচক্র গড়ে উঠেছিল। কয়েকজন আধুনিক যুবক নানা মুখরোচক বিষয়কে উপেক্ষা করে কেবল ঠাকুরকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিচ্ছে, এ এক অভাবনীয় ঘটনা।

পূর্ণ দাস রোডের আমাদের মেসবাড়িতে কে আসত না? কবি সাহিত্যিক থেকে শুরু করে পলাতক নকশালরা পর্যন্ত অনেকেই। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিও এসে আড্ডা মেরে যেতেন। ঠাকুরের যাজন কিন্তু আমরা সকলের কাছেই করতাম। আর বিস্ময়ের কথা হল, অনেক নাস্তিক-অবিশ্বাসী-নিস্পৃহ ব্যক্তিকেও কিন্তু মন দিয়ে ঠাকুরের কথা শুনতে দেখেছি।

আসল কথা হল, ঠাকুরের জীবনদর্শন এমনই চমৎকার যে, একটু বুঝিয়ে বলতে পারলেই যে-কারও মনে ধরে যায়। একবার হলদিয়ায় একটা ঘটনা ঘটেছিল। ঠাকুরের জন্মোৎসব। হলদিয়ায় তখন সি পি এম-এর প্রবল প্রভাব। আমি উৎসবের কর্মকর্তাদের বলেছিলুম, উৎসবে শুধু গুরুভাইরা এলেই চলবে না, বাইরের লোককেও ডাকবেন। নইলে সভা বড্ড ঘরোয়া হয়ে পড়ে। বাইরের মানুষকে অন্তরাসী না করতে পারলে ঠাকুরের উৎসব সম্পূর্ণতা পাবে না।

উদ্যোক্তারা আমার অনুরোধ শুনে বললেন, ওটা তো কমিউনিস্টদের জায়গা।

তাবা কি আর আসবে! তবু চেষ্টা করব।

উদ্যোক্তারা কথা রেখেছিলেন। তাঁরা সেখানকার নেতৃবৃন্দকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সভায়। শুধু তাই নয়। আমি বলে দিয়েছিলুম, যদি কেউ প্রশ্ন বা প্রতিবাদ করতে চায় তো বহোৎ আচ্ছা। আমরা সাধ্যমতো সেইসব প্রশ্ন বা প্রতিবাদের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব।

হলদিয়ায় একটা মস্ত হল-এ সভার আয়োজন হয়েছে। শুরুতে বেশি লোক ছিল না। শুধু গুরুভাই আর বোনেরা। সংখ্যায় বড়ো জোর গোটা পঞ্চাশ হবেন তাঁরা। সভা শুরু হয়ে যাওয়ার পর—অর্থাৎ বিনতি প্রার্থনা হয়ে গিয়ে যখন প্রথম বক্তা ভাষণ শুরু করেছেন তখন হঠাৎ বাইরের অন্ধকার মাঠে অজস্র সিগারেটের আগুন দেখা গেল। একসঙ্গে পায় শ খানেক যুবক এসে ঢুকেলেন হলে। তবে বিন্দুমাত্র বিশৃংখলা হল না, শব্দও নয়। হল-এ যথেষ্ট জায়গা ছিল, তাঁরা বসে পড়লেন। বসার ভঙ্গিতে অবশ্য একটু অবহেলার ভাব ছিল, অনেকে সিগারেটও খাচ্ছিলেন। যিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন তিনি এইসব যুবকদের দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়ে বক্তৃতা তাড়াতাড়ি শেষ করে বসে পড়েই আমাকে বললেন, এসব কী হচ্ছে বলুন তো! ওরা যে সব সিগারেট খাচ্ছে।

আমি একটু হেসে বললুম, ঠাকুর তো আমাদের কাছে ঠাকুর, ওদের কাছে তো নয়। কিছু ভাববেন না প্রতিকূলকে অনুকূল করে নেওয়াই তো ঠাকুরের মোদ্দা কথা ছিল।

আমি মোটেই ভাল বক্তা নই। তবে কখনও কখনও ঠাকুরেরই দয়ায় আমার একটু ভাবাবেগ আসে। তখন ঘরোয়াভাবে প্রাণের কথা মনের কথা বলে ফেলতে পারি। সেদিন আমার বক্তব্যের লক্ষ্য ছিলেন ওই ক্যাডাররা। ফলে আমি কমিউনিজমের কথাও এনে ফেললুম। প্রসঙ্গক্রমে বললুম, কমিউনিস্ট বিপ্লবের ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিপ্লব যারা করে — অর্থাৎ কৃষক মজুর শ্রেণীর সাধারণ মানুষেরা মার্কসবাদ বোঝে না। তবে তারা এগিয়ে যায় মহান নেতার দিকে তাকিয়ে। যেমন লেনিন, যেমন হো চি মিন, যেমন মাও! এটাই হল গুরুবাদের রকমফের। যার মুখের দিকে তাকিয়ে মানুষ সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে তিনিই তো গুরু এরকমভাবে আরও অনেক কথা।

যখন বলছিলুম তখন মনে হচ্ছিল, ওরা একেবারেই আমার কথা শুনছে না। কেউ সিলিং পানে চেয়ে আছে, কেউ হাঁটুতে মুখ গুঁজে ঘুমোচ্ছে, কেউ কথা টথা বলছে না। সবাই ভারী চুপচাপ। ভাবলাম, বোধহয় ঠাকুরের কথা ধর্মের কথা শুনতে অনিচ্ছে, শুধু দায়সারা ভাবে উপস্থিত হয়েছে।

ভাষণ-টাসন শেষ হলে আমাদের তরফ থেকে ঘোষণা করা হল, শ্রোতারা ইচ্ছে

করলে প্রশ্ন করতে পারেন।

এই ঘোষণার পর যে কাণ্ডটা হল তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি আ..., সেইসব আপাত অমনোযোগী যুবকেরা একে একে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের বক্তৃতা৻ প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে লাগল, এমনকি উদ্ধৃতি সহকারে। অবশ্যই সবকটাই প্রতিবাদী প্রশ্ন। যেমন আমাকে বলা হল, আপনি নেতা আর গুরু এক করে ফেলেছেন। কিন্তু মার্কসবাদে ব্যক্তিপূজার স্থান নেই। লেনিন নন, বলশেভিক পার্টিই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। পার্টি ছাড়া ব্যক্তিগত নেতৃত্বের কোনও মূল্য নেই।

এইরকম অজস্র প্রশ্নে আমরা নাস্তেহাল। কিন্তু আমার সানন্দ বিস্ময় ছিল, এরা এত মন দিয়ে আমাদের কতা শুনেছে? ঠাকুরের কথা শুনেছে?

হলদিয়ার তৎকালীন সি পি এম কর্মীদের মধ্যে তীর্থ ছিল বিখ্যাত। এখনও সে ওখানে আছে কি না জানি না। তবে তাকে আর তার সঙ্গীদের আমার খুব ভাল লেগেছিল।

সভার পরে তীর্থ এবং তার অন্তত দশ বারোজন সঙ্গী আমাদের সঙ্গ ধরল। অনেক রাত অবধি তাদের সঙ্গে কথা হল শুধু ঠাকুর প্রসঙ্গে। তর্ক বিতর্ক নয়, হার্দ্য আলোচনা। আর তারা এমনই ভাল এবং বুঝদার ছেলে যে কোনও ভাবেই ঠাকুরকে নস্যাৎ করার স্পর্ধিত চেষ্টা করল না। ধৈর্য করে শুনল এবং নানা প্রশ্ন করল। কিন্তু ঠাকুরের জীবনদর্শন এমনই মোহনীয় এতই জীবনধর্মী ও বাস্তব যে কয়েক ঘণ্টা পর তারা সকলেই মোটামুটি ঠাকুরকে স্বীকার করে নিল, বলল, এই যদি আপনাদের ঠাকুরের ফিলজফি হয়ে থাকে তবে একে সমর্থন করতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই।

হলদিয়ার এই তরুণ তাজা ছেলেগুলোর কথা আমি কোনও দিনই ভুলব না। দুদিন হলদিয়ায় ছিলাম। দুদিন প্রায় সারাক্ষণ তারা আমাদের সঙ্গে ছিল। সারাক্ষণই তারা ঠাকুর সম্পর্কেই প্রশ্ন করেছে, ঠাকুরকে নিয়েই আলোচনা করেছে।

ঠাকুরকে নিয়ে আমার গর্ব এই কারণেই যে, ঠাকুরকে যারা কণামাত্র বুঝতে পারে তারাই চমকে যায়, অবাক হয়। এত সত্য, এত জীবনীয় আর কোনও জীবনদর্শন আছে বলে জানি না। আর ঠাকুর হচ্ছেন সর্বরোগহ, সর্ব সমস্যার সমাধানের আকর। এক অমোঘ ব্যাখ্যাতা, ঐশী দৃষ্টির অধিকারী, প্রজ্ঞার উৎসস্বরূপ ঠাকুরকে তাই সম্যক বুঝে ওঠাও কঠিন। হলদিয়ার ওই অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, ঠাকুরের সব কথাই লোকের কাছে গ্রাহ্য ও গ্রহণীয়, যদি তা তাদের যুক্তি বিচার অনুযায়ী পরিবেশন করা যায়।

আর অনেক সময়ে দেখেছি, মানুষের অহং বা কোনও গাঁট ঠাকুরকে ঠিকমতো ধরার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের ওপর একটি চুল ছাঁটার সেলুন ছিল। সেই দোকানের সামনে কাচের ওপর বড় বড় করে লেখা "বন্দে পুরুষোত্তমম।" যাতায়াতের পথে বাস থেকে প্রায়ই দেখতাম, আর ওইটি দেখার জন্যই বাসের সেই ধারেই বসতাম যে ধার থেকে দেখা যায়। সন্দেহের অবকাশ ছিল না যে, এটি কোনও সৎসঙ্গীর দোকান। একদিন হঠাৎ হাঁটাপথে যেতে গিয়ে কৌতূহলবশে দোকানটায় ঢুকলাম। হাফহাতা পাঞ্জাবি আর ধুতি পরা বয়স্ক মানুষ বসে কাগজ পড়ছিলেন। 'জয়গুরু' বলতেই তিনিও 'জয়গুরু' বলে হাতজোড় করে উঠে দাঁড়ালেন, দোকানে ঠাকুরের ছবিও দেখলাম।

কথায় কথায় জানা গেল ভদ্রলোক ঠাকুরকে খুবই ভক্তিশ্রদ্ধা করেন বটে, কিন্তু দীক্ষা নেননি। কেন নেননি? ভদ্রলোক সদুত্তর দিতে পারলেন না। দেওঘরে গেছেন, ঠাকুরকে দেখেছেন, সবই হয়েছে, কিন্তু আসল কাজটাই বাকি রয়ে গেছে। কেন দীক্ষা নেননি এই প্রশ্ন করায় ভদ্রলোক মলিন মুখ করে বললেন, হয়ে ওঠেনি, বুঝলেন, আসলে বোধ হয় সময় হয়নি।

ভদ্রলোককে দোষ দিয়ে লাভ নেই, মানুষের কত রকম গাঁট থাকে। মন ও মস্তিষ্কের নানা দুরূহ জটিল বিক্রিয়ায় গড়ে ওঠা চরিত্র সবসময়ে সহজ পথে চলতে চায় না।

আর একটি ছেলেকে জানি, পেশায় অধ্যাপক। পরেশদা—অর্থাৎ পরেশচন্দ্র ভোরা, সদ্য ঋত্বিকের পাঞ্জা পেয়ে তখন প্রচুর দীক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এই ছেলেটিও তাদের মধ্যে ছিল। দীক্ষা নেওয়ার কিছুদিন পর ছেলেটি এসে একদিন কফিহাউসে পরেশদাকে কাঁদো কাঁদো হয়ে ধরল। দাদা, আমার ফ্যামিলি আর বন্ধুমহলে ভীষণ আপত্তি হচ্ছে, হাসাহাসি হচ্ছে, আপনার দীক্ষা ফিরিয়ে নিয়ে আমাকে রিলিজ করে দিন।

পরেশদা পড়লেন মহা ফাঁপরে, দীক্ষা ফিরিয়ে নেওয়ার তো কোনও পদ্ধতি নেই। অথচ ছেলেটিও নাছোড়বান্দা। পরেশদা তার অবস্থা দেখে অবশেষে বলতে বাধ্য হলেন, ঠিক আছে, আপনি আপনার মতো চলুন।

ঠাকুর যে যাজনচর্চার কথা বলেছেন তা শুধু বকবক করা নয়, মুখের কথায় যাজন হলে সেই যাজনের ক্রিয়া গভীর হয় না, আর সেই যাজনের দীক্ষাও স্থায়ী হতে চায় না। প্রকৃত যাজন হল যাকে যাজন করা হচ্ছে তার চরিত্র রুচি মেজাজ অভ্যাস এসবগুলিকে অনুধাবন করে তাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা, আপন করে নেওয়া এবং তার মধ্যে আগ্রহ ও পিপাসা জাগলে তবেই সময়মতো নামটি দিয়ে

দেওয়া। ঠাকুর তো বলেইছেন যে দীক্ষার কথা বলতে নেই, ঠিকমতো যাজন হলে মানুষ নিজের থেকেই দীক্ষা নিতে চাইবে, আর সেই দীক্ষা শত উপহাস সমালোচনা দুর্দৈব কোনও কিছুতেই টলবে না।

ঠাকুরকে নিয়ে চলতে গিয়ে আমাকে পদে পদে আত্মসংশোধন করতে হয়েছে। আমার উগ্র স্বভাব, অহংকারী মনোভাব, মানুষ সম্পর্কে ধৈর্যহীনতা, উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি—এসব দীক্ষা নেওয়ার বছর তিনেকের মধ্যেই অনেক কমে গেল।

তবু বলি ঠাকুরকে নিয়ে চলা বড়ো সহজ নয়। যখন আমি নিজেকে খুব ভক্ত বলে মনে করছি এবং কোথাও নিজের কোনও ত্রুটি দেখছি পাচ্ছি না, তখনও কিন্তু নানা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে আমার অজান্তেই।

পূর্ণ দাস রোডের মেসে যখন আমরা পাঁচ গুরুভাই মিলে ঠাকুরকে নিয়ে আপাত মশগুল হয়ে আছি তখনও কিন্তু আমাদের নানা প্রতিকূলতায় পড়তে হয়েছে। সেসব প্রতিকূলতা, সংকট বা বিপদের সঠিক কারণও তখন ধরতে পারিনি। ঠাকুর-ঠাকুর করেও যে ওসব ঘটত তার কারণ ঠাকুর সম্পর্কে আমাদের বোধটা ছিল ওপরসা।

একটা ঘটনা মনে পড়ছে। আমাদের মেসেরই একজন টাকা নয়ছয় করেছিল। ফলে আমাদের মেস অচল হয়ে পড়ল। খাওয়া দাওয়া একরকম বন্ধ। সেই দুর্দিনে এক কাপ চা জোটানোও ছিল মুস্কিল। আমার আয় তখন সামান্য, পাঁচ জনের মধ্যে আমার অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়। একটা পাঁউরুটি কিনে খাওয়ার পয়সাও নেই। তবে ঠাকুরের ওপর নির্ভর করা আমার অভ্যাস ছিল বলে ঘাবড়াইনি। জানতাম, দিন ঠিক কেটে যাবে।

বোধ হয় সেদিনটা ছিল রবিবার। মেসের আর সবাই যে যার আত্মীয় বাড়ি গেছে খাওয়া দাওয়া করতে। কারণ মেসের রান্না বন্ধ। আমি আর চন্দন মোটামুটি উপোস করে আছি। বিকেলের দিকে হঠাৎ এক ভদ্রলোক এলেন। গুরুভাই। তাঁর নাম প্রশান্ত চ্যাটার্জি। গুরুভাই এলেই আমাদের ভীষণ আনন্দ হত। প্রশান্তদা আসাতে আমরা ভারী খুশি হয়ে বসে গেলাম ঠাকুরের কথা বলতে এবং শুনতে। ঠাকুর-প্রসঙ্গ নিয়ে মেতে থাকলে আমরা বরাবরই ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে যাই। এ যেন অমৃতবৎ কার্যকর। বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা মারার পর হঠাৎ প্রশান্তদা কী করে যেন আঁচ করলেন যে, আমাদের রেস্ত নেই। তাই উনি নিজেই বললেন, কিছু যদি মনে না করেন তাহলে আমি চায়ের দামটা দিই, একটু চা আনানো হোক।

আমরা সঙ্কোচের সঙ্গে আমাদের কাজের লোককে দিয়ে চা আনালাম। প্রশান্তদা একটু বাদে কথার ফাঁকে ফাঁকে জেনে নিলেন যে, আমরা অভুক্ত রয়েছি। তিনি আমাদের আপত্তি না শুনে পাঁউরুটি কলা ইত্যাদি আনালেন। ক্ষুন্নিবৃত্তি হল।

প্রশান্তদার কথাটা উঠল এই কারণে যে, ওই সময়ে তাঁর সঙ্গে বার কয়েক দেখা-সাক্ষাৎ হলেও পরবর্তী দীর্ঘকাল আমাদের যোগাযোগ হয়নি। প্রায় বছর দশেক বাদে যাদবপুরে নর্থ রোডে যখন থাকি তখন হঠাৎ একদিন প্রশান্তদা এলেন। সঙ্গে বোধ হয় কল্যাণ চক্রবর্তী ছিল। খুব আড্ডা হল। প্রশান্তদা জন্ম-সৎসঙ্গী ঠাকুর সম্পর্কে অনেক জানেন। তাঁর সঙ্গে ইষ্ট প্রসঙ্গ করেও ভারী সুখ।

কিন্তু লোক পরম্পরায় জানতে পারলাম প্রশান্ত দা মাছ-মাংস খান। শুনে ভারী অবাক হয়েছিলাম। জন্ম-সৎসঙ্গী মানুষের পক্ষে মাছ-মাংস খাওয়াটা ভারী অস্বাভাবিক। অবশ্য এ বিষয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাইনি। মনটা কেমন যেন একটু উদ্বিগ্ন রয়ে গেল। এরকম কেন হবে? ঠাকুরকে যারা বিন্দুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করেছে, একটু খানিও ভালবেসেছে তাদের মাছ-মাংসের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই বিরাগ এসে যায়। আমি ঘোর মৎসাশী মাংসাশী এবং ডিম্ব-প্রিয় ছিলাম। পেঁয়াজ রসুন ছাড়া আমার চলতই না। পঁয়ষট্টি সালে দীক্ষা নিয়েছি, তার দু বছরের মধ্যেই আমার আমিষে অরুচি এসে গেল। তারপরও অবশ্য আত্মীয়-স্বজনের উপরোধে কিছুকাল জোর করে আমিষ খেতে হয়েছে। কিন্তু আটষট্টি সালে যখন পাকাপাকিভাবে মাছ-মাংসাদি ছাড়লাম তখন কিছু ছেড়েছি বলেই বোধ হত না। ছেড়ে যেন ভারমুক্ত বোধ করেছি। ঠাকুরের মহিমা এখানেই। তাঁর অনভিপ্রেত যা সেটা ছাড়তে কষ্ট হয় না।

তাহলে প্রশান্তদা কেন মাছ-মাংস খান?

এই প্রশ্ন বেশ কিছুদিন আমাকে পীড়া দিয়েছিল। আর বছর দুই বাদে যখন হঠাৎ খবর পেলাম যে, প্রশান্তদার ক্যানসার হয়েছে তখনই চোখের সামনে থেকে পর্দা সরে গেল। মনে হল, প্রশান্তদা তাঁর ভুলের খেসারত দিচ্ছেন।

ক্যানসার হওয়ার পর তিনি আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন। খবর পেয়েও নানা কারণে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। যাবো-যাচ্ছি করে দু মাস বা তারও কিছু বেশি কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ আবার খবর এল, প্রশান্তদা মারা গেছেন।

এই অল্প বয়সে এবং এভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটা উচিত ছিল না। কিন্তু আমার মনে হয়েছে ভাল মানুষ এবং ইষ্টে আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুর রন্ধ্রপথ অনবধানতাবশে খুলে রেখেছিলেন প্রশান্তদা।

তাই ঠাকুরকে আশ্রয় করাটাই বড় কথা বলে আমার মনে হয় না। ঠাকুরকেও আশ্রয় দিতে হয় নিজের অভ্যন্তরে। অস্তিত্বকে রক্ষা করার যে অমোঘ মুষ্টিযোগ ঠাকুর দিয়েছেন তাকে উপেক্ষা করলে অস্তিত্বের সংকট কাটবে কী করে?

ঠাকুরের জীবন ও জীবনদর্শন এক অনন্ত ও গভীর চর্চার বিষয়। তাঁকে মাথা

দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করা ঠিক নয়। ঠাকুরকে বুঝবার জন্য আমি নিজে যতবার মস্তিষ্ক চালনা করেছি, সফল হইনি। কিন্তু নামধ্যান করলে এবং ব্যাকুলতা-আকুলতা নিয়ে বুঝতে গেলে সহজেই তিনি ধরা দেন।

ঠাকুরের বাণী ও উপদেশাবলী সবচেয়ে ভাল হৃদয়ঙ্গম হয় বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে বা কাজের ভিতর দিয়ে না হলে বুঝটা পাকাও হয় না। ঠাকুরের জীবনদর্শন পুরোটাই বাস্তবভিত্তিক। তিনি ভাবের ঘুঘু ছিলেন না। যা করছেন তা হাতে-কলমে। মানুষের ব্যথা-বেদনা দুঃখদুর্দশা নিবারণই তাঁর লক্ষ্য ছিল বলে তাঁর সব কাজকর্মই ছিল সেবামুখী। মানুষের ভিতরকার সুপ্ত গুণাবলীর উদ্বোধন ও বিকাশ ঘটানোর প্রক্রিয়া বাস্তবভাবে অধিগত করানোর জন্য তিনি যে কত তুক দিয়েছেন তার হিসেব নেই। ঠাকুরের অনন্যসাধারণতা আমরা সব ক্ষেত্রেই দেখতে পাই। মানুষ তিনি একটাই, তবু যেন মনে হয়, পৃথিবীর সব মানুষের বুদ্ধি প্রতিভা কর্ম এক করলেও তা তাঁর সমতুল নয়। এ পর্যন্ত আমরা যত দার্শনিক ও মহাপুরুষদের পেয়েছি তাঁদের উত্তরাধিকার ঠাকুরের মধ্যে পূর্ণ বিকশিত হয়েছিল তো বটেই, তার সঙ্গে আমরা পেলাম আধুনিক জটিল জগৎ ও জীবনের নানা গভীর সমস্যাবলীর সমাধান। যেসব প্রসঙ্গ মহাপুরুষদের দ্বারা আলোচিত হয়নি ঠাকুর সেসব প্রসঙ্গকেও আলোকিত করলেন। এ যুগের যৌনতা ও তার বিকৃতি, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে হাজারো জটিলতা, ব্যক্তিমানসে প্রবৃত্তি নিচয়ের রকমারি প্রতিক্রিয়া, বিচ্ছিন্নতাবোধ, প্রেমহীনতা, উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র, পরিবার, সব কিছুই ঠাকুরের আওতায় এল। এই ভয়ংকর জটিল মানসিকতার যুগে যেসব কঠিন প্রশ্ন মানুষকে নিরন্তর তাড়িয়ে বেড়ায় সেগুলো নিয়েই লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্রমে ক্রমে উপনীত হল ঠাকুরের কাছে। আর তখনই খুলে গেল অমৃত নির্ঝর।

ঠাকুরের গ্রন্থাদি পাঠ ক্রমশ ব্যাপক হচ্ছে। ঠাকুর-চর্চাও অনতিবিলম্বে গবেষণা ও পর্যালোচনার পর্যায়ে চলে যাবে। তার কারণ এমন সম্পূর্ণতা আর কোনও জীবনদর্শনে নেই। নেই বিভিন্ন বিষয়ের এমন Co-ordinated knowledge. ঠাকুর একই সঙ্গে এক অধ্যাত্ম পুরুষ এবং একজন সুদূরদর্শী দার্শনিক, চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী, ভাষাবিদ ও সাহিত্যকার। তিনি একই সঙ্গে এত কিছু যে, আমরা তাঁর থৈ পাই না।

ঠাকুর অলৌকিক বলে কিছু মানতেন না। অলৌকিকের নেশা যে বড়ো সাংঘাতিক তাও তিনি বার বার বলেছেন। অলৌকিকের আকাঙ্ক্ষার নিকেশ না হলে দীক্ষা দিতে নেই, এমন কথাও তাঁর বলা আছে। অলৌকিকের নেশা যে কী

ব্যাপক ও দুষ্টচক্রের মতো দেশ ছেয়ে ফেলেছে তাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাই ঠাকুর এ ব্যাপারে আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। ধর্ম যে অলৌকিক নয়, ধর্ম যে ত্যাগ ভালবাসা সেবার মধ্যে নিহিত, তার সারাৎসার যে অস্তিবৃদ্ধির যাজন সেটা আমাদের বোধের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়েছেন।

কিন্তু তবু ঠাকুরের অলৌকিকত্ব নিয়ে প্রচার সবচেয়ে বেশি। আমার ব্যাখ্যা হল, ঠাকুরের স্বাভাবিক শক্তির প্রকাশ এত বেশি যে সাধারণ মানুষের কাছে সেটাই ব্যাখ্যার অতীত, অলৌকিক। ঠাকুরের আবাল্য জীবনের নানা পর্যায়ে নানাভাবে সেই শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। কখনও তা মেধা ও উপলব্ধিতে, কখনও বিচক্ষণ সিদ্ধান্তে, কখনও তাঁর অগাধ অতুলনীয় প্রেমের ভিতর দিয়ে। অলৌকিকের প্রসঙ্গ এলে ঠাকুর যা বলতেন তা সরল ভাষায় হল, তুমি যার ব্যাখ্যা জানো না, তাই তোমার কাছে অলৌকিক। কিন্তু পৃথিবীতে কার্যকারণ ছাড়া কিছুই ঘটে না, যা ঘটে তার সব কিছুরই বাস্তব বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে।

আমার জীবনেও এই ধরনের ঘটনা অনেক ঘটেছে। যার সরল কার্যকারণ আমার জানা নেই। ঠাকুরকে আশ্রয় করার আগে অবধি এ ধরনের কিছু ঘটত না কখনও। ঠাকুরকে ধরার পর তাহলে কেন ঘটতে শুরু করল? যে-বিজ্ঞান দিয়ে এইসব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা যায় তা প্রচলিত বিজ্ঞান নয়, অর্থাৎ আমাদের বিজ্ঞান এখনও সেই কার্যকারণ ও পরম্পরার দরজা পুরোপুরি খুলতে পারেনি।

ঠাকুর নিজে বিজ্ঞানের মস্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেই পাবনার অজ পাড়াগাঁ হিমাইতপুরে তিনি বিশ্ববিজ্ঞান স্থাপন করেছিলেন সেই কতকাল আগে। তখন বাঙালী তথা ভারতীয়রা তেমন বিজ্ঞান-মনস্ক ছিল না। বিশ্ববিজ্ঞানে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং কাজ কিছু কম তো হয়নি। সেই আমলের পক্ষে এক অজ পাড়াগাঁয়ে বিজ্ঞানের এই নিবিড় চর্চা খুবই বিস্ময় উদ্রেককারী। বিজ্ঞান বিষয়ে ঠাকুরের নির্দেশ যা যা ছিল সব কিছু কাজে রূপায়িত করা গেলে আজ ভারতবর্ষে একটি বিজ্ঞান-বিপ্লব ঘটতে পারত। ঠাকুর চাইতেন ধ্যানে মানুষের যা উপলব্ধি হয় তা যন্ত্রের মাধ্যমে প্রক্ষেপ করে মানুষকে দেখানো। অব্যক্ত জগতের সব কিছু ব্যক্ত জগতের মধ্যে প্রক্ষেপ করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু সম্ভব। অব্যক্ত যা কিছু আছে তাকে ব্যক্ত করা যাবেই। কিন্তু ঠাকুরের সব চাওয়া আমাদের দ্বারা পূরণ হল কই। ঠাকুর ভাইব্রোমিটারের কথা বলেছিলেন। একজন বিজ্ঞানীকে ভারও দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যাপারটাকে অলীক ও অসম্ভব বলে চেষ্টাই করলেন না। আমাদের পঠিত ও লব্ধ বিজ্ঞানে হয়তো এই আবিষ্কার অসম্ভব বলেই মনে হতে পারে, কিন্তু ঠাকুরের নির্দেশ মাথায় নিয়ে একটু এগোলে তিনিই তো অলক্ষ্যে এসে হাত ধরেন আর ভাইব্রোমিটার অলীক

বা অসম্ভবই বা হতে যাবে কেন? শব্দ নিয়ে যে বিশ্বময় পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে তাতে তো মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে শব্দ, তরঙ্গ, কম্পন ইত্যাদি চিকিৎসার ক্ষেত্রে মস্ত ভূমিকা নেবে। ঠাকুর মুখের কথা বলেছেন বলে বিজ্ঞান গর্বী কেউ যদি সেটাকে উপেক্ষা করেন তো মস্ত ভুল করবেন। ঠাকুর এ যাবৎকাল যা বলেছেন তার কিছুই কিন্তু ফেলনা নয়।

নিরামিষ আহারের কথাই ধরা যাক। সত্তর বছর আগে ঠাকুর এ সম্পর্কে ঠিক যা যা বলেছেন, আজকের বৈজ্ঞানিক রিসার্চ ঠিক তা তা বলেছে। ঠাকুরের উপলব্ধিতে পৌঁছতে গেলে আমাদের এখনও অনেক অগ্রসর হতে হবে।

ঠাকুরকে বুঝে ওঠা সহজ কাজ নয়। আবার অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে খুবই সোজা, যারা যুক্তি বুদ্ধি বিজ্ঞান দিয়ে ঠাকুরকে বুঝবার চেষ্টা করে বা তার অধীত বিদ্যা নিয়ে ঠাকুরকে মাপতে চায় সে ঠাকুরকে বুঝে উঠতে পারবে বলে তো মনে হয় না। ওই যে বিজ্ঞানী ভাইব্রোমিটার তৈরি করার পথেই গেলেন না তিনি ঠাকুরকে তাঁর অধীত বিজ্ঞান দিয়ে বিচার করতে গেলেন। ভাবলেন, গেঁয়ো বামুন, মুখ্যু মানুষ, উনি যা বলছেন তাতে গুরুত্ব না দিলেও চলে। এরকম প্রমাদ অনেকেরই ঘটে থাকে। আমিও তো ঠাকুরকে প্রথম প্রথম ওভাবেই মাপতে যেতুম। তাতে আমার কোনও লাভ হয়নি। এভাবে ঠাকুরকে বোঝাও যাবে না। ঠাকুরের অনেক কথাই আমাদের অর্জিত বা অধীত জ্ঞানের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু শেষ অবধি দেখা যায় ঠাকুর যা বলেছেন তা-ই সত্য। ১৯৪১ সালে এক রাতে পাবনার হিমাইতপুর গ্রামে বসে লণ্ঠনের আলোয় যে আপাতমূর্খ মানুষটি তাঁর শিষ্যদের কোয়ান্টাম থিওরি বুঝিয়েছিলেন তাঁর সম্পর্কে আমাদের হিসেব নিকেশ সাবধানেই করতে হবে। আলোচনা প্রসঙ্গের মধ্যে সেই আশ্চর্য ঘটনা বিধৃত রয়েছে। কিন্তু এটাও তেমন কিছু নয়। নানা প্রসঙ্গে ঠাকুর এমন সব বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন যা আমাদের সব ধ্যানধারণাকে পাল্টে দেয়।

তাঁর পাণ্ডিত্য, প্রজ্ঞা, সর্বজ্ঞত্ব নিয়ে আলোচনা থাক। তাঁর সত্য পরিচয় তো সেখানে নেই। আর এই প্রজ্ঞার পরিমাপ করা বা স্বরূপ নির্দেশ করাও দুঃসাধ্য। কিন্তু ঠাকুরকে বুঝবার সহজ পন্থা আছে। বিশ্বাস ও ভক্তি, আর নামধ্যান। একমাত্র এই পন্থা ছাড়া তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করা খুঁবই কঠিন।

ঠাকুরের রঙ যখন লাগল তখন ত্রিশ-উত্তীর্ণ বয়সে একবার স্থির করলাম বিয়ে করে সংসার স্থাপন আর করব না। ঠাকুরকে বহন করে তাঁর কাজে আত্মনিয়োগ করে জীবনটা কাটিয়ে দেব। তখন ইষ্টানুভূতি খুব তীব্র হত। ঠাকুরের মধ্যেই জগতের সব প্রাপ্যকে যেন দেখতে পেতাম। আমি দরিদ্র স্কুল-শিক্ষক এবং লেখার বাবদে

রোজগার যৎসামান্য ও অনিয়মিত। বাবা টাকা না পাঠালে আমার মেসের খরচ চলে না। ওই অবস্থা সংসার পাতার স্বপ্নও বাতুলতা। পশ্চিমবঙ্গে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা বা অভিভাবকের অভাব নেই, তবু আমার বিয়ের কোনও সম্বন্ধ আসেনি। কপালের ফেরে কোনও নারীও তার হৃদয় উপহার দেয়নি আমাকে। শুধু আমার মা আমাকে মাঝে মাঝে বলতেন, এবার একটা বিয়ে কর। মেসে-বোর্ডিংয়েই কি তোর জীবন কাটবে? কিন্তু মায়ের এই অসহায় ইচ্ছের পূরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিয়ে করলে বউকে খাওয়াবো কী?

তবে মেস-বোর্ডিং-এর জীবন তখন আমার কাছে আর ভাল লাগছিল না। চিন্তা-ভাবনার পক্ষে, মনঃসংযোগের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তো নয়। আমার সব সমস্যার সমাধানের উৎস ঠাকুর। কলকাতার রাজপথে হাঁটতে হাঁটতে নিজের জীবনের নানা প্রতিকূলতার কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ চোখ বুঁজে ঠাকুরের মূর্তি ধ্যান করে বললুম, আমি জানি না, তুমি যা করার করো।

ওই একবারই বলেছিলাম, আর ঠাকুরও করলেন। তারপর এক চমকপ্রদ ঘটনার ভিতর দিয়ে ঠাকুরও আমার জীবনের ধারা দিলেন পাল্টে। নিশ্চয়ই মানুষ এর মধ্যেও অলৌকিকের আভাস পাবেন। কিন্তু আমার ব্যাখ্যা হল, ঠাকুর মানুষের মানসিকতার ধাঁচ ধরতে পারতেন। আর পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনাবলীর নিয়ন্ত্রণ কাঠিটিও তাঁর হাতে। তাই ঠাকুর তাঁর ভক্তজনদের জীবনের ধারা বদলে দিতে পারতেন।

আমাদের অসহায় জীবনে ঠাকুরের চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে? আমার নিজের জীবন, ঠাকুরকে আশ্রয় করার পর অর্থবহ হয়েছে। যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা। তার আগে যে অর্থহীন উদ্দেশ্যশূন্য বিক্ষিপ্ত জীবন আমি যাপন করেছি সেটা ছিল নিরন্তর আয়ুর ভার বহনের মতো। ঠাকুর আমার জন্য কতটা করেছেন তার পরিমাপ হয় না। আজও আমার তুচ্ছ জীবনে একমাত্র আলোকবর্তিকা ঠাকুর। সেই আলোকবর্তিকা অনুসরণ করে চলা হয়তো আমাদের মতো অস্থিরমতির পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু আলোটি ধ্রুব এবং শাশ্বত।

ঠাকুরের কথা শতমুখে বলে শেষ করা যায় না। আজ বিংশ শতকের শেষ ভাগে তিনি ক্রমশই গুরু থেকে গুরুতর আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠছেন। বিতর্কও বড়ো কম নেই। বিতর্ক যিশুখ্রিষ্ট, হজরত মোহম্মদ কাকে নিয়েই বা নেই? বিতর্ক থাকা বরং ভাল, তাতে লোকের জানবার ও খুঁজবার আগ্রহটা বাড়ে।

॥ চার ॥

ঠাকুর এবং তাঁর সৎসঙ্গ এ দুইয়ের মধ্যে একটা যোজক গড়ে তোলার কাজে সামান্য ভাটার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ব্যক্তি আর সংগঠন এক নয়। আরও কথা হল, আমরা মুখে 'ঠাকুর ঠাকুর' করলেও কার্যক্ষেত্রে স্বীয় স্বার্থই আমাদের চালনা করে, ইষ্টস্বার্থ নয়। ঠাকুর আমাদের এই সব মানুষী দুর্বলতার কথা ভালই জানতেন, তাই যাতে আমরা আত্মস্বার্থের ফাঁদে পড়ে ঠাকুরকে ভুলে না যাই তার জন্য নানা তুক দিয়ে গেছেন। সে গেল একরকম। কিন্তু ঠাকুরকে ভোলার চেয়েও মারাত্মক হল, আত্মস্বার্থের সিদ্ধির জন্য ঠাকুরকে বিকৃত করা। এ পাপের কোনও প্রায়শ্চিত্ত নেই। মানুষ যে সব সময়ে ইচ্ছে করে বিকৃতি ঘটায় তা নয়, তবে আত্মস্বার্থ বোধের প্রাবল্য, নামধ্যানের খামতি, অজ্ঞানতা, আলস্য, দুর্বলতা, অন্যের প্রভাব, ইত্যাদি নানা কারণে মানুষ ঠাকুরের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয় এবং বিকৃতি ঘটাতে থাকে।

আমি এক ইষ্টভ্রাতাকে জানতুম, তিনি অকৃতদার, বয়স্ক মানুষ। তিনি আমাকে একদিন বললেন, জানেন তো, ঠাকুর সূর্যোদয়ের আগে ইষ্টভৃতি করতে নিষেধ করেছেন।

ঠাকুরের এরকম কোন কথা আছে বলে জানি না। তাই অবাক হয়ে বললুম, তাই নাকি?

হ্যাঁ, সূর্যোদয়ের আগে তো দিন শুরু হয় না, তাই বারণ।

এরপর তিনি যা বললেন তা ভয়াবহ। তিনি রোজ রাত তিনটের সময় ওঠেন, প্রাতঃকৃত্যাদি করেন, চা এবং চিঁড়েভাজা দিয়ে জলযোগ করেন, কারণ তখনও তো পরের দিনটা শুরু হয়নি, আগের দিনটাই চলছে। জলযোগের পর তিনি নামধ্যান করতে বসেন এবং যেই সূর্যোদয় হয় তখনই ইষ্টভৃতি করেন।

একথা শুনে আমি হাসব না কাঁদব তা ভেবে পেলুম না। তবে আর একজন বিখ্যাত এবং প্রজ্ঞাবান ইষ্টভ্রাতাও এরকম একটা কথা আমাকে বলেছিলেন। তিনি নাকি সূর্যোদয়ের আগে ইষ্টভৃতি করে ফেলায় ঠাকুর তাঁকে আবার সূর্যোদয়ের পর ইষ্টভৃতি করিয়েছিলেন। আমি তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলুম, ঠাকুরের কোন বাণীতে এরকম নির্দেশ আছে? তিনি বলতে পারেননি। বুঝতে পারলুম একটা মনগড়া ব্যাপার ঠাকুরের নামে কিছু লোক চালু করে দিয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঠাকুরের ওপর খোদকারি।

জনৈক নামকরা ইষ্টভ্রাতা একবার স্বস্তিযজ্ঞ চালু করেছিলেন। একদিন আমার

বাড়িতে একটি তরুণ গুরুভাই এল। তার মাথা ন্যাড়া, আমি ন্যাড়া মাথা দেখে শশব্যস্তে তার মা-বাবা কেমন আছেন জিজ্ঞেস করলুম, সে একগাল হেসে বলল, সব ভাল। জিজ্ঞেস করলুম, তুমি ন্যাড়া হয়েছো কেন? মাথায় খুসকি বা উকুন হয়েছে নাকি? সে বলল, না। একটি স্বস্তিযজ্ঞ করলুম তো, তাই। স্বস্তিযজ্ঞ! আমি আকাশ পাতাল ভাবতে বসলুম। স্বস্তিযজ্ঞ বলে ঠাকুরের কোনও ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত আছে বলে তো জানি না। তাই জিজ্ঞেস করলুম ব্যাপারটা কী বলো তো! তখন সে বলল, সকাল থেকে অনাহারে থাকতে হয়। সারাদিনে অন্তত এক হাজার টাকা যতক্ষণ না সংগ্রহ করা যাচ্ছে ততক্ষণ জলগ্রহণ নিষেধ।

জিজ্ঞেস করলুম, ঠাকুরের কোন বইতে এই যজ্ঞের কথা আছে।

সে বলল, তা আমি জানি না, তবে আছে নিশ্চয়ই। অমুকদা জানেন।

বেশ কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর বুঝতে পারলুম এটা ঠাকুরের নিদান নয়, অমুক দাদারই নিদান। তিনিই নিজের মাথা খাটিয়ে এই ফিকিরটি বার করেছেন। এবং তা ঠাকুরের নামে চালাচ্ছেন বোকাসোকা গুরুভাইদের কাছে।

সেই দাদাটি স্বস্তিযজ্ঞের মতো আরও দু একটি যজ্ঞ চালু করেছিলেন, তবে সেগুলোর নাম আমার আর আজ মনে নেই। ঠাকুরকে সংশোধন করা বা তাঁর নাম ভাঙিয়ে নিজস্ব পথে মানুষকে চালনা করা যে কতখানি বিপজ্জনক তা সকলেই বুঝবেন।

অর্থসংগ্রহ করা তো নিশ্চয়ই প্রয়োজন। ঠাকুরের কত কাজ আছে যা করতে গেলে টাকা অঢেল দরকার। তা ঠাকুর তো নিজেও দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। কপর্দকহীন অবস্থা থেকে এত বড় সংগঠন গড়ে তুললেন কীভাবে? সে কি মানুষের কাছে শুধু হাত পেতে না নানারকম বুজরুকি করে? তাঁর নামে যে আজও মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে লাখো লাখো টাকা ঢেলে দেয় তা কীভাবে হচ্ছে? আসল কথা হল, টাকা নয়, ঠাকুর অর্জন করতেন মানুষকে। আর মানুষকেই যদি অর্জন করা যায় তাহলে কি আর টাকার অভাব হয়?

আমাদের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের নিয়ন্তা হলেন ঠাকুর। ঠাকুরই মানুষ যাচাইয়ের সর্বোত্তম কষ্টিপাথর। কাজেই আমরা যা কিছু করছি তা ঠিক হচ্ছে কিনা তার বারংবার ঠাকুরের নীতিবিধির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা দরকার। নিরন্তর নিজেকেও যাজন করা দরকার। নইলে আমাদের আত্মবিশ্লেষণ হবে কী করে? এই আত্মবিশ্লেষণ করা হয় না বলেই আমরা ঠাকুরকে নিয়ে মনগড়া নানা ছেলেখেলা করি।

ঠাকুর যে আন্দোলন শুরু করে গেছেন তা হচ্ছে চেতন হওয়ার, জীবনকে দুহাতে আলিঙ্গন করার আন্দোলন। আমাদের নামধ্যান, সাধনা, ক্রিয়াকর্ম, যজন, যাজন

সব কিছুই কিন্তু আনন্দেরই অভিসারী। ঠাকুর আমাদের জীবন থেকে দুঃখের মূল উৎপাটন করতে চেয়েছিলেন এবং তার জন্যই তাঁর দেওয়া নানা বিধান। এ সমস্ত বিধানই জীবনমুখী, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং অতিশয় বাস্তব। তাঁর দেওয়া বিধান থেকে এক তিল বিচ্যুতিও কিন্তু আমাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট করে দিতে পারে।

ঠাকুর আমাকে অনেক দিয়েছেন। সেটা প্রত্যক্ষ দান নয়। কিন্তু জীবনের চারদিক থেকে পাওয়ার পথগুলি খুলে দিয়েছেন। আমার অকিঞ্চন জীবনে ঠাকুরই একমাত্র অবলম্বন। আর ঠাকুর ছাড়া অন্য কোন পথও আমার সামনে একসময়ে খোলা ছিল না।

ঠাকুর সম্পর্কে অনেক কথা বলার পরেও অনেক বাকি থেকে যায়। তার কারণ ঠাকুরের জীবন ও জীবনদর্শনের মধ্যেও এক রহস্যময় গভীরতা রয়েছে যেখানে পৌঁছোনোর সাধ্য আমাদের নেই বা হবেও না। ঠাকুরকে আমি যে কয়েক বছর ধরে চাক্ষুষ দেখেছি সেই কয়েক বছর তাঁকে মানুষ হিসেবে আমার ধী ও বোধ দিয়ে বহুভাবে বিচার করতে চেষ্টা করেছি। ত্রিমাত্রিক তাঁর অস্তিত্ব, তবু আরও একটি মাত্রা যেন আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেল। এই যা আমার নাগালের বাইরে রয়ে গেল সেখানেই নিহিত রইল ঠাকুরের স্বরূপ। তিনি আসলে কে, তিনি আসলে কী তা তিনি দয়া করে প্রকাশ না করলে আমাদের সাধ্য কী, তাঁকে উন্মোচন করি?

ঠাকুরকে জানার ও বুঝবার জন্য আমি গুরুভাইদের সঙ্গে প্রথমাবধি মেলামেশা করে আসছি। অন্যের মারফত ঠাকুর সম্পর্কে জানবার চেষ্টা ছাড়া উপায় কী? ঠাকুরের কাছাকাছি যাওয়ার উপায় ছিল না। সব সময়ে লোক তাঁকে ঘিরে থাকে। তাছাড়া আমিও তখন বেজায় লাজুক আর মুখচোরা ছিলাম। কিন্তু ঠাকুর সম্পর্কে জানবার প্রবল আগ্রহে গোয়েন্দার মতো তথ্য সংগ্রহ করতে ছাড়িনি।

এই অনুসন্ধান আমার পক্ষে মঙ্গলজনকই হয়েছে। জেনেছি অনেক। বুঝেছি, ঠাকুর ওই একটিমাত্র জায়গায় বসে থেকে কত না কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছেন, কত মানুষকে পরিপূরণ করছেন, কত আর্তকে রক্ষা করছেন। অলৌকিক? ঠাকুরের কোনও ব্যাপারকেই আমার মিরাকল বলে মনে হয় না। মনে হয় বিশ্বনিয়ন্তা তিনি। তাঁর পক্ষে তো সবই সম্ভব। ঠাকুরের জীবনে যা কিছু ঘটেছে সবই এত স্বাভাবিক ও বাস্তবভাবে যে কখনও সেগুলিকে মিরাকল মনে করতে ইচ্ছেও হয় না।

ঠাকুরকে আশ্রয় করার পর আমার জীবনেও নানা ঘটনা ঘটতে শুরু করে। এই সব ঘটনা নিজের জীবনে না ঘটলে অবশ্যই আমি বিশ্বাস করতাম না। ভারতবর্ষে ধর্মের নামে ম্যাজিক দেখানো এক প্রচলিত ব্যাপার। অনেক সাধু বা ধর্মগুরু শুধু ওই অলৌকিক কাণ্ডকারখানার ওপরেই খ্যাতি অর্জন করেন। এই সব ম্যাজিক

ওয়ালাদের পাল্লায় পড়ে ধর্মের মূল উদ্দেশ্যই গৌণ হয়ে গেছে। ঠাকুরকে এঁদের সমপর্যায়ে টেনে যদি কেউ নামায় তাহলে সে গর্হিত অন্যায় কাজ করবে। ঠাকুরের যে অঘটন ঘটন পটুত্বের কথা বলেছি তার পেছনে রয়েছে প্রগাঢ় বাস্তববোধ আর আচরণ। ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে অনেকেরই অলৌকিক সংঘটনের ক্ষমতা রয়েছে, তার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি। কিন্তু তা ঘটছে নিতান্তই বাস্তব কার্যকারণে নিয়ম মেনে। এর একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

মানুষের মধ্যেই প্রকৃতিদত্ত অফুরন্ত শক্তি ও ক্ষমতার ভাণ্ডার রয়েছে। কিন্তু এই ক্ষমতার সম্যক ব্যবহার খুব কম মানুষই করে। আমাদের মস্তিষ্কের ধূসর কোষের বেশির ভাগই জাগ্রত থাকে না। আর আমাদের বৃত্তি-প্রবৃত্তিগুলির সমন্বয় ঘটানোর সক্রিয় পন্থা বা উদ্যোগ কী হওয়া উচিত তা আমাদের জানা নেই। ঠাকুর মানুষের মধ্যে নিহিত প্রকৃতিদত্ত এই সব শক্তিকে জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল করার যে স্বাভাবিক পদ্ধতি আমাদের শিখিয়েছেন তার তুলনা সমগ্র বিশ্বে আর পাওয়া যাবে না। ঠাকুরের পন্থায় চলতে মানুষকে তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ছেড়ে বনে-জঙ্গলে গিয়ে কঠোর তপস্যার নামে মানসিক ও শারীরিক কষ্ট পোহানোর প্রয়োজন নেই। তার জীবনযাত্রার ভিতরেই আনতে হবে কিছু শুভ পরিবর্তন আর মানসিকতায় কিছু দৃঢ়তা।

ঠাকুর বলেছেন, "বনের চেয়ে ঘরের সন্ন্যাসীই পাগল বেশি।" কথাটা যেমন সুন্দর তেমনই সত্য। বনের সন্ন্যাসী বন্ধনমুক্ত বলেই তার সেই টান হবে না, বন্ধনে থেকে একজন গৃহস্থের যে টানটা ঈশ্বরের প্রতি হয়। তাই গৃহী-সাধুরই সুযোগ আছে তাড়াতাড়ি ঈশ্বর-সান্নিধ্যে যাওয়ার। ঠাকুরের দেওয়া গৃহসন্ন্যাসটির স্বরূপ অতীব চমৎকার। পুরাকালের ঋষিমুনিরা তপোবনে বাস করতেন বটে, কিন্তু তাঁরা বিবাহাদি করতেন, সন্তান-সন্ততিও হত। কিন্তু তাঁদের সংসারাশ্রমও ছিল ইষ্ট পূরণার্থে। সমস্ত জীবন ও জীবন যাপনই ছিল মঙ্গলমুখী।

ঠাকুর যতি-আশ্রম সৃষ্টি করেছেন। যতিরা প্রকৃত সন্ন্যাসী। তবে তাঁদের পোশাক স্বাভাবিক, জীবনযাত্রা স্বাভাবিক, কিন্তু সংসারের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক থাকবে না। ভিক্ষান্নই তাঁদের সম্বল হবে। এ-জীবন যে কোনও সন্ন্যাসীর জীবনের চেয়ে সহজ তো নয়ই বরং কঠিনতর। ঠাকুর এঁদের জন্য যতি-আশ্রম স্থাপন করেন।

কিন্তু যতিদের কথা থাক। ঠাকুরের যাঁরা সাধারণ শিষ্য তাঁদেরও কিন্তু একরকম সন্ন্যাস জীবনই কাটাতে হয়। তবে তা বিশুষ্ক জীবন নয়। যপতপ নামধ্যান সদাচার তার জীবনে এমনই সহজে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠবে যে সেগুলিকে আর আলাদা বা অতিরিক্ত কোনো আয়াস বলে মনে হবে না। যে সাগ্রহে এবং সানন্দে ঠাকুরকে

গ্রহণ করে সে সহজেই পারে। নিরামিষাশী হওয়া বা সদাচার পালন করার ব্যাপারে আমার নিজেরও কম বাধা ছিল না। নিরামিষের বিরোধী ছিলেন আমার মা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন। আর আর আমিষাসক্ত রসনাও তো কম বিরুদ্ধতা করেনি। কিন্তু ঠাকুরের ইচ্ছাতেই ধীরে ধীরে আমার মাছ-মাংসের আসক্তি চলে যেতে লাগল। দীক্ষার দু'বছর পরে অবধি মাছ-মাংস খেতাম বটে, কিন্তু অনিচ্ছের সঙ্গে। আমার অভ্যন্তর যেন আমিষ গ্রহণ করতেই চাইত না। এর কারণ আর কিছুই নয়, যাকে ভালবাসা যায়, তার রুচি এবং ইচ্ছা ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। প্রেমাসক্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এটা প্রায়ই দেখা যায়।

ঠাকুরের প্রগাঢ় ও গভীর ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণ মানুষকে এমনই প্রভাবিত করে যে, ঠাকুরের ইচ্ছা অনিচ্ছা বুঝে চলতে তার কোনও কষ্ট হওয়ার কথাই নয়। মনে রাখতে হবে, আমাদের মঙ্গলকামনা ছাড়া এই দুনিয়ায় ঠাকুরের আর কোনও চাহিদা ছিল না। ছলে-বলে কৌশলে তিনি আমাদের ভাল করারই চেষ্টা করেন।

প্রথম দিকে, অর্থাৎ আমার দীক্ষার পরই ঠাকুরের পরিমণ্ডলে কয়েকজন এমন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল যাঁরা আধ্যাত্মিকতার পথে অনেকটাই প্রাগ্রসর বলে মনে হয়েছে। এখানে তাঁদের নামোল্লেখ করব না, তবে আমার ব্যক্তিগত জীবনে এঁদের অতিশয় গভীর প্রভাব আজও রয়েছে। ঠাকুরের পথে চলবার জন্য একটি অব্যাহত প্রচেষ্টা দরকার। সাধারণ পথে এমনিতেই ওঠা-পড়া আছে। ঠাকুরের পথে সেটা আরও বেশি বোঝা যায়। গতি ও একরোখা অনুশীলন না থাকলে পিছিয়ে পড়তেই হবে। দীক্ষার পর যে যত নামধ্যান ও চারিত্রিক সংশোধন করে তার মুখে-চোখে, চলায় ফেরার ততই ভাগবত ভাব প্রকট হয়। উন্নতিটা হয়ও খুব দ্রুত। কিন্তু গতি বজায় না রাখলে বা ঢিলে দিলেই আবার সেই জ্যোতি ও বিভা উধাও হয়।

সহজ কথায় বলতে গেলে, ঠাকুরের সঙ্গে কোনও লুকোচুরি কোনও চালাকিই সম্ভব নয়। ঠাকুরের পথ যেমন কঠিন তেমনই সহজ। বিশ্বাস ও ভক্তি এবং ভালবাসা না থাকলে ঠাকুরকে অনুসরণ করা অতীব কঠিন, আর থাকলে খুবই সহজ। তিনি বুদ্ধির প্যাঁচে ধরা দেন না, কিন্তু সহজ ভক্তির কাছে জল হয়ে যান। ঠাকুরকে নিয়ে গত বাইশ তেইশ বছর চলার অভিজ্ঞতা থেকেই এই শিক্ষা আমার হয়েছে।

গত বাইশ তেইশ বছর ধরে ঠাকুরকে বুঝবার বা জানবার চেষ্টা যতটা করেছি সেটা মুখ্য নয়, তার চেয়ে বেশি ঠাকুরকে ধরে বাঁচতে চেয়েছি। বিপত্তারণ ঠাকুর আমাকে বারংবার রক্ষা করেছেন। কিন্তু পুরোপুরি ধরা তো দেননি। কাউকেই কি তিনি তেমনভাবে ধরা দেন?

আমার এক বন্ধু এক সময়ে প্রবল রকমের ভক্ত ছিল ঠাকুরের। তার সবসময়ের ধ্যানজ্ঞান ছিলেন ঠাকুর। বিয়ের পরই কিন্তু তার ওই রোখ ভীষণ কমে গেল। আর বিয়েটাও সে তেমন ভাল করেনি, আবেগেচালিত হয়ে করেছিল।

শুধু বিয়ে কেন, জীবনের যে কোনও গুরুতর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সে-ব্যাপারে ঠাকুর কী বলেছেন সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। ঠাকুরের সঙ্গে অমিল হলে সেটা বর্জন করা নির্মমভাবেই প্রয়োজন।

ঠাকুরকে জীবনে সর্বতোভাবে গ্রহণ করলে বাস্তবজ্ঞান, বুদ্ধি বিবেচনা ও বিচারবোধ যে বৃদ্ধি পায় তা আমার নিজের জীবনেই দেখেছি। ঠাকুরকে আশ্রয় করার আগে আমি ছিলাম অন্যমনস্কতা ও অবাস্তবতার শিকার। কীভাবে চলছি, কী করছি তার কোনও ঠিক-ঠিকানাই নেই। তেমন কোনও উদ্দেশ্য ছিল না, জীবনটাকে মাঝে মাঝে অর্থহীন মনে হত। ঠাকুরকে আশ্রয় করার পরই মাঝে মাঝে আভাসে ইঙ্গিতে বুঝতে শুরু করলাম যে, এ জীবনে অনাবিল আনন্দেরও একটা উৎস আছে। সেই উৎসের মুখটি যদি একবার খুলতে পারি তবে এই অর্থহীন জীবনে সঞ্চারিত হবে গভীর অর্থ আর নতুন মাত্রা। সেই চাবিকাঠি একমাত্র ঠাকুরের কাছেই আছে।

সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গ আমি কিছু কিছু করেছি। সেই ছেলেবেলা থেকেই। এখন সুযোগ পেলেই সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে আধ্যাত্মিকতার মর্ম বুঝতে চেষ্টা করি। আমার মা স্বয়ং গৌরী মায়ের সাক্ষাৎ শিষ্যা এবং ছেলেবেলা থেকে সারদেশ্বরী আশ্রমে থেকে বড় হয়েছেন। রামকৃষ্ণদেব আমাদের বাড়িতে বিগ্রহের আসনে আসীন। তবু একটা বয়সে এসে আমি ধর্ম ঈশ্বর ইত্যাদিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে পুরোপুরি নাস্তিক হয়ে যাই। অথচ ছেলেবেলা থেকেই মায়ের মুখে ঠাকুর দেবতার কথাই শুনে শুনে বড় হয়েছি। অমন ধর্মশীলা মায়ের সন্তান হয়ে কেন যে আমার মধ্যে কালাপাহাড় জেগে উঠেছিল কে জানে! যখন ঘোর মানসিক সংকটে আক্রান্ত হয়ে শুধুমাত্র রক্ষা পাওয়ার জন্য ঠাকুরের আশ্রয় নিলাম তখনও আমার ভিতরে নাস্তিকতা জেঁকে বসে আছে। ঠাকুর আমাকে সেই ঘোর সংকটের গহ্বর থেকে টেনে তুললেন ; আর যে রামকৃষ্ণদেবকে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম তাঁকেই আবার ফিরে পেলাম ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মধ্যে।

রামকৃষ্ণের সঙ্গে ঠাকুরের অভেদ কল্পনা করেন অনেকেই। অভেদ কল্পনা আমিও করি। তবে রামকৃষ্ণদেবের কথামৃতের অমৃতধারা কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। মানুষের অনেক সমস্যা সংকট জটিলতা বিষয়ে সেখানে আলোচনা নেই। ফলে একালের, এই জটিল যুগের আধুনিকতম মানসিক সংকটের প্রতিবিধান সেখানে ততটা মিলবে না।

ঠাকুরের জীবনদর্শন কিন্তু সেদিক দিয়ে অনন্য। এমন কোনও বিষয় নেই যা নিয়ে কথা হয়নি এবং যার সহজ সুচারু অসামান্য সমাধান ঠাকুর দেননি। রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, বায়ুকোণে আর একবার আমার দেহ হবে। সেই দেহধারণই ঠাকুর অনুকূলচন্দ্ররূপে তাঁর প্রকাশ কিনা তা আমাদের মতো অদূরদর্শী কী করে বলবে? শুধু মনে হয় এমন হওয়াই বুঝি স্বাভাবিক। পুরোনো সংস্করণে রামকৃষ্ণদেবের এই উক্তি অনেকেই দেখেছেন। ঠাকুরের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের অনেক মিল। কিন্তু ঠাকুরের ক্ষেত্র বৃহত্তর, পরিপ্রেক্ষিত বিশাল। তার কারণ, ঠাকুর যে সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই সময়টাই জটিলতা ও মনোবিকারের যুগ। এই যুগেই মানুষের পুরোনো মূল্যবোধগুলির অবক্ষয় ঘটে গেল। ফলে রামকৃষ্ণদেবের আমলে যেমনতরো সামাজিক ও ব্যক্তিগত বাতাবরণ ছিল তার ঘটল বিশাল পরিবর্তন। দেখা দিল কঠিনতর মানবিক ও আত্মিক সমস্যা। ঠাকুর ও রামকৃষ্ণদেব এক ও অভিন্ন হয়েও কিন্তু দুটি সত্তা, দুটি বিকাশ। রামকৃষ্ণদেবকে অবিকৃত ও অটুট রেখেও যুগপ্রয়োজনে ঠাকুর বিস্তার ঘটালেন তাঁর জীবনদর্শনের। নূতনতর প্রশ্ন ও সমস্যার উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতেই এল নূতনতর সংযোজন। আর ঠাকুরের এই নূতন দর্শন এক কথায় অভূতপূর্ব এবং অনন্য সাধারণ। নতুন হয়েও তা আসলে শাশ্বত।

আমাদের শাস্ত্রাদিতে জীবন বিজ্ঞানের অতিশয় কার্যকর গবেষণার যে পরিচয় আছে সেগুলিকে আমরা উপেক্ষা করেছি এবং খতিয়ে দেখিনি। ঠাকুর পুরোনো সেই সব গবেষণাকেই যুগোপযোগী করলেন এবং তার চেয়েও বড় কথা কালের শৈবাল থেকে সেগুলিকে মলমুক্ত করলেন। শব্দ এবং ধাতুর মূল ধরে সেগুলির যে ব্যাখ্যা ঠাকুর করেছেন তা আমাদের বিস্মিত করে। যেমন ধরা যাক ট্যাক্স কথাটার বাংলা ও সংস্কৃত হল কর। কর কথাটার অর্থ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন, করা মানে হাত, তাই কর প্রদান ও গ্রহণ হচ্ছে আসলে হাতে হাত মেলানো। জনসাধারণের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠী এই কর প্রদান ও গ্রহণের ভিতর দিয়ে আসলে মৈত্রীর বন্ধনেই আবদ্ধ হয়।

মনকে ত্রাণ করে যা তাই হল মন্ত্র, এই সংজ্ঞা তো অনেকেই জানেন, কিন্তু তার বাস্তব চর্চা কজন করে দেখেছেন? কৃপা শব্দের মধ্যে যে কৃ অর্থে করা এবং পা অর্থে পাওয়া, অর্থাৎ করে পাওয়া অর্থটি নিহিত রয়েছে, তা যে ছপ্পর ফুঁড়ে পাওয়া নয়, এটাই বা কজন খতিয়ে দেখেছেন।

ঠাকুর শব্দ বা ধাতুর মূল অনুসন্ধান করে তার মূল অর্থ ধরে ব্যাখ্যা করতেন বলেই প্রাচীন শাস্ত্রাদির অনেক অস্পষ্টতা আমাদের কাছে প্রাঞ্জল হয়েছে।

ঠাকুরের ভাষা এতই সমৃদ্ধ ও অলঙ্কারবহুল যে তা গভীর ও ব্যাপক গবেষণার

অপেক্ষা রাখে। বাংলা গদ্যে এক মস্ত বিপ্লব তিনি ঘটিয়েছেন, সেটা হয়তো এখনও সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। তিনি ধর্মীয় পুরুষ বলেই বোধ হয় সাহিত্যিক অধ্যাপক পণ্ডিত গবেষকরা তাঁকে খানিকটা উপেক্ষা করেছেন। বাংলা ভাষায় যে কত অপ্রচলিত মৃত অব্যবহৃত শব্দকে তিনি পুনরুদ্ধার করেছেন, তৈরি করেছেন কত নতুন শব্দ এবং দেশজ মৌখিক কত শব্দকে যে স্থান করে দিয়েছেন তাঁর অনবদ্য গদ্যে তার ইয়ত্তা নেই। ফলে ঠাকুরের গদ্য সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে, যার তুলনা বাংলা সাহিত্যে আর নেই। ঠাকুর বলতেন যে বাংলা ভাষাটা বড্ড সীমাবদ্ধ, এই ভাষায় মনের সব ভাব প্রকাশ করা যায় না। আমি নিজে বাংলা ভাষা নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে ঠিক এই সমস্যারই মুখোমুখি হয়েছি। ঠাকুর আলাপচারির সময় প্রচুর ইংরিজি শব্দ ও বাক্যবন্ধ ব্যবহার করেছেন। বুঝতে পারি বাংলা গদ্যের সীমাবদ্ধতার জন্যই তাঁকে তা করতে হয়েছে। তবে সেসব ইংরিজিও এতই অসাধারণ যে অবাক মানতে হয়। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে তিনি বাণী দিয়েছেন সেখানে ইংরিজি ব্যবহার করেননি।

বাংলা বা ইংরিজি ভাষায় তাঁর এই দখল কী করে সম্ভব হল সেটাও এক গভীর রহস্য। শুধু ভাষাই বা কেন, ঠাকুর বিজ্ঞান, সমাজ, মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, ধর্মীয় কূটপ্রশ্ন দর্শন নিয়ে যা বলেছেন আমাদের বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দেয়। ঠাকুরের সর্বজ্ঞতা নিয়ে আমার যে সন্দেহ প্রথমে ছিল তা তাঁর পুথিপত্র পড়তে পড়তেই উবে যায়। ভাবি শুধু সাহিত্য করলেই ঠাকুর বাংলা ভাষার সর্বোত্তম সাহিত্য রচনা করতে পারতেন। তবে তাঁর মতো মানুষের পক্ষে তো একটা বিষয় নিয়ে থাকা সম্ভব নয়। জীবনে বহু দিক বহু সমস্যা। আর লাখো মানুষ তাঁর শরণাগত। ঠাকুরের কি সাহিত্য নিয়ে থাকলে চলে? তবু ওই অবিশ্বাস্য নিশ্ছিদ্র ব্যস্ততার মধ্যে সমস্যা সংকটে দীর্ণ হতে হতেও তাঁর শ্রীমুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়েছে যা তারই সম্পদ বাংলা ভাষা আরও বহুকাল ভোগ করবে।

দীক্ষার পর দুবছর আমি ঠাকুরের বইপত্র পড়িনি একথা আগেই বলেছি। এখনও যে গভীরভাবে ঠাকুরের বইপত্র নিয়ে পড়াশুনো করতে পারি এমন নয়। কিন্তু মানসিক সংকটে পড়লে আমি ঠাকুরের বই বা ঠাকুর সম্বন্ধীয় বই পাগলের মতো পড়ি। আর তখনই ওই পড়া আমার মনে গভীরভাবে দাগ কাটতে থাকে। একবার আমার মায়ের গুরুতর অসুখের খবর পেয়ে শিলিগুড়ি যেতে হয়েছিল। ডাক্তাররা একরকম জবাব দিয়েছিলেন। পাঁচজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মিলিত হয়ে একই কথা বললেন, যদি বাঁচাতে চান তাহলে হয় কলকাতা বা ভেলোরে নিয়ে যান। তবে বাঁচার কোনও নিশ্চয়তা দেওয়া যাচ্ছে না। মায়ের ওই অবস্থায় আমরা দুই ভাই

শুধু পাগলের মতো নাম করেছি আর ঠাকুরকে ডেকেছি। সেই সময় একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে ডাকা হয়েছিল। তিনি লক্ষণ দেখে বললেন, এটা যেন টিউমারের কেস বলে মনে হচ্ছে না। ওষুধ দিচ্ছি, দেখা যাক। তিনি ওষুধ দিলেন তবু সেই সময়ে হোমিওপ্যাথির ওপর ভরসা না রেখে আমি কলকাতায় চলে এলাম হাসপাতালে মাকে ভর্তি করার অগ্রিম ব্যবস্থা করতে। ওই ফেরার সময় গাড়িতে পড়ার জন্য ছোটো ভাইয়ের কাছ থেকে নানা প্রসঙ্গ এক খণ্ড এনেছিলাম। গাড়িতে বসে মানসিক তীব্র অশান্তি আর অস্থিরতার মধ্যেও যেই বইটি খুলে পড়তে শুরু করলাম অমনি যেন ঠাকুর আমাকে তাঁর বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। তাঁর আশ্চর্য দর্শন ও মায়াময় আধ্যাত্মিক জগতে চলে গেলাম এক লহমায়। তাঁর আশ্চর্য ভাষার জাদু যেন সম্মোহন বিস্তার করে দিল আমার মাথায়। পড়তে পড়তে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হওয়ার জোগাড়। ওই মানসিক অবস্থায় যে কোন গ্রন্থ এমন টনিকের কাজ করতে পারে তা জানা ছিল না। এই ঘটনার পর আমার মা আরও দশ বছর বেঁচে ছিলেন।

ঠাকুরের এই সম্মোহন এখন কত মানুষকে আকর্ষণ করছে। আরও করবে। ঠাকুরের গ্রন্থরাজি একদিন মানুষের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠবেই। কেননা তার ছত্রে ছত্রে জীবনের কথা বাঁচার কথা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। মানুষকে তা দুর্যোগের রাতে বাতিঘরের মতো টানছে এবং পথ দেখাচ্ছে।

ঠাকুরের মতো জীবনদার্শনিকের সব কিছু মানুষ বুঝে উঠতে পারে না। তেমন ধীশক্তি আমাদের নেই। ফলে অপব্যাখ্যা বা ভুল ব্যাখ্যার সম্ভাবনা এসব ক্ষেত্রে খুব বেশি। এমনকি আমি আমার নিজের ক্ষেত্রেও দেখেছি ঠাকুরকে নিয়ে চলতে গিয়ে তাঁর অনেক নীতিবিধির গন্ডগোল হয়েছে। এর জন্যই ঠাকুর তাঁকে অবিকৃতভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বলেছেন। অবিকৃতভাবে কথাটা তিনি ওই জন্যই ব্যবহার করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, তুমি যদি আমাকে ঠিকমতো বুঝে না থাকো তাহলে আমার বাণীর সংশোধন করতে যেও না, যেমন আছে তেমনই থাকতে দাও। ভবিষ্যতের মানুষ হয়তো ওই সব বাণীর সারসত্য হৃদয়ঙ্গম করবে।

তাই ঠাকুরের বাণীর সামান্যতম সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা পরিবর্তন কখনোই বাঞ্ছনীয় নয়। তবে তাঁর বাণী ও জীবনদর্শন নিয়ে আলাপ আলোচনা ব্যাখ্যা সবই হতে পারে তার গ্রন্থগুলিকে অক্ষুন্ন রেখে। ঠাকুরের বাণী অক্ষুন্ন রাখা প্রয়োজন বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর স্বার্থেই।

ঠাকুরের অনেক বাণী অনেক বাক্য এবং শব্দ আমার কাছে অনেক সময়ে প্রাঞ্জল নয়। তার কারণ তাঁর গদ্যে এমন সব বাক্যবিন্যাস বা শব্দ রয়েছে যা আমার পঠন-

পাঠন অভিজ্ঞতার বাইরে। বাংলা ভাষায় ঠাকুর যে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গে সম্যক পরিচয় ঘটতে আমাদের বেশ কিছু সময় লাগবে, তবে শেষ অবধি ঠাকুরের ব্যবহৃত বাংলা ভাষা তার অফুরান শব্দভান্ডারসহ বাংলা সাহিত্য এবং গদ্যচর্চায় এক দিগদিশারী হয়ে উঠতে বাধ্য। নিঃশব্দে এবং অলক্ষ্যে ঠাকুর বাংলা ভাষায় এক বিপ্লব সংগঠিত করেছেন, অনেকেই তার খবর রাখেন না। তবে ক্রমে ক্রমে এদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষিত হচ্ছে।

ঠাকুরই আমাদের সর্বশেষ আশা ও ভরসা, ঠাকুরই শেষ আশ্রয় একথা নিজে যতটা বুঝতে পারি ততটা অন্যদের বোঝাতে পারি না। ঠাকুর যাকে যাজন বলেন তার সাফল্য নির্ভর করে চারিত্রিক বিকাশের ওপর। আমাদের সেই বিকশিত চরিত্র কই? আমার তো এমন হয় দিনের পর দিন ঠাকুরের কথা বলব এমন মানুষ খুঁজে পাই না। যাজন করে দীক্ষা দেওয়া মাঝে মাঝে বেশ কঠিন বলে মনে হয়। আমার নিজের চরিত্রে যে জড়তা রয়েছে তাকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টাই আমার ব্যক্তিগত অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম।

এ জড়তার শিকার শুধু আমি একা তো নই। আমার মতো আরও আছেন কেউ কেউ। এই জড়তার কথা ঠাকুর বারংবার উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন প্রসঙ্গে। কী করে তা কাটিয়ে ওঠা যায় ঠাকুর তারও তুক দিয়েছেন। তবু আমরা এই জড়তার প্রেমে বিজড়িত হয়ে এমন ফাঁদে আটকে পড়েছি যে বেরোবার ইচ্ছেটা পর্যন্ত জোরদার হতে চায় না।

ঠাকুর মানুষের সবরকম দুর্বলতাকেই গভীরভাবে চেনেন। জানেন নানা অভিভূতি আমাদের কেমন অবশ বিবশ নিশ্চেষ্ট করে রেখেছে। এই জড়তা শুধু মনকেই আচ্ছন্ন করে না, তার প্রভাবে শরীর পর্যন্ত নিস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হয়। আমি এ সত্য নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই উপলব্ধি করেছি। এই জড়তা অঙ্গবিস্তর গোটা জাতিকেই যে আচ্ছন্ন করে আছে ঠাকুর তা ভালই জানেন।

মানুষকে এই সব জড়তা থেকে মুক্ত করাই ঠাকুরের উদ্দেশ্য। তাই আধ্যাত্মিক পুরুষ, ধর্মগুরু হয়েও তিনি যেন আরও কিছু বেশি। তিনি একাধারে ব্যক্তি মানুষের মনোজগতের যোদ্ধা, সমাজ ও রাষ্ট্রের সংস্কারক এবং প্রবল বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন এক দার্শনিক। ঠাকুরের ব্যপ্তি ও বিশালতাই আমাদের স্তম্ভিত করে দেয়।

ঠাকুর নিজে সবরকম অভিভূতি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁর মতো অবয়ববিশিষ্ট হয়েও তাঁর চেয়ে কত বিভিন্ন রকম। আমাদের মধ্যে তবু ঠাকুরত্বই দেখতে চেয়েছেন তিনি ঠিক তাঁর মতোই। এ তাঁর এক অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা। মানুষের উন্নতি, মানুষের মঙ্গল দেখতে তিনি ভালবাসতেন। এত উৎসুক হয়ে

থাকতেন যে মনে হত এছাড়া তাঁর অস্তিত্বই বিপন্ন। আমাদের ভিতরেই যে তাঁর অস্তিত্ব নিহিত তাও তিনি বলেছেন। আমরা এবং ঠাকুর যে আলাদা নই সে সত্য আমরা তত্ত্বগতভাবে জানি। তিনি এক ছিলেন, বহু হয়েছেন। আমাদের সকলের ভিতরেই নিহিত আছেন তিনি। কিন্তু যতক্ষণ সেটা উপলব্ধি ও অনুভবে না আসে ততক্ষণই জীব আর শিবে বিভিন্নতা। আমাদের ভিতরে যাতে আমরা ঠাকুরত্বের উদ্বোধন করি, আমাদের মধ্যে যাতে তিনিই জাগ্রত হন তার জন্যই ঠাকুরের যা কিছু ব্যাকুলতা।

ঠাকুর চান আমরা সব তাঁর মতো হয়ে উঠি। আমাদের কাছে তাঁর এই প্রত্যাশা এতই তীব্র ও প্রবল যে নানাভাবে তিনি আমাদের ভিতরে ঠাকুরত্ব জাগানোর প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। ঠাকুর হয়ে ওঠা যদি আমাদের না হয় তাহলেও ওই চেষ্টার ফলে আমরা অনেক দূর এগোতে পারব, ক্ষুদ্র মনুষ্য কায়ায় পড়বে তাঁর ছায়া।

আচার চর্যায় (১ম খণ্ড ২৮ নং) ঠাকুর বলেছেন, "রান্না যেমন নুন-ঝালের উপযুক্ত সংমিশ্রণ ছাড়া স্বাদে ভাল হয় না তেমনি শুধুমাত্র অসাড় ভালমানুষ হলেই চলবে না কিন্তু ; চতুর হওয়া চাই, তীক্ষ্ণ হওয়া চাই, দক্ষ কর্মকুশল হওয়া চাই, তবেই তো কৃতী হতে পারবে—অন্তরায় অতিক্রম করে সম্বর্ধনার দিকে।" আবার একই গ্রন্থে ২১ নম্বর বাণীতে ঠাকুরের শ্রীমুখে উচ্চারিত হয়েছে, "বোধের আবাস শ্রদ্ধায়, সৌন্দর্য রয় ভাবে, কৃতিত্ব রয় কর্মে প্রাজ্ঞতা রয় ইষ্টনিষ্ঠায়, মহত্ত্ব থাকে ব্যবহারে, সেবায়, আর এই পঞ্চ সম্মেলনেই দেবত্বের উদ্ভব।"

এ থেকেই বোঝা যায় ঠাকুর আমাদের কীরকম দেখতে চান। আমরা কীরকম হলে অনেকটা তাঁর মনের মতো হবো।

ঠাকুর ভালমানুষ পছন্দ করতেন বটে, কিন্তু নিছক ভালমানুষ হলে তার দুনিয়ায় রাখালগিরি করা যায় না। তাই তিনি পছন্দ করতেন ডাঁটো শক্তপোক্ত মানুষ, যার চরিত্রের জোর আছে, সাহস আছে। যে বেপরোয়া হয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এবং কিছুতেই দমিত হয় না। কিন্তু সাধারণ বাঙালীর চরিত্রে এই ধাতই নেই এবং উদ্যম সাহস কর্মমুখরতায় বাঙালী বোধ হয় ভারতের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী। তবে এই বুদ্ধিমান জনগোষ্ঠী যদি জাগ্রত হয়, কর্মমুখর হয়ে ওঠে তবে তার পক্ষে গোটা ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব। তাই ঠাকুর বলেন, বাঙালী জাগলে ভারত জাগবে, আর ভারত জাগলে জগৎ।

ঠাকুর যে খুব অনুভূতিপ্রবণ ছিলেন একথা তাঁর কাছের মানুষদের অজানা নেই। ঠাকুর বলেছেন, তাঁর ভাল থাকা না থাকা তাঁর আয়ু সবই নির্ভর করে তাঁকে আমরা কতটা ভালবাসি তার ওপর। আমরা চাইলে তিনি সুস্থ থাকবেন, আমরা যতদিন

চাইব ততদিন তিনি বেঁচে থাকবেন।

মনে আছে তাঁর দেহাবসানের বছর দুই আগে একবার আমি আর কল্যাণ দেওঘরে গেছি। সকালবেলা পৌঁছে কোনওরকমে হাতমুখ ধুয়েই ছুটে গেছি ঠাকুর বাংলায়। গিয়ে তীব্র হতাশার সঙ্গে দেখলাম, পার্লার বন্ধ। ঠাকুরের শরীর ভাল নয় বলে দর্শন হবে না। সে-সময়ে উৎসব ছিল না, কাজেই ভিড়ও নেই। আমার কী মনে হল, পার্লারের সামনে মাটিতে উপুড় হয়ে প্রণাম করতে করতে বললাম, তোমাকে যদি একটুও ভালবেসে থাকি, আমার ভাল বাসার যদি সামান্যতম দামও থেকে থাকে, তবে যেন বিকেলে তোমাকে সুস্থ আর উৎফুল্ল দেখতে পাই।

মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর ঠাকুরের রক্ষণাবেক্ষণ যাঁরা করেন তাঁদের মুখে শুনলাম, ঠাকুরের শরীর খুবই খারাপ। এখন দু-চারদিন আর দর্শনের আশা নেই।

মন খারাপ করে ফিরে গেলাম চৌধুরী ভিলায়। সারাদিন উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ নিয়ে কাটিয়ে বিকেলবেলা ফের ঠাকুর-বাংলায় গিয়ে হাজির হলাম। যা দেখলাম তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ঠাকুরের পার্লারের সব দররজা জানালা খোলা, ভিতরে ঝলমল করছে আলো আর তার চেয়েও যেন অনেক বেশি ঝলমল করছেন ঠাকুর। ফূর্তিতে যেন ডগমগ। অসুস্থতার চিহ্নমাত্র তাঁর শরীরে বা মুখভাবে নেই।

স্তম্ভিত হয়ে ঠাকুরের সামনে গিয়ে প্রণাম করে বসলাম। ঠাকুর আমার দিকে বিশেষ নেত্রপাত করলেন না বটে, কিন্তু আমার মন নাচতে লাগল আনন্দে। একটি আন্তরিক প্রার্থনার এত দাম যে তিনি দেবেন তা তো জানা ছিল না! কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে এল।

ঠাকুর যা বলেন তার সবই সত্য, সবই পরীক্ষিত। আমি নিজে বারবার তাঁকে পরীক্ষা করেছি, নানা ভাবে, নানা কৌশলে। কোনওবারই সেই পরীক্ষা বিফলে যায়নি। যখনই দেখা যাবে ঠাকুরকে স্মরণ মনন নামধ্যান ইত্যাদিতে কাজ হচ্ছে না তখনই বুঝতে হবে ইষ্টভৃতি স্বস্ত্যয়নীতে কোনওরকম ত্রুটি বা অনিয়ম থেকে যাচ্ছে। অনিয়ম বা ত্রুটি হয়তো সামান্যই। কিন্তু ওটুকু মেরামত না করলে কাজ এগোতে চাইবে না।

কথাটা বলতে পারছি ভুক্তভোগী বলেই। ঠাকুরের নীতিবিধি ঠিকমতো প্রতিপালন না করলে অভীষ্ট যেমন সিদ্ধ হয় না, তেমনি অনর্থক উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত হতে হয়। ঠাকুরকে আশ্রয় করলে সকলেরই কিছু না কিছু শুভ পরিবর্তন ঘটবেই। তবে কোথাও ফাঁক থাকলে এই পরিবর্তন তেমন বিশাল-বিস্তারী হতে পারে না, কোথায় যেন ঠেকে থাকে, আটকে যায়।

কিছুদিন আগে আমি আলোচনায় এক নিবন্ধে লিখেছিলাম যে, ইষ্টভৃতি পাঠানোর দিন যতক্ষণ তা পাঠানো না হচ্ছে ততক্ষণ জলগ্রহণ করতে নেই। কয়েকজন ইষ্টভ্রাতা এবং কর্মীদের মধ্যেও কেউ কেউ এ ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করেন। তাঁদের বক্তব্য, এমন কথা তাঁরা কোথাও পাননি। দেওঘরেও কয়েকজন এ ব্যাপারে আমার কাছে জানতে চান, এ কথা কোথায় আছে। বনগাঁ থেকে একটি ছেলে একদিন আমার বাড়িতে এসে হাজির, সেখানকার এক ইষ্টভ্রাতা নাকি বলেছেন, এরকম কথা ঠাকুর কোথাও বলেননি।

একটু চিন্তা করে বুঝলাম, অনেকেই যে কথাটা জানে না তার কারণ ঋত্বিক বইখানা আমরা আদ্যোপান্ত পড়ি না। আমি নিজেও এই অপরাধে অপরাধী। কিন্তু এক সময়ে বিপন্ন হয়ে আঁতিপাঁতি করে ঋত্বিক বইখানা পড়তে হয়েছিল। ওটুকু গ্রন্থের মধ্যে কত কী রয়েছে।

ঋত্বিক-বই অন্য কাউকে দেখানো নিষেধ। তবু বনগাঁর গুরু ভাইটির প্রতীতি জন্মানোর জন্য আমি প্রাসঙ্গিক পৃষ্ঠাটি খুলে তাঁকে নির্দেশটি দেখাই এবং বলি, তোমরা সবাই এই নির্দেশ মেনেই চলবে।

ঠাকুর সম্পর্কে অনেক জেনেও অনেক সময়ে দেখা যায় আমাদের অনেক রকম ভুল-ভ্রান্তি হয়। এটার কারণ বোধ হয় আত্মতুষ্টির ভাব। আমি নিজে এর জন্য অনেক ভোগান্তি পুইয়েছি বলে ঠাকুরের দেওয়া আবশ্যিক নীতিবিধিগুলির প্রতি ইদানীং মনোযোগী হয়েছি। এই নীতিবিধিগুলি জীবনের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে সহজভাবে অঙ্গীভূত করে না নিলে অসুবিধে হতেই পারে। ঠাকুর এমন একজন মহাপুরুষ, যাঁর মুখনিঃসৃত কোনও বাণীই বিফল হওয়ার নয়। তাই অন্তত নিত্য পালনীয় কর্তব্যগুলির ত্রুটি রাখতে নেই।

মাসে একটি দিন—অর্থাৎ ইষ্টভৃতি পাঠানোর আগে পর্যন্ত জলগ্রহণ না করলে কোনও কষ্ট হয় না। আর যদি বা হয় তবে সেই কষ্টটাই তো ঠাকুর। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ঠাকুরকেই তো মনে পড়বে। তাঁর দয়াল মুখখানা, তাঁর মিষ্টি হাসিটি এ সবই ভুলিয়ে দেবে কষ্টকে। কষ্টের বিনিময়ে লাভ হবে তাঁর স্মরণ মনন। নিষ্ঠার অনেক গুণ। নিষ্ঠা আমাদের জীবনে অনেক উপরি লাভ সঞ্চার করে দেয়। নিষ্ঠাবানরাই ঠাকুরকে আমান উপলব্ধি করতে পারে। নিষ্ঠার পথেই আসে ভক্তি, আনন্দ, সাফল্য। ঠাকুর মানুষ চাইতেন। মানুষই তাঁর সম্পদ। মানুষ সম্পর্কে তাঁর কোনও ক্লান্তি ছিল না। আমরাই বা তাঁর কাজে কেন নিষ্ঠাবান হবো না? তাঁকে আমাদের এটুকু ছাড়া আর কী দিতে পারি?

দেখবেন ইসকন, আনন্দমার্গ ইত্যাদি ধর্মীয় সংস্থা তাঁদের সংগঠন বা মন্দির-

আশ্রম দেখানোর জন্য সর্বদা উন্মুখ। কলকাতা থেকে আগ্রহী মানুষকে আশ্রমে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইসকনের নিজস্ব বাস রোজ মায়াপুর যায়। এ বাবদ প্রচুর অর্থব্যয় করে তাঁরা গড়িয়াহাটের মোড়ে চলমান বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। মায়াপুরেরও চমৎকার প্রশস্ত গেস্টহাউস ইত্যাদি আছে। আছে খাওয়া-দাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা। আনন্দমার্গও অতি যত্নে মানুষকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যায় এবং সেবার ব্যবস্থা করে। ভারত সেবাশ্রম সংঘ তো এ ব্যাপারে বহুকাল ধরেই খ্যাতির শীর্ষে আছে। রামকৃষ্ণ মিশনও তাই।

আমারও মাঝে মাঝে মনে হয়, সৎসঙ্গও যদি ওরকম পারত! অনেকে বলেন, আপনাদের আশ্রমে গিয়ে থাকার জায়গা পাওয়া কঠিন। কথাটা মিথ্যেও নয়। দেওঘর ঠাকুরবাড়ি সারা বছরই মানুষের আগমনে এত মুখর যে, সেখানে স্থানাভাব হওয়া স্বাভাবিক। এত মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার মতো জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে?

উৎসবের সময় দেখা যায়, কোটিপতি লক্ষপতি যেমন, তেমনি পরিবগুর্বো সাধারণ মানুষও পড়ে আছে গাছতলায়, খোলা মাঠে, প্যাণ্ডেলে বারান্দায়। শীত-গ্রীষ্ম, ঝড়-বৃষ্টি কিছুরই পরোয়া নেই। শৌচালয়ের অভাব বা জলকষ্ট তারা গ্রাহ্যও করে না। ঠাকুরবাড়ির আকর্ষণ, আশ্রমের এক মায়াবী বাতাবরণ আর মানুষের আনন্দমেলা তাঁদের দেহকষ্ট ভুলিয়ে দেয়। মানুষ তাঁর কাছে এমন কিছু পায়, এমন মহার্ঘ কিছু যার কাছে সব কিছুই তুচ্ছ।

দেওঘরের সৎসঙ্গনগর যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন এটি একটি ছোটখাটো শহর। অনেকটা জায়গা জুড়ে এর বিস্তার। তবু স্থানাভাব থেকেই যায়। কারণ প্রাণের টানে আসা মানুষের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, যত দ্রুত বেড়ে ওঠা সম্ভব নয় বাড়ি-ঘর কিংবা অতিথিশালা। যাঁরা ঠাকুরের আস্বাদ পেয়েছেন তাঁদের কাছে আশ্রয় বলতে কিছু প্রয়োজন নেই। গাছতলাও লাগে না তাঁদের। তবে ভ্রমণকারীদের কিছু অসুবিধা মেনে নিতেই হয়। প্রথম দিকে আমরাও খড়ের বিছানায় শুয়েছি। শতরঞ্চির বেশি কিছুই হয়তো জোটেনি, তবু কী যে আনন্দ।

ঠাকুরের শতবার্ষিকীর সময় যে লোক সমাগম হয়েছিল তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হওয়া শক্ত। আনন্দবাজারের অত বিশাল বন্দোবস্ত সত্ত্বেও অনেকে সেখানে ঢুকতেই পারেননি ভিড়ের চোটে। স্থানাভাবে জনতা ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত শহরে। তবু কী অদম্য আকর্ষণ। কী বিপুল আনন্দের হাট বসে গিয়েছিল।

সাধারণ নিয়মে অর্থাৎ ঠাকুরের যে পন্থা তাতে মনে হয় বহিরাগতদের আশ্রমিকরা নিজেদের গৃহে স্থান দিলে এবং সেবা-যত্ন-যাজন করলে কাজ অনেক বেশি হয়। কিন্তু সেটা ইদানীং বেশ অসুবিধেজনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। উৎসবের সময়

এমনিতেই দরিদ্র আশ্রমিকদের বাড়িতে তাঁদের যজমান বা পরিচিত সৎসঙ্গীদের প্রবল ভিড় হয়। এটাকে আত্মীয় সম্মিলন বললে ভুল হয় না, সৎসঙ্গীরা পরস্পরের আত্মীয় ছাড়া আর কী? সৎসঙ্গী বলে অসুবিধে হলেও মানিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু বাইরের লোক হলে মানিয়ে নেওয়া কষ্টকর। বিশেষ করে উৎসবাদির সময়।

এ সমস্যার সমাধান বড়ো সহজ নয়। ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই রব ওঠে বটে, ঠাঁই আবার হয়েও কি যায় না? অসুবিধে হবে মনে করেই যদি কেউ আসেন তবে সব কিছুর মধ্যেই তিনি নিজেকে মানিয়ে নিতেও পারেন, শুধু মনোভাবটা যদি উন্মুখ, আগ্রহী হয়।

মূল সৎসঙ্গ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ঠাকুরকে কেন্দ্র করে আরও কয়েকটি সৎসঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন মেদিনীপুরের গিধনীতে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ সেই ১৯৬৭-৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্যোক্তা ছিলেন কতিপয় ঋত্বিক। ঠাকুরের জন্মস্থান হিমায়েতপুরেও রয়েছে তাঁর নামাঙ্কিত সৎসঙ্গ। এগুলি বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা বলে আমার মনে হয় না। বরং ঠাকুরের নানা দিক নিয়ে বিভিন্ন সংগঠন যদি সহযোগী হয়ে ওঠে তাহলে তাতে সমাজের মঙ্গলই হবে।

উৎসব বা মন্দির নির্মান করা এবং দীক্ষা দেওয়া প্রয়োজন যেমন, তেমনি আবার মানুষকে দক্ষ, যোগ্য, তৎপর করে তোলার চেষ্টাও অব্যাহত রাখা দরকার।

ঠাকুরের মতো মহান মানুষের প্রচার ও প্রসার ক্রমশ ব্যাপ্ত ও বিশাল হয়ে দাঁড়াবেই। পথ খুঁজতে, উদ্ধার পেতে, অনুসন্ধান ও প্রশ্ন করতে একদিন লাখো মানুষ আসবেই তাঁর দরবারে। সেই বিশাল জনস্রোতকে সামাল দেওয়ার মতো উপকরণ আহরণ বা ব্যবস্থা করে ওঠা সময়সাপেক্ষ। ঠাকুরের আকর্ষণে মানুষ আসছে লাখো লাখো, দিন দিন তা গণনা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আশ্রমও বেড়ে চলেছে বটে, কিন্তু অনুপাতের হার তো সেরকম হয় না।

ঠাকুরের মূল নেশাই হল মানুষ এবং জীবজগৎ। এই মহাপ্রেমীর পথে এক পাও আমরা অগ্রসর হতে পারব না যদি মানুষ সম্পর্কে আমাদের অস্তিবাচক ও দরদী মনোভাব গড়ে না ওঠে। মনে রাখতে হবে ঠাকুরের আশ্রম মানুষেরই জন্য।

মনে রাখতে হবে ঠাকুরই এ যুগের মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল। মানুষ, দুনিয়ার মানুষ তাঁকে খুঁজে বের করবেই। ঠাকুরও সারাজীবন মানুষই খুঁজেছেন। মানুষের জন্যই তাঁর যা কিছু। সুতরাং সৎসঙ্গকে সর্বদাই বহির্জগতের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হচ্ছে। মানুষের ওপর বিরক্ত হলে চলে না। তাকে অনাদর করলে চলে না।

"তোমার গৃহস্থীতে বুভুক্ষু বা অতিথির শুভাগমন যদি হয়—নিজেকে কৃতার্থ মনে ক'রো, সাধ্যমতন সেবাযত্নে তাঁর ক্লান্তি অপনোদন ক'রো —সাবধানী অনুসন্ধিৎসায়, সজাগ থেকে তৃপ্তি ও তুষ্টির সেবা সন্দীপনায় অভিনন্দিত করে তুলো তাঁকে, এমনকি প্রয়োজনমত নিজের ক্ষুধার অন্ন দিয়েও তাঁকে তৃপ্ত করো—পরিবার তোমার দুর্লভ আশীর্বাদের অধিকারী হবে।" আর্যপ্রাতিমোক্ষ (৪র্থ) ২১০৭। দয়াল ঠাকুর আমাদের কাছে এরকমই চাইতেন।

ঠাকুরের জীবনদর্শনের মূল ধারাটিকে অনুসরণ করলে দেখা যাবে মানুষ সম্পর্কে আমাদের বিরক্তি বা উদাসীনতা কিছুতেই প্রশ্রয়যোগ্য নয়।

সৎসঙ্গের উৎসব এখনও, আজও অনেক সংস্থা বা সংগঠনের কাছে এক বিস্ময়। হাজার হাজার মানুষের সমাগম সত্ত্বেও যে শৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠবের সঙ্গে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তা দৃষ্টান্তস্বরূপ। এত মানুষ একসঙ্গে বসে খায়, থাকে, কিন্তু কোথাও কোনও বড় রকমের অব্যবস্থা দেখা যায় না। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা ঠাকুর নিজেই করেছেন বলে তার ট্র্যাডিশন চলে আসছে। ঠাকুরের শতবর্ষের ওই বিপুল জন সমাগমে যখন দেওঘর শহরেরই সমস্ত ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়ল এবং দেখা দিল অতিসংখ্যক মানুষের ভিড়ে দুর্ঘটনা বা মহামারীর আশঙ্কা তখনও সুভদ্র সৎসঙ্গীদের ব্যক্তিগত শৃঙ্খলাবোধ ও নম্রতা কিছুই ঘটতে দেয়নি। মহামারী অবশ্য সৎসঙ্গের ইতিহাসেই কখনও ঘটেনি। সেই ভয় আমার ছিল না, কিন্তু জনতাব চাপে দুর্ঘটনার ভয় ছিল। ঠাকুরের এই ভক্তবৃন্দ তা ঘটতে দেননি। এই সমবেত মানুষের মধ্যে যেন ঠাকুরকেই দেখতে পেয়ে সেদিন শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে এল। ভাবলুম এই সব ভক্তের পদরেণু মাথায় নিলেও আমার পুণ্য হবে।

ঠাকুরকে যে যার নিজের মতো করেই পায়। যার যেমন কর্ম নামধ্যান-যজন-যাজন এবং যেমন তার বৈশিষ্ট্য। ঠাকুর তো বৈশিষ্ট্যকে পালন ও পূরণ করেন। তাই এক একজনের কাছে তিনি এক এক রকম হয়ে ধরা দেন। কিন্তু এটা অতি নিশ্চিত যে, যে তাঁকে অবলম্বন করে, ভালবাসে, নামধ্যান সদাচার-সুকর্মপরায়ণ থাকে তার কাছে তিনি নিজেকে উন্মোচন করেনই। এর কোনও ব্যাতায় নেই। তাই নিত্য পালনীয় কাজগুলোতে ফাঁক রাখতে নেই। ইষ্টভৃতি করা এবং ঠিকমতো পাঠানো, স্বস্ত্যয়নী রক্ষা করে চলা, সদাচার পালন করা ইত্যাদি যান্ত্রিকভাবে হলেও কাঁটায় কাঁটায় করলে ফল পাওয়া যাবেই। যান্ত্রিকতা থাকলেও নিয়মমতো করতে

করতে একসময়ে ভক্তিভাব এসে পড়েই, বিশেষ করে নামধ্যানের ক্ষেত্রে এটি আমি পরীক্ষা করে দেখেছি।

ঠাকুর একবার বলেছিলেন, খুব নামধ্যান করলে আর কিছু হোক বা না হোক শরীরটা ভাল হয়ে পড়ে। এটা যে কত বড় সত্য কথা তা আমার জীবনে আমি বহুবার পরীক্ষা করে দেখেছি। আরও কথা হল, নামধ্যান করলে ব্যক্তিত্বের আকর্ষণশক্তি বাড়ে। মানুষ চৌম্বক আকর্ষণ বোধ করতে থাকে। যতবার নামধ্যান-পরায়ণ থেকে কোনও ব্রত প্রায়শ্চিত্ত করেছি ততবারই দেখেছি শরীরের উজ্জ্বলতা বেড়েছে, মানুষকে আকর্ষণ করার শক্তি বেড়েছে। ঠাকুরকে নিয়ে আমি নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। তার কারণ, দীক্ষাগ্রহণের সময়েও আমি ছিলাম ঘোর নাস্তিক। যাঁকে গুরু বলে গ্রহণ করেছি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বা আসক্তি ছিল না। ফলে পরীক্ষা করতে তাঁকে ছাড়িনি। কিন্তু বারবার আমার সন্দেহের নিরসন তিনি অবলীলায় করেছেন। নামধ্যান করলে যে কান্তি, উজ্জ্বলতা ও আকর্ষণশক্তি বাড়ে এটা যে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। নামধ্যান করলে আরও কত কী হয়। নামধ্যান-পরায়ণরা যদি কোনও অকাজ বা কুকর্ম করতে উদ্যত হন তাহলে ঠিক তাতে বাধা পড়ে যায়। নামে বুঁদ থাকলে বিপদ-আপদ যে কী অলৌকিক ভাবে কাটে তা শিহরিত বিস্ময়ে বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। আর এই সব অভিজ্ঞতা থেকেই ঠাকুরকে ঠাকুরের আসনে বসাতে আর দ্বিধা থাকেনি।

একটা সময় এল যখন ইষ্টপ্রসঙ্গ ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ ভালই লেগে উঠত না। তখন আমাদের যৌবনের উন্মেষকাল, সে সময়ে কত দিকে মানুষের কত আকর্ষণ জন্মায়। কিন্তু আমার সব আকর্ষণ এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হল, ঠাকুর। আজও এই রহস্যময় আকর্ষণের যুক্তিসিদ্ধ কারণ খুঁজে পাই না। ঠাকুরের সঙ্গে আমার বয়সের তফাত, আত্মীয়তা নেই, তেমন করে বাক্য বিনিময়ও হয়নি, তাঁকে কখনও স্পর্শ করিনি, সর্বদাই তাঁকে দেখেছি অনেক মানুষের ভিড়ের মধ্যে। তবে আকর্ষণটা এল কোথা থেকে? কেন মনে হতে লাগল যে, ইনি পৃথিবীতে আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন! এর চেয়ে বড়ো মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমার কেউ নেই!

ঠাকুর এক আশ্চর্য আবির্ভাব। কীভাবে তিনি মানুষকে টানেন, কীভাবে তিনি লক্ষ মানুষকে পূরণ করেন তা কিছুতেই সহজবোধ্য নয়। অলৌকিক ঘটনা? সেটা নিয়ে আমার তেমন মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু মিরাকলের চেয়েও অনেক বেশি প্রভাবিত করেছিল আমাকে ঠাকুরের ওই সর্বব্যাপী আগ্রাসী ভালবাসা। লক্ষ মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছি, তারই মধ্যে হঠাৎ হয়তো এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য তাঁর চোখ আমার দিকে পড়ল, তাতেই আপাদমস্তক যেন বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলে

যেত। মনে হত, আমার সব পাপ-তাপ জ্বালা-যন্ত্রণা মুছে নিয়ে গেলেন।

অনেকেই এসে আমার কাছে দুঃখ করে বলেন, ঠাকুরের কাজ কিছুই তো করতে পারছি না, কিছুই হচ্ছে না ইত্যাদি। কথাটা মিথ্যেও নয়, ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা প্রায় একতরফা প্রাপ্তির, আমাদের অনন্ত চাহিদা তাঁর শ্রীচরণে নিবেদন করছি আমরা রোজ। বিনিময়ে তাঁকে সিকি আধুলি বা টাকা ইষ্টভৃতি হিসেবে দিচ্ছি। মানুষের জন্য ঠাকুরের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের যা করা উচিত সে কাজে আমরা অগ্রসর হই কমই। আমি নিজেও এ-বাবদে পয়লা নম্বরের অপদার্থ। এক প্রবীণ গুরুভাইয়ের কাছে এবাবদে কিছু দুঃখ করছিলুম একদিন, তিনি আমাকে সস্নেহে বললেন, দাদা, আর কিছু না পারেন চেপে নামধ্যানটাকরুন, নামধ্যান যদি দৃঢ়তার সঙ্গে করতে পারেন তবে ঠাকুরই আপনার করার পথ খুলে দেবেন।

ঠাকুরের জন্য কাজ করার ইচ্ছে এবং আগ্রহ থাকলে তার পথও খুলে যায়। কারণ ঠাকুরের কাজ বলতে যে-কোনও ইষ্টমুখী যাজনসমৃদ্ধ কাজকর্মকেই বোঝায়, যা কোনও না কোনও ভাবে ঠাকুরকে পূরণ করে। তবে ঠাকুরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলতে আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝেছি মানুষকে মেরামত করা, তাকে ধর্মদান করা, তাকে ইষ্টপথ দেখিয়ে দেওয়া এবং সেই পথে চালানো।

কিন্তু একাজ করতে হলে নিজেকেও মেরামত করে নিতে হয় এবং ঠাকুরের দর্শন সম্পর্কে বুঝসমঝ পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন। নইলে ভাল করতে গিয়ে মন্দ করে ফেলা বিচিত্র নয়। ঠাকুরের পথে চলা মানেই সদাসতর্ক হয়ে চলা। নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি, দুর্বলতা, খামতিগুলির প্রতি নজর রেখে ধীরে ধীরের সংশোধিত হওয়া। যার সংশোধিত হওয়ার ইচ্ছে থাকে ঠাকুর তাকে সাহায্য করেনই। যে ভাল হতে চায় এবং ভাল করতে চায় দয়াল ঠাকুরের দয়া তার ওপর অজস্রধারে বর্ষিত হয়, এ আমি নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই জেনেছি। ঠিক ঠিকমতো নামধ্যান করলে অনুভূতির প্রখরতা বাড়ে, দেখার চোখ তীক্ষ্ণ হয়, বিচারবোধ জেগে ওঠে, আলস্য দূরীভূত হয়, কাজে কর্মে ভুলত্রুটি কমে যেতে থাকে। এটা শুধু কথার কথা তো নয়। ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে অনেক এরকম পাওয়া যাবে, যারা হতাশা ও ব্যর্থতার গভীর গহ্বরে তলিয়ে যেতে যেতে শুধুমাত্র ঠাকুরকে অবলম্বন করে ফের উঠে এসেছেন সাফল্য ও প্রত্যাশার উজ্জ্বল আলোয়। আমার নিজের জীবনে যেমন এর প্রজ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আছে, তেমনি আরও অনেকেরই আছে। একটু নিষ্ঠা, একটু আকুলতা থাকলেই হয়।

ঠাকুরকে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁর সাহচর্য পেয়েছেন, তাঁদের ঠাকুর প্রত্যক্ষভাবেই রক্ষা করতেন। তিনি অপ্রকট হওয়ার পর সে সুযোগ নেই বটে,

কিন্তু ঠিক একইভাবে ঠাকুর আজ হুঁশিয়ারি দেন। খারাপ কিছু ঘটবার আগে তার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। আর ঠাকুরের ওপর পরম নির্ভরতায় নিজের ভালমন্দ ছেড়ে দিলে তিনি বিপদ-আপদকে মশা মাছির মতো তাড়িয়ে দেন। এসব কথার কথা হয়ে থাকলে চলবে না। প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই ঠাকুরের সত্যস্বরূপকে জানতে হবে। তাঁর স্বাদ, তাঁর সঙ্গ আমাদের পেতেই হবে। নইলে ঠাকুরকে নিয়ে চলব কী করে?

এই ভীষণ জটিল মানসিকতার যুগে ঠাকুরকে সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক সবচেয়ে বেশি লজিক্যাল বলে সকলেরই মনে হবে। আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে। ঠাকুরের সমসাময়িক অন্যান্য ধর্মগুরুদেরও অনেকে ঠাকুরকে দর্শন করে গেছেন এবং তাঁর জীবনদর্শনের উপযোগিতা উপলব্ধি করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল নকশালপন্থীদের অনেকেই পুলিশের তাড়ায় আশ্রমে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেক কট্টর নাস্তিক ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে দীক্ষা নেন এবং ভক্ত হয়ে পড়েন। একজন প্রাক্তন নকশাল নেতা এখন মস্ত বড় ঠিকাদার। কোটি কোটি টাকার ব্যবসা তাঁর। তিনি আমাকে বলেছিলেন ঠাকুর! ঠাকুরের কোনও বিকল্পই নেই। অসাধারণ!

ঠাকুর সম্পর্কে এরকম একটা শ্রদ্ধার বোধ বহু মানুষের আছে যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে সামান্য সময়ের জন্যও এসেছেন। এঁরা হয়তো নাস্তিক, হয়তো অবিশ্বাসী, গুরুবাদ-বিরোধী, তবু ঠাকুরের অসাধারণত্ব নিয়ে তাঁদের কোনও সন্দেহ নেই। এই বোধ ও মনোভাব আরও বৃদ্ধি পাবে যখন ঠাকুরের গ্রন্থরাজির প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকবে।

যে মেলাঙ্কলিয়ায় আক্রান্ত হয়ে আমি ঠাকুরের কাছে প্রথম যাই সেটা হয়তো আমার একারই বিশেষ অসুখ। ঠিক ওরকম হয়তো অন্য কারও হয় না। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ যুগটাই মনোরোগের যুগ। বিষাদরোগ এ যুগেরই ধর্ম। মানুষ বাইরে নানা উল্টোপাল্টা ঘাত-প্রতিঘাতে, সম্পর্কের জটিলতায়, এবং ভালবাসাহীনতায় নিজের মনের মধ্যেই আশ্রয় খুঁজবে এবং ক্রমশ হতাশার গাঢ় থেকে গাঢ়তর অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে থাকবে। এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া তার সাধ্যাতীত। কেবল মনের কোণে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করলেও তার সংকীর্ণ মন তাকে আশ্রয় দেওয়ার ক্ষমতা ধরে না। ফলে সে নানাবিধ উপায়ে আশ্রয় খুঁজবে। কখনও মদ খাবে, অতিরিক্ত ফূর্তিতে জড়িয়ে পড়তে চাইবে, মঠ-মন্দিরে ছোটাছুটি করবে, জ্যোতিষীর কাছে যাবে, রাজনীতি করবে বা যাবে ডাক্তারের কাছে। তাতে সমাধান হবে না, আরোগ্য ঘটবে না, সাময়িক ধামাচাপা দেওয়া যাবে। মঠ-মন্দির, গুরুদেবদের

বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। তবে আচরণবিধি না মানলে, সক্রিয়ভাবে নিজের ও পরিবেশের শুদ্ধিকরণের দিকে না এগোলে এবং চরিত্র সংগঠিত না হলে কিছুতেই কিছু হওয়ার নয়। মঠ-মন্দির মানুষের চরিত্র গঠনে, তাকে শ্রমশীল কর্মমুখর দক্ষ করে তোলার ব্যাপারে, খুব একটা কিছু করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয় না। আর গুরুরা শিষ্যদের ওপর এমন অনুশাসন চাপাতে চান না, যাতে তাদের কষ্ট হয় বা তারা ভয় পেয়ে যায়। ফলে মঠ-মন্দির, গুরুদেবদের কাছে যাঁরা আশ্রয় নেন তাঁরা শুদ্ধ মুক্ত কর্মপরায়ণ হন কমই। ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য হল যা ভাল ও মঙ্গলপ্রদ তা তিনি জোরের সঙ্গেই চাপান। তিনি জানেন, এ যুগে মানুষের ব্যামো যেমন শক্ত, তার দাওয়াইও তেমনই কড়া হওয়া প্রয়োজন। শিষ্য ভেগে পড়বে বা অসন্তুষ্ট হবে ভেবে তিনি কখনও হাত গুটিয়ে নেন না। তার আরোগ্য, তার আয়ু, তার নিরাপত্তার দায়িত্ব ঠাকুর নিজের কাঁধে যেমন নেন, তেমনি তাকে যোগ্য দক্ষ করে তুলবার জন্য তাকে অনুশাসনও মানতে বাধ্য করেন।

তাহলে কি জবরদস্তি? না, তাও নয়। মানুষ যখন অস্তিত্বের সংকটে তাঁর কাছে এসে আশ্রয় নেয় তখন সে বাঁচবার জন্য, রক্ষা পাওয়ার জন্য আকুলভাবেই করে। চিকিৎসকের নির্দেশ না মানলে যে রোগ সারে না একথা তো সবাই জানেন। ঠাকুর তেমন চিকিৎসক নন, যিনি নিদান দিয়েই খালাস। তিনি তার অনুশাসনবাদের ভিতর দিয়ে সেই নিদান কার্যকর করে তোলেন। আর তাই তাঁর আশ্রয়ে মানুষের আরোগ্য অমোঘ হয়ে ওঠে।

।। সাত ।।

কাছের ঠাকুরের কথা লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে এই গ্রন্থে আমি নিজের কথা একটু যেন বেশিই লিখে ফেলেছি। যা ঘটেছে তা নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরেই ছিল নিশ্চিত। আমার জীবনে ঠাকুরের যে ভূমিকা তা ছাড়া আমার সম্বলই বা কী? আমার দুর্বলতা, ব্যর্থতা, দ্বিধা সংকোচ, লজ্জা, ভয় সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়েই আমি তাঁকে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি বলে এক অসহায় মানুষের আত্মকথা প্রগলভতার সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। ভয় হয় নিজের মাপকাঠিতে মাপতে গিয়ে তাঁকে ছোট করে ফেললাম নাকি?

আগে ভাবতাম "আমার ঠাকুর"। ভাবতে এক ধরনের স্বার্থপর আনন্দ হত।

একদিন ঠাকুরের এক গ্রন্থে পড়লাম, ওরকম ভাবতে ঠাকুর নিষেধ করেছেন। "ঠাকুরের আমি" এই বোধটাই ঠাকুর পছন্দ করতেন। "আমার ঠাকুর" বললে ঠাকুরকে অন্য সকলের কাছ থেকে যেন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা বলে মনে হয়। যেন ঠাকুর শুধু আমার, আর কারও নয়। তাতে ঠাকুরকে নিজের স্বার্থের মাপে ছোটো করে ফেলা হয়। তাতে নিজেরও মাহাত্ম্য বাড়ে না। "ঠাকুরের-আমি" বোধ প্রবল হলে আর তাতে স্বার্থসিদ্ধির ধান্দা থাকে না। তখন ঠাকুর শুধু আমার হন না, আমিই ঠাকুরময় হয়ে যাই। ক্ষুদ্র আমি হয়ে ওঠে বৃহৎ আমি, স্বার্থশূন্য আমি মহান আমি।

ঠাকুর যে বলেছেন "তোমার ভেতর ঠাকুরত্ব না জাগলে কেহ তোমার কেন্দ্রও নয়, ঠাকুরও নয়" এর মতো সত্য আর হয় না, তবে ঠাকুরত্ব জাগানো বড়ো সহজ কাজও তো নয়। অনেকে দেশের কাজ করেন, অনেকে পরোপকার করেন, অনেকে রাজনীতিতে আত্মোৎসর্গ করেন, অনেকে সৎপথে চলার চেষ্টা করেন তবু সব করেও অনেক ফাঁক থেকে যায়। তার কারণটি অবশ্য সবসময়ে বোঝা যায় না। সারা জীবন ভাল করবার চেষ্টা করেও কিছুতেই যেন ভালটা দানা বেঁধে ওঠে না। তার কারণ তাঁদের জীবনে ভালবাসার কোনও কেন্দ্রবিন্দু থাকে না, ইষ্টনেশা থাকে না, ফলে ভাল করার চেষ্টা নানা বিচ্ছিন্নতায় বিপর্যস্ত হয়ে যায়। অনেক সময়ে ভালর বকলমে মন্দই হয়ে পড়ে। সুতরাং যাঁরা ভালই করতে চান, ভালই হতে চান তাঁদের জীবনের কেন্দ্রে একজন ভালবাসার মানুষকে দরকার। যদি তাঁরা তেমন কাউকে পান তবে তাঁদের সব ভাল সগর্জনে সাফল্য নিয়ে ঝেঁপে খরস্রোতে দেশ ভাসিয়ে দেবে।

আমি তো জানি, স্বার্থ দিয়েই বাঁধতে চেয়েছি ঠাকুরকে। সামান্য ইষ্টভৃতি দিয়ে চাঁদা দিয়ে, বক্তৃতা দিয়ে তাঁকে কিনে নিতে চেষ্টা করেছি। তাই সম্পূর্ণ হয়ে উঠল না আমার অন্তঃপুরে তাঁর ছবি। মাঝে মাঝে তাই বড্ড গভীর গ্লানিতে ছেয়ে যায় মন। ভাবি পৃথিবীর ভাল মানুষ যাঁরা, তাঁরা কবে আসবেন ঠাকুরের কাছে? তাঁদের পেলে ঠাকুর কী সাংঘাতিক কাণ্ড বাঁধিয়ে দেবেন!

অবশ্য একথাও ঠিক, কে ভাল কে মন্দ এ বিচার করার আমি কে? ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ বলে চেনবার শক্তিই বা আমাদের কতটুকু?

ঠাকুরের কাছে ভাল আর মন্দ বলে তো কিছু ছিল না। তিনি আমাদের মতো বিচার তো কখনও করতেন না। মন্দই হয় তো তাঁর কাছে বেশি এসেছে। কারণ মন্দরাই তো বাঁচবার জন্য তাঁর পায়ে এসে পড়েছে বেশি। তিনি তাদের বুকে তুলে নিয়েছেন, কাজে নামিয়েছেন, শুধরেও গেছে তারা। মূল্যহীনেরে সোনা করিবার

পরশপাথর হাতে আছে বলেই তিনি কখনও কোনও অকিঞ্চন বা সামান্যকে অবহেলা করেননি, উপেক্ষা করেননি পাগল বা বিকারগ্রস্তকেও। তাঁর কাছে সকলেরই অমলিন আশ্রয়। আর সেটাই আজ অকিঞ্চন, দুঃখী, অবসাদ আর হতাশায় ভারাক্রান্ত মানুষের কাছে পরম ভরসার কথা, পরম আশার কথা। ঠাকুর বারংবার বলতেন, অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়ষ্যামি মা শুচঃ।

অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন, দেখুন মশাই, দীক্ষা অনেকেই অনেকের কাছে নেয়। কিন্তু এই আপনারা, সৎসঙ্গীরা বড্ড বেশি ঠাকুর ঠাকুর করেন।

শুনে বিরক্ত হওয়ার বদলে খুশিই হয়েছি। ঠাকুর ঠাকুর করি নাকি? কই, টের পাই না তো! যদি করেই থাকি তবে সেটা তো মস্ত আনন্দের খবর!

সৎসঙ্গী ঠাকুর ঠাকুর করেন ঠিকই তবে তা এমনিতে তো নয়। কিছু পান ঠাকুরের কাছে তাঁরা, কিছু নেশা তাঁদের হয় নিশ্চয়ই।

ঠাকুরের সৎনাম নিলেই যে সব সমস্যার সমাধান আপনা থেকে অলৌকিক ভাবে ঘটে যাবে তা তো নয়। ঠাকুর নিত্য পালনীয় কৃত্যগুলিকে কাঁটায় কাঁটায় পালন করতে বলেছেন। এটাই হল ভিত। যজন যাজন ইষ্টভৃতিতে যদি খুঁত না থাকে, যদি ইষ্টভৃতি নিয়মিত ঠিকঠাক ত্রিশ দিনে পাঠানো হয়, যদি সদাচার এবং সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করা হয় তাহলে সেই ভিতের ওপর নিজের ব্যক্তিত্ব ও ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলার পথ খুলে যেতে থাকে। মূলেই যদি গন্ডগোল থাকে তাহলে শত ভক্তিও তেমন কার্যকর হবে না। আর সক্রিয় ভক্তি ছাড়া কিছু হয় না, ভাবাবেগের ভক্তির কোনও মূল্য নেই।

অনেক সময়ে আমাদের মনে হয়, ঠাকুরের জন্য অনেক কিছু করে ফেলেছি, অনেক ত্যাগ স্বীকার করলুম, ইত্যাদি। এই ধারণার মধ্যে ভ্রান্তি হল, ঠাকুরের জন্য করা মানেই হচ্ছে মানুষের জন্য পৃথিবীর জন্য করা। আর এই করার ভিতর দিয়ে আমরা গন্ডিবদ্ধ জীবন ছাড়িয়ে বৃহৎ জীবনের সঙ্গে যুক্ত হই। আর সেই সংযোগ ঘটে বলেই আমাদের তুচ্ছ ক্ষুদ্র জীবনও এক ধরনের মাহাত্ম্য লাভ করে। ঠাকুরের জন্য যদি কেউ কিছু সত্যিই করে তাতে তার নিজের লাভও ষোলো আনা। এই হিসেবটা মাথায় রাখতে নেই বটে, কিন্তু এটা যে ঘটে তা নিত্যই প্রত্যক্ষ করছি।

আবার অন্য দিকে দেখি, একসময়ে—যখন ঠাকুরের তেমন পরিচিতি ছিল না, তখন ঋত্বিকেরা কপর্দকহীন অবস্থায় দেশ-দেশান্তরে বেরিয়ে পড়তেন যাজনে। পথকষ্ট, বিপদ-আপদ, বিরোধিতা সব সহ্য করে কোন দূর-দূরান্তে ঠাকুরের সৎনাম প্রচার করেছেন তাঁরা। আর ওই কষ্ট, ওই পরিশ্রম তাঁদের সর্বক্ষণ টই-টম্বুর রেখেছে আনন্দে। ওই কষ্ট না থাকলে ওই আনন্দই বা পাওয়া যাবে কেমন করে?

একবার বয়োজ্যেষ্ঠ এক গুরুভাই যখন ঠাকুরের জন্য তাঁর ত্যাগ স্বীকারের কথা বলে বড়াই করছিলেন তখন আমার মনে হল, ইনি মাত্র বি এ পাশ। সে আমলে ইনি বড়ো জোর একটি কেরানীগিরি জোটাতে পারতেন। দীর্ঘদিন কলম পিষে সামান্য সঞ্চয় দিয়ে ইনি হয়তো একখানা বাড়ি করতেন কষ্টেসৃষ্টে। আর পাঁচটা সংসারের মতোই সাংসারিক নানা ঝঞ্ঝাটে ব্যতিব্যস্ত থাকতেন। আর এভাবেই জীবনটা একদিন শেষ হয়ে যেত। কিন্তু আজ ঠাকুরের ঋত্বিক হিসেবে ইনি যেখানেই যান শত সহস্র মানুষ এঁকে প্রণাম করে, প্রণামী দেয়, এঁর যে কোনও বিপদে আপদে তাঁরা এসে বুক দিয়ে পড়ে এবং সৎসঙ্গী মহলের হাজার হাজার মানুষ এঁকে একডাকে চেনে। কেরানীগিরির চেয়ে ইনি তো বহুগুণ ভাল আছেন, অনেক সফল হয়েছেন, তবে এঁর দুঃখ কিসের? চাকরি করেই বা অন্যরা তাঁর চেয়ে কোন দিক দিয়ে ভাল আছে?

নিয়তকর্মীরা স্বতঃস্বেচ্ছ অনুরাগের সঙ্গে এবং উদ্যম নিয়ে ইষ্টকাজে লাগলে তাঁদের যে কোনও অভাবই থাকে না এবং ঘরে যে লক্ষ্মী উপচে পড়েন তার ঢের দৃষ্টান্ত আছে। সাবধান থাকতে হয় একটা ব্যাপারে, গুরুর কাছ থেকে নিতে নেই। তাঁর কাছ থেকে নিলে মানুষ নিষ্প্রভ, হীনবল হয়ে পড়ে। পরোক্ষে তিনি অজস্র যোগান দেন, প্রত্যক্ষভাবে নেওয়ার তাই প্রয়োজনও হয় না।

আমি নিজে নিয়তকর্মী নই। নিয়তকর্মীদের প্রাথমিক পর্যায়ে যে জীবন-সংগ্রাম করতে হয় তাও আমাকে করতে হয়নি। নিয়তকর্মীদের সবচেয়ে বড় বাধা আসে নিজস্ব পরিবার থেকেও। স্ত্রী পুত্র কন্যারা নিশ্চিত এই স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্য ও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা পছন্দ করেন না। অন্যান্য দিক থেকেও নিয়তকর্মীর নানা চাপ আসতে থাকে। আশ্রমে আমার শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় এক নিয়তকর্মী খুবই উচ্চশিক্ষিত। প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ার এই দাদাটি খুব ভাল চাকরি করতেন। সব ছেড়ে ঠাকুরের কাজে লাগেন। কলকাতায় দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এক জায়গায় আমরা আড্ডা মারতুম। সেখানে এক রবিবারে পরেশদা (ভোরা)-কে নিয়ে গেছি। হঠাৎ এক ভদ্রলোক পরেশদা সৎসঙ্গী জেনে তেড়ে এল। তারপর সাংঘাতিক হম্বিতম্বি, আপনারা ঠক, আপনারা জোচ্চোর, আমার জামাইবাবুর সর্বনাশ করেছেন আপনারা, সংসারটা ভেসে গেছে ..... ইত্যাদি। জানা গেল, তিনি উক্ত নিয়তকর্মীর শ্যালক। পরেশদা তাঁকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেন, তিনি অবশ্য সে সব কথায় কর্ণপাতও করলেন না, নিজের উষ্মা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে গেলেন একতরফা। সুতরাং বুঝতে অসুবিধে নেই ঠাকুরের নিয়তকর্মীদের কেমন সব বাধা টপকাতে হয়। টপকাতে যে সবাই পারেন এমন নয়। কিন্তু যাঁরা শক্ত মনের মানুষ, যাঁরা

আপসরফা করেন না, যাঁদের মধ্যে ঠাকুর সম্পর্কে কোনও দ্বিধা নেই, যাঁরা যে-কোনও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে অকুতোভয় তাঁরা কিন্তু রাজা। ঠাকুরের কাজ করতে করতেই ঐশ্বর্য সফলতা আনন্দ ঝেঁপে চলে আসে তাঁদের জীবনে।

ঠাকুরকে অনুধাবন করতে, তাঁকে বুঝে উঠতে আমাদের অনেক সময় লাগবে। তাও তিনি যদি দয়া করে বুঝিয়ে দেন তবেই। কিন্তু ঠাকুরের পন্থায় দাঁতে দাঁত চেপে লেগে থাকতে পারলে বুঝ-সমঝের পথ খুলে যেতে থাকে।

এখানে সবিনয়ে এবং সন্তর্পণে একটা কথা বলে রাখি, ঠাকুরের নিয়তকর্মীদের অবস্থা আজ কিন্তু অনেক ভাল। এতই ভাল যে, সামান্য চাকুরিজীবির অর্জনের সঙ্গে তার তুলনাই চলে না। ঠাকুরের কাজ যে মানুষের জীবনের অস্তিত্ব ও বৃদ্ধিরই সুতীব্র অনুপ্রেরণা এটা আজকের মানুষের বুঝতে ভুল হয় না। কাজেই ঠাকুরের মানুষকে তাঁরা হাসিমুখে সাগ্রহে ভরণপোষণ করে কৃতার্থ হন। এই বিংশ শতাব্দীতে স্বার্থপরতার বাতাবরণে এ জিনিস যখন চোখে দেখি তখন অবিশ্বাস্য ঠেকে। আনন্দে চোখে জল আসে। মানুষ যে শুধু ঋত্বিক বা যাজককেই দেয় তা তো নয়, ওই দেওয়া তার ঠাকুরকেই দেওয়া। আজ একজন ঋত্বিক শুধু ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে চললেই দারিদ্র্য-অভাব-অনটন এক ঝটকায় কাটিয়ে উঠতে পারেন। তাঁর ঘরে লক্ষ্মী উপচে পড়বে।

মানুষের মধ্যে দয়াল ঠাকুর আছেন এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা যদি মানুষের প্রতি আমাদের আচার-আচরণ-ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করি, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমরা বিপুল মানব সম্পদ আমাদের মুঠোয় পাব। মানুষ ছাড়া তো ঠাকুরেরর দর্শন এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ড পন্ড হবে। সুতরাং মানুষের প্রতি অবহেলা অবজ্ঞা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা ত্যাগ করা আরও প্রয়োজন।

অর্থ সংগ্রহ আমাদের করতেই হবে। ম্যান মানি মেটেরিয়াল ছাড়া ঠাকুরের বিশাল কর্মযজ্ঞের সম্পাদন সম্ভব নয়। কিন্তু ম্যান আগে তারপর মানি ও মেটেরিয়াল। মানুষকে মুখ্য করে নিলে আর দুটো আপনিই আসে। এখনকার দুঃখতাড়িত, মৃত্যু শাসিত, হতমান মানুষ তো তৃষিতের মতো একজন দরদীর জন্যই অপেক্ষা করে। তার রোগে, ভোগে, শোকে, একাকিত্বে কোনও সঙ্গী নেই, মনের নিহিত গভীর দুঃখের কথা সে কাউকে বলতে পারে না, স্ত্রী পুত্র পরিবার থাকা সত্ত্বেও তার সত্তার সাথীয়া কেউ নেই। এই চিত্র আজ ঘরে ঘরে। এই দুর্গত মানুষের কাছে ঋত্বিক বা যাজক আসেন যেন আলোকবর্তিকা হয়ে। দরদ, সহানুভূতি, জীবনীয় কথার সিঞ্চনে জীবন্মৃত মানুষ যেন ফের সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। ফিরে পায় বাঁচবার মামলোত। সে তখন দেওয়ার জন্য আকুল হয়। দিতে পেরে যেন ধন্য হয়। এ

শুধু কল্পনাবিলাস নয়, এ ঘটনা কতবার ঘটতে দেখেছি।

ঠাকুর অনেক সময় অকিঞ্চনের কাছেও চাইতেন, আবারর ধনীর দিকে ভ্রূক্ষেপও করতেন না। তাঁর চাওয়া বা না চাওয়ার মধ্যে সবসময়েই থাকত গভীরতর তাৎপর্য। যার কিছু নেই তার কাছে ঠাকুর হয়তো অসম্ভব কিছু আব্দার করতেন। বিস্ময়ের কথা, সে ঠাকুরকে এনেও দিত তা। তাতে খানিকটা ছিল ঠাকুরের দয়া। আর খানিকটা ছিল তার পারঙ্গমতাকে উসকে দিয়ে তাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা। ঠাকুরের চাওয়ার ভিতরেই থাকত তাঁর দেওয়াও। যে ঠাকুরকে দেয় তাকে ঠাকুর দশহাতে পূরণ করেন। আমরা যদি ওই পূরণ করাটুকু পারতাম তাহলে আমাদের চাওয়ার মুখ থাকত। তবু চাইতে হবেই। কিন্তু তার আগে চাই দরদ, সহানুভূতি, ভালবাসা, সঙ্গ-সাহচর্য ও সেবা। মানুষটাকে হাতে পেলে তার সর্বস্বই পাওয়া যায়। যাজন তো একেই বলে। শুধু দীক্ষা দেওয়ালেই যাজন শেষ হয়ে যায় না, দীক্ষার পরেও একজনকে নিয়মিত যাজনের মধ্যে রাখা ভাল। তাতে তার বিশ্বাস পাকা হয়, আচার-আচরণে আসে নিয়মানুবর্তিতা, ভক্তি ভালবাসাও জেগে উঠতে থাকে। যে যাজন করে তারও উপকারই হয়। নানা কথার ভিতর দিয়ে তার নিজেরও বোধদৃষ্টি খুলে যেতে থাকে, বাড়ে লোকচরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা।

কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, মশাই আপনি তো ঠাকুর সম্পর্কে খুব বড় বড় কথা বলেছেন, আপনি নিজে কি এসব করেন ঠিক মতো?

জবাবে আমাকে নতমস্তকে স্বীকার করে নিতে হবে যে, আলস্য গেঁতোমি এবং অন্যান্য ব্যাপারে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করার ফলে যাকে ইষ্টকাজ বলে তা আমার দ্বারা বিশেষ হয়ে ওঠে না। নিজের সাফাই গাইবার মুখ আমার নেই। কিন্তু বঙ্কিমের সেই যে কথা আছে যে আমি অধম তাই বলিয়া তুমি উত্তম না হইবে কেন? এই সঙ্গে স্বীকার করে নিই, আমি হলাম ভাবের ঘুঘু। ঠাকুর বলেছেন তাঁর জন্য কিছু করতে ইচ্ছে করে না, অথচ খুব ভালোবাসি, একথাও যা, সোনার পিতলে ঘুঘুও তাই। বুঝতে পারি, আমার ভক্তি ভালোবাসা সেই সোনার পিতলে ঘুঘুই হয়ে আছে। কিন্তু যাদের মুখ চেয়ে পৃথিবীর শুভ বিনায়নের স্বপ্ন দেখাই তারা, আমার ওই সব অকিঞ্চন গুরুভাইরা, ঠাকুরের জন্য জান কবুল করে যে কোনও কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আমার মতো অপদার্থরা স্বপ্নই দেখে, কিছু করে উঠতে পারে না। কিন্তু যারা ইষ্টকাজ করে তাদের শ্রীচরণ দর্শনেও আমার পুণ্য হয়, পাপ কাটে।

ঠাকুর ভক্তেরই ভগবান। অবিশ্বাসী অভক্তের নয়। আর সেই ভক্তিও হওয়া চাই সকর্মক, অর্থাৎ কর্মযুক্ত। ঠাকুর ভাবের ভক্তিতে আস্থা রাখতেন না। তার কারণ,

ভাব নিয়ে মানুষ বেশি দূর এগোতে পারে না। তার চরিত্রের গায়েও হাত পড়ে না।

মানুষের ভিতরে অনন্ত ক্ষমতার আকর আছে। আছে সু এবং কু দুইই। ঠাকুর চান আমরা আমাদের এই সব সুপ্ত ক্ষমতা ও গুণাবলীর বিকাশ ঘটাই। অহৈতুকি কৃপা নয়, নিজের যোগ্যতা, ক্ষমতা ও গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়ে সাধারণ মানুষও অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে। আর এই সুপ্ত ক্ষমতা ও গুণাবলীকে জাগিয়ে তুলতেই ঠাকুরের এত চেষ্টা, এত প্রয়াস।

নামধ্যান যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী, সদাচার, প্রায়শ্চিত্ত এসবগুলি নিছক ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। ঠাকুরের দেওয়া এই সব সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক, বাস্তব নিদান মানুষকে যে কী থেকে কী করে তুলতে পারে তার সম্যক ধারণাই আমাদের নেই। ধর্মের ব্যাপারটা ঠাকুরের কাছে কেবল আচার-অনুষ্ঠান তো ছিল না, ধর্ম একটি বাস্তব অস্তিবাচক জীবনধারা। জীবনের সব কিছুই ধর্মের আওতায় পড়ে। তার আহার নিদ্রা, মৈথুন,লোক-ব্যবহার অর্থোপার্জন সর্বক্ষেত্রেই ধর্মের অনুশাসন মানলে তবেই মানুষ শুদ্ধবুদ্ধ যোগ্য হতে পারে। তারকেশ্বরের মাথায় জল ঢেলে এলাম, কালীঘাটে গিয়ে হত্যা দিলাম, তীর্থ পরিক্রমা করে এলাম, সাধুদর্শন করলাম, আর তাতেই জীবনের কৃত কর্মফল কেটে গিয়ে পুণ্যবান হয়ে উঠলাম, ভাগবত বিধান অত সস্তা নয়। ধর্মকে অত কম মূল্যে ক্রয় করা যায় না। সারা দেশ জুড়ে ধর্মের নামে এসব ছেলেমানুষি আর উন্মাদনাই চলছে। তাই বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, লজিক্যাল মানুষেরা এই সব ধর্ম থেকে তফাতে থাকেন। এই সব যুক্তিহীন ধর্মাচরণই অনেক মানুষকে নাস্তিক করে তুলেছে। সবচেয়ে দুঃখের কথা ধর্মগুরুরাও আজকাল শিষ্যের ওপর অনুশাসন চাপাতে দ্বিধা করেন। আমি অন্যান্য গুরুর কাছে দীক্ষিত বহু মানুষকে প্রশ্ন করে জেনেছি, তাঁদের খাদ্যাখাদ্যের বিচার নেই, বর্ণাশ্রম মানার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই, এমনকি জপধ্যানেরও সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। এ এক ভয়ঙ্কর ধর্মীয় অরাজকতা। এ-জিনিস চলতে থাকলে অচিরেই মানুষ ধর্মকর্মের অসারতা উপলব্ধি করে এ-পথ আর মাড়াতে চাইবে না। যে-ধর্মাচরণ প্রত্যক্ষভাবে মানুষকে মঙ্গল অধিষ্ঠিত করে না, যা মানুষের চারিত্রিক শুভ পরিবর্তন ঘটায় না, যা মানুষকে যোগ্য ও দক্ষ করে তোলে না, সেই ধর্ম মৃত্যুর পর যতই স্বর্গের বা মুক্তির প্রলোভন দেখাক না কেন, বুঝতে হবে তার মধ্যে বিশাল শূন্যগর্ভ ফাঁকিবাজি আছে।

এইসব ছদ্ম ধর্ম বা ভুয়া ধর্মের হাত থেকে ঠাকুর আমাদের রক্ষা করেছেন। ধর্মাচরণকে এনেছেন মানুষের দৈনন্দিন আচরণ বিধির মধ্যে। এবং তা কত কার্যকর, কত ফলপ্রসূ ও বাস্তব, মানুষ তা নিজেই করে উপলব্ধি করছে। ধর্ম এক অস্তিবাচক

জীবনচর্চা, তা পরলোকচর্চা নয়। ধর্মের মধ্যেই নিহিত রয়েছে, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য সব কিছু। সারাদিন নিজের স্বার্থ, নিজের ধান্দা নিয়ে ব্যস্ত রইলাম, আর তার মধ্যে এক ফাঁকে একটু ঠাকুর প্রণাম বা মঠ-মন্দিরে পুজো দিয়ে এলাম, এটা ধর্মের নামে আত্মপ্রবঞ্চনা।

ধর্মই ধারণ করে, ধর্মই রক্ষা করে, ধর্মই মলমুক্ত করে মানুষকে। ঠাকুর মানুষকে যে পথ দেখিয়েছেন তার বিকল্প নেই। তাঁর কাছে হিন্দুত্ব, খ্রিস্টানত্ব, ইসলাম—এগুলোর কোনও বিরোধ বা বিভিন্নতা ছিল না। ধর্ম মানেই জীবনধর্ম—যা সকলের পক্ষেই জীবনীয়, যা বাঁচা ও বৃদ্ধির মামলোত। সোজা কথায়, বাঁচতে চাইলেই ঠাকুর, আর ঠাকুরই ধর্ম। কারণ, ধর্মের সারবত্তা, তার স্বরূপ, তার ফলিত বা মূর্ত তাৎপর্য ঠাকুরের ভিতরেই জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে। ঠাকুর তো কেবল কথার মানুষ নন, কাজের মানুষ। ধর্মকে নিজে হাতেকলমে যেমন পালন করেছেন, তেমনি শিষ্যদের হাতেকলমে পালন করিয়েছেন। ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য এবং অনন্যতা এখানেই।

।। আট ।।

ঠাকুরের কাছে আমাদের মতো অহঙ্কারী নাস্তিক যেমন গেছে তেমনি আবার গেছে সুবো অচার্যের মতো তৎকালীন তরুণ তুর্কি। সুবো তখন এম এ ক্লাসের ছাত্র। কবি এবং হাংরি জেনারেশন নামে একটি বাঁধনছেঁড়া সাহিত্যগোষ্ঠীর সদস্য। হাংরিরা নৈতিক বোধ বর্জিত যৌনতায় ক্লিষ্ট কবিতা বা গদ্য লিখত। এদের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার মামলা পর্যন্ত হয়েছিল। সুবো তাদেরই একজন। কিন্তু কী করে যেন সে হঠাৎ একবার দেওঘরে গিয়ে ঠাকুরের সামনে হাজির হয়ে গেল। ঠাকুরকে সে জিজ্ঞেস করেছিল, আমি তো ঘোর পাপী, মদটদ খাই, আনুষঙ্গিক দোষও আছে, আমার ভিতরটা একদম খারাপ, কী করে কী হবে?

ঠাকুর সস্নেহে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার মধ্যে ভাল কিছু একটুখানিও নাই কি?

সুবো বলেছিল, আছে হয়তো। খুব সামান্য। ঠাকুর বললেন, ওই ভালটুকুনই বাড়ায়ে তোলো, খারাপ যা কিছু পালিয়ে যাবে।

ভালর তাড়নায় যে খারাপ পালায় এই ধারণাই আমাদের ছিল না। সুবো দীক্ষা নিয়ে নিল। আজ সে পরম ভক্ত এবং উচ্চপদে আসীন। এখন তার চরিত্রে এক

চৌম্বক আকর্ষণও তৈরি হয়েছে, যা বিশ পঁচিশ বছর আগেকার সুবোর ছিল না।

চোখের সামনে এরকম কত দেখেছি।

আমার দীক্ষান্ত জীবনে ঠাকুরকে পেয়ে যেমন চোখের সামনে দিগন্ত খুলে গেল তেমনি পেলাম হাজার হাজার মানুষকে, আপন করে। দীক্ষা না নিলে এই এত মানুষের সঙ্গে আমার কোনও দেখাসাক্ষাৎ বা যোগাযোগ হতই না। এটাও এক অসাধারণ লাভ। এই গুরুভাইদের মধ্যে চাষাভুসো থেকে উচ্চকোটির চিন্তাশীল, দার্শনিক, পদাধিকারীরাও আছেন। এঁদের কাছ থেকে যে সাহচর্য,সেবা সাহায্য আমি পাই তার তুলনা কোথায়? আমার তথাকথিত বন্ধু অনেক আছে, কিন্তু এমন নিঃস্বার্থ বুকভরা ভালবাসা নিয়ে বিপদে আপদে সংকটে কে এগিয়ে আসে এঁদের মতো! সরল হাসিভরা গুরুভাইদের মুখ দেখলে আমি যত খুশি হই আর কাউকে দেখলে ততটা নয়। পার্থিব জীবনে এঁরাই আমার পরম আত্মীয়। বিবাহ-পূর্ব জীবনে আমার মেস বাড়ি ছিল গুরুভাইদের আনাগোনায় মুখর।

ঠাকুর যা বিধান দিয়েছেন তা স্পষ্টভাবেই দিয়েছেন, কোথাও কোনও অস্পষ্টতা নেই। তাই ঠাকুরের বাণী বা বিধির বিকল্প ব্যাখ্যা করা শক্ত। তবু কিন্তু আমরা সব সময়ে তাঁর উপদেশ বা বিধি মনে রাখতে পারি না। নিজেদের মতো করে চলি। হয়তো ত্রুটিটা আপাতদৃষ্টিতে সামান্যই, তবে ফুটো ছোটো হলেও নৌকায় জলতো ঢুকবেই।

নিষ্ঠা জিনিসটার যে কত প্রয়োজন তা আজ চব্বিশ বছর ঠাকুরের সঙ্গে চলবার চেষ্টা করার পর একটু একটু বঝতে পারি। এবং এটাও বুঝতে পারি, অনেক পুরোনো, ঠাকুর-সঙ্গ করা মানুষেরও নিষ্ঠায় ফাঁক থেকে যেতে পারে। হয়তো আলস্য, হয়তো মনগড়া ধারণা বা অপব্যাখ্যা, হয়তো নিছক উদাসীনতার বশেই সামান্য সামান্য ব্যাপারে তাঁদের ফাঁক থেকে যায়। শেষে ওই ফাঁক আর সারা জীবনেও ভরাট করে তুলতে পারেন না।

ঠাকুরের পথে চলতে গেলে দরকার হয় সদা সতর্কতা। চার চোখো নজর না থাকলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভুলভ্রান্তি ঘটতেই থাকে। আর এই সব ভুলভ্রান্তি আমাদের আত্মসমালোচনা বা আত্মসমীক্ষার অভাবে আর সংশোধিত হয় না। তাই দীক্ষার পরও অনবরত যাজনমুখর যেমন থাকতে হয় তেমনি যাজিতও হওয়া দরকার। সেদিন এক শ্রদ্ধেয় ইষ্টভ্রাতা বলছিলেন, ঠাকুরের আদেশে নিয়তকর্মী হওয়ার পর যখন তিনি প্রত্যক্ষভাবে ঠাকুরের সংস্পর্শে এসেছিলেন তখনও ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, প্রফুল্লদার সঙ্গে থাকতে এবং তাঁর আদেশমতো চলতে। সেই ইষ্টভ্রাতা এই ঘটনাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, আমরা সবসময়ে ঠাকুরের মতো

ঐশী ব্যক্তিত্বের ভাব বা রকম ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারি না। তাই যিনি ঠাকুরকে খানিকটা বুঝে উঠেছেন বা জেনেছেন তাঁর সঙ্গ করা দরকার। আমি প্রফুল্লদার সঙ্গ করার পর অনেক ধাঁধা ও অস্পষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি।

আমার নিজেরও তাই মনে হয়। একসময়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ইষ্টভ্রাতাদের সঙ্গ অনেক পেয়েছি। লাভবানও বড়ো কম হইনি। আজকাল তাঁদের সঙ্গ বিশেষ পাই না বলে অনেক সময়ে অনেক ব্যাপারে দিশেহারা পথহারা বোধ করি। ছোটোখাটো অনেক ব্যাপারে আমাদের নানা শিথিলতা থাকে যা আমাদের নিজেদের চোখে ধরা পড়ে না! কিন্তু ঝুনো ভক্তরা ঠিক তা ধরতে পারেন এবং সংশোধন করে দিতে পারেন। আর এই জন্যই ভক্তের সঙ্গ করা শুধু ভালই নয় প্রয়োজনও বটে।

ভোরবেলা উঠে নামধ্যানের কথাই ধরা যাক। রাত জাগি বলে আমি ভোরবেলা উঠতেই পারি না। বেশির ভাগ দিনেই উঠি সূর্যোদয়ের পরে, ভোরবেলা কোনও দিন ঘুম ভাঙলেও বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করে না। শরীর খারাপ লাগে। আবার বিপদে বা সংকটে পড়লে দেখেছি দিব্যি রাত্র থাকতে তড়াক করে উঠে নামধ্যানে বসে যেতে পারি, কোনও অসুবিধেই হয় না। সোজা কথায় তৈরি হলে, ইচ্ছে জাগ্রত থাকলে শরীর থাকলে শরীর মনেরই দাসানুদাস হয়ে পড়ে। আমাদের মনটা যে কবে ঠাকুর-সই হবে!

দয়াল ঠাকুর আমাদের কুসংস্কার, বদ অভ্যাস, মজ্জাগত আলস্য স্বভাবদোষ দূর করার জন্য কতরকম ভাবে আমাদের শোধনের পথ বলে দিয়েছেন। একটু জড়তা, একটু আলস্য, আয়েস ইত্যাদি আমাদের মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ঠাকুর নিজে অনন্যসাধারণ ছিলেন। কিন্তু তিনি চাইতেন আমরাও তাঁর মতো অন্যান্যসাধারণ হয়ে উঠি। তিনি এত স্বাভাবিক ছিলেন, এত স্থিতধী যে তাঁকে Abnormally normal বলা হয়। এত স্বাভাবিক যে সেটাই অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। কারণ কোনও মানুষই সব পরিস্থিতিতে অচলাবস্থায় থাকে না, ঠাকুর সব পরিস্থিতিতেই স্বাভাবিক। আমাদের কাছেও ঠাকুর ওরকমটাই চান।

অনেক সময় দেখি, একটা উদ্দেশ্য বা চাহিদা নিয়ে নামধ্যান করে তেমন লাভ হয় না, অর্থাৎ সেই উদ্দেশ্য বা চাহিদা ঠাকুর পূরণ করেন না। কেন এরকম হয় তা অনেককে জিজ্ঞেস করেও সদুত্তর পাইনি। এক একটা সময় আসে যখন মানসিক এ বাস্তব সংকটে ভীষণ অস্থির হয়ে পড়ি। তখন এমন কাউকে খুঁজে পাই না যে সমস্যার সহজ সমাধানের পথটি দেখিয়ে দেবেন। আসলে ঠাকুরের বুঝওয়ালা মানুষ আজকাল বোধ হয় হ্রাস পেয়েছে। আমার নিজের কাছে ঠাকুর ছাড়া অন্য কোনও

পথই খোলা নেই। কিন্তু ঠাকুরের পথে অগ্রসর হতে গিয়ে যেসব ভুলত্রুটি আমার অজান্তে বা অজ্ঞানতাবশে ঘটে যাচ্ছে সেগুলি দেখিয়ে দেবে কে? ঠাকুর নিজে অবশ্য দয়া করে দেখিয়ে দেন, কিন্তু তার আগে ঠেসে বকেয়া নামধ্যান করিয়ে নেন। অনেক জ্বালাযন্ত্রণাও সইতে হয়। আমরা, পুরোনো সৎসঙ্গীরাই যখন এরকম বে-দিশা হয়ে যাই নতুন সৎসঙ্গীদের তো আরও গন্ডগোল হওয়ার কথা। সুতরাং এখনই কিছু রাখাল মানুষ বড়ই দরকার, যাঁরা যে কোনও সমস্যার কথা অনুধাবন করে ইষ্টানুকূল সমাধানের ইঙ্গিত দিতে পারেন।

ঠাকুরের মতাদর্শ, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর কথিত উপদেশ, নানা জটিল বিষয়ে তাঁর ব্যাখ্যা এই সব নিয়ে ব্যাপক গবেষণাও হওয়া দরকার। বিশেষ করে তাঁর ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা শুধু পঠন-পাঠনে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। কতগুলি বিষয়ে হাতে-কলমেও করার দরকার হবে। বিবাহ বিষয়ে ঠাকুর যা বলেছেন সেটা নিয়েও ব্যাপক সামাজিক সমীক্ষা প্রয়োজন। সবর্ণ, অনুলোম এবং প্রতিলোম বিয়ের ফলে কী কী সুফল বা কুফল ঘটছে তার একটা অনুসন্ধান হওয়া দরকার। প্রয়োজন বাস্তব অনুধাবনেরও আমরা শুধু বক্তৃতা বা মুখের কথায় এগুলি প্রচার করি, কিন্তু দৃষ্টান্ত দিতে পারি না। দৃষ্টান্ত এবং প্রমাণ না দাখিল করলে বিষয়টা ধোঁয়াটে এবং কথার কথা হয়েই থেকে যায়। ঠাকুর-চর্চা শুরু হলেই সমাজে তার অবশ্যম্ভাবী শুভ প্রতিক্রিয়া ঘটতে শুরু করবে। ঠাকুর নিজেও চান তাঁর কথাগুলি যেন আমরা মিলিয়ে নিই। সেগুলি যেন আমাদের অলস কল্পনাবিলাস হয়ে না থাকে। ঠাকুরের কাজেরও কিন্তু অন্ত নেই। একবার শুরু হয়ে গেলে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলতে থাকবে।

একসময়ে কিছু ভুল বোঝাবুঝি এবং মতান্তরের ফলে কয়েকজন ঋত্বিক আলাদা সংগঠন করেন। আমিও সেই সংগঠনে জড়িয়ে পড়ি। ঠাকুর তখনও দেহে আছেন, তাঁর অনুমতি নিয়েই এই আলাদা সংগঠন তৈরি হয়। বোধ হয় সেটা উনিশশো সাতষট্টি বা আটষট্টি সাল। গিধনিতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। কিন্তু সেই ইতিহাস অন্য সময়ে লেখা যাবে। প্রসঙ্গটা এল এই কারণে যে ওই সংগঠনে জড়িয়ে পড়ার ফলে ঠাকুরের কাছে আমাদের যাতায়াত একরকম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শেষ বছরটায় আমি তাঁকে দেখতে যাইনি। ফলে মানসিক যন্ত্রণা তুঙ্গে উঠল। মনটা পাগল-পাগল করে ঠাকুরের জন্য। বাঁধনছেঁড়া সেই টান আমাকে আর কল্যাণকে একদিন টেনে নিয়ে হাজির করল তাঁর কাছে।

সেই সব কথা লিখতে বসে আজও রোমাঞ্চ হচ্ছে। সেবার নানাভাবে ঠাকুরের আদর ঝরে পড়তে লাগল আমাদের ওপর। ঠাকুর যেন সহস্র হাতে আদর করতে

লাগলেন আমাদের। তাঁর চোখ থেকে যেন মমতার নির্ঝর এসে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। কয়েকদিন আগে রেডিওতে একটি গল্প পড়েছিলাম। গল্পটি ঠাকুরকে নিয়ে, তাঁরই জীবনের কয়েকটি ঘটনাকে অবলম্বন করে। ইষ্টভ্রাতাদের গল্পটি স্বভাবতই ভাল লেগেছিল। বিশুদা ঠাকুরকে গল্পটির কথা বললেন। ঠাকুর সে-কথায় আমল না দিয়ে আমাদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

লোকে হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সেইবারই যে ঠাকুরকে শেষ দেখা তা অস্পষ্টভাবে বারবার আমি টের পাচ্ছিলাম। অথচ সেবার তাঁর শরীর দিয়ে যেন সবসময়ে দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মুখখানা সবসময়ে তাঁর সেই আলোকসামান্য হাসিতে উজ্জ্বল, ভারী স্ফূর্তিযুক্ত, অনেক কথাও কইছেন। এত ভাল তাঁকে বহুকাল দেখিনি। রোজ সকালে মানিকপুরের মাঠে বেড়াতে যান। সেখানে তাসুর মধ্যে দিগন্তের দিকে চেয়ে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে যান। আমরা তাঁর সঙ্গে দুবার মানিকপুরের মাঠে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

মানিকপুরের মাঠে, যেখানে ঠাকুর তাসুর নিচে বসতেন। সেখানে এখন মন্দির করা হয়েছে।

ওই ধূ-ধূ প্রান্তরের মাঝখানে টিলার ওপর চৌকি পেতে ঠাকুর বসতেন। ভোরের নরম আলো এসে তাঁকে স্পর্শ করত, আর কী ভালই যে লাগত তখন তাঁকে! শরীরের ভিতর থেকে, সত্তার গভীর থেকে যেন এক জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে। আমি তো মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে থেকে শুধু তাঁর ওই অপরূপ রূপ দেখেছি দুদিন। শিশুর মতো এটা কী ওটা কী জিজ্ঞেস করছেন। অভ্যন্তরীণ এক আনন্দে মাঝে মাঝে তাঁর মুখে সেই অপার্থিব হাসি ফুটে উঠছে। হাসির দোলায় দুলছে সমস্ত শরীর। এসব যেন স্পষ্ট দেখতে পাই।

রবিবারও সকালে বেড়াতে গেলেন মানিকপুরে। সঙ্গে আমরা। কে জানতে সেইবারই শেষবার তাঁর ভ্রমণ। ফিরে এসে যখন পার্লারে বসেছেন তখন ফাঁক বুঝে শৈলেনদা (ভট্টাচার্য) আমাকে আর কল্যাণকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। সেই সকালে যে করুনাঘন গভীর মমতার চোখে ঠাকুর আমাদের লেহন করে নিলেন তেমনটি যেন আগে আর কখনও দেখিনি! কী আকুলতা কী ভালবাসা সেই চোখে! মনে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে দুটি পা জড়িয়ে ধরি, হাউ হাউ করে কাঁদি।

ঠাকুর দুচারটি কথা জিজ্ঞেস করলেন। প্রসন্নতায়, পুর্ণতায় তিনি যেন সেই সকালে

উপচে পড়ছিলেন। আর তাঁর অত রূপ অত লাবণ্য অত আনন্দ দেখে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, তিনি এবার বোধ হয় আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। দেওঘর অন্ধকার হয়ে যাবে, আঁধার হবে আমার দুনিয়া।

পার্লার ছেড়ে বেরিয়ে সে চারদিকে দিনের আলোর মধ্যেও যে কেন আমি চাপ চাপ অন্ধকার জমাট বাঁধতে স্পষ্ট চাক্ষুষ দেখলাম তার ব্যাখ্যা আমিও দিতে পারব না। লক্ষণগুলি ভাল ঠেকছে না, অথচ সুস্পষ্টভাবে এই সব লক্ষণের অর্থ বুঝব তত বোধবুদ্ধিও নেই। সারাটা দিন একটা বিষণ্ণতার বাঁশি বাজতে লাগল মনে। ঠাকুর কি চলে যাবেন? আশির ওপর বয়স হয়েছে, শরীর ভেঙে গেছে অনেক, তনুত্যাগের লগ্ন তো বেশি দূরে নয় প্রাকৃতিক কারণেই। তবু ওই মহাপ্রেমী, ওই আমার আত্মার আত্মীয়, আমার ব্যথা-বেদনা একাকিত্বে সাথের সাথীয়া যদি চলে যান এই পৃথিবীর পরবাসে আমি কী করে থাকব?

এত অসহায় লাগছিল, এত বিধুর যে, সারাটা দিন যেন বিষাদ-সিন্ধুতে মগ্ন হয়ে রইলাম।

বারবার একটু চোখের দেখা দেখতে পার্লারের আশেপাশে ঘুরঘুর করে আসছি। পার্লার বন্ধ। দেখা হচ্ছে না। দেখা হল বিদায়ের আগের মুহূর্তে, রাতে। রাতের গাড়িতে ফিরব অনুমতি আগেই নেওয়া আছে। শুধু একবার চোখের দেখা দেখে যাবো তাঁকে।

দেখা হল। পার্লারের দরজা দিয়ে যখন গিয়ে ঢুকলাম তখন তাঁর রাতের ভোগ হয়ে গেছে। এবার হয়তো শোবেন। দূর থেকেই প্রণাম করলাম। তিনি একবার বিস্ফারিত চোখে তাকালেন। চোখে চোখ পড়ল। কেঁপে উঠলাম। শেষবারের মতো বিদায় নিচ্ছি তাঁর সান্নিধ্য থেকে— সেটা যেন খুব ক্ষীণ অস্পষ্টভাবে আভাস দিচ্ছে। কিন্তু পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারছি না।

প্রণাম করে বিদায় নিলাম।

ঠাকুরের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে যতবার দেওঘর থেকে ফিরেছি কোনওবারই ট্রেনে কোনও কষ্ট পাইনি। জায়গাও পেয়েছি বরাবর। কিন্তু এইবার রাতের ট্রেনে জায়গা পেলাম না। কল্যাণ একটা বাক্স জোগাড় করল, আর আমি স্রেফ মেঝের ওপর চাদর পেতে শুয়ে পড়লাম।

সকালে কলকাতার মেসবাড়িতে পৌঁছে ঠাকুরের জন্য এত মন-কেমন করতে লাগল যে কারও সঙ্গে ভাল করে কথাই বলতে পারছি না। অথচ অন্যান্যবার ঠাকুরবাড়ি থেকে ফিরে ঠাকুরের কথা আর শেষই হতে চায় না। সবাই শুনবার

জন্য উন্মুখ থাকে। এবারও সবাই ছেঁকে ধরেছে, কিন্তু আমি যেন কিছুতেই উৎসাহ পাচ্ছি না।

দুপুরবেলা স্নান করে যখন ঠাকুরকে প্রণাম করতে গেছি, তখনই ঘটল এক অত্যাশ্চর্য আলৌকিক ঘটনা। ঘটনাটির কথা খোলাখুলি বলা যাবে না। বলা উচিতও নয়। কিন্তু ঠাকুর আমাকে সুস্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দিলেন যেন, তিনি আর দেহে নেই। কিন্তু মন কি তা মানে?

দুপুরে খেয়ে উঠে শুয়েছি, চন্দন এসে কেবল ঠাকুরের কথা বলবার জন্য চাপাচাপি করছে, ঠিক এসময়ে মুকুল এসে খবর দিল, এ কী! আপনারা এখনও বসে আছেন! ঠাকুর যে নেই!

যেন নীল আকাশ থেকে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত। বিহ্বল সম্মোহিতের মতো উঠে বসলুম। আপনা থেকেই শরীর ধ্যানের আসনে স্থিত হল। আপনা থেকেই নামজপ শুরু হয়ে গেল। আর ঠাকুর শেষ কটি দিনে তাঁর চলে যাওয়ার যেসব আভাস ইঙ্গিত দিয়েছেন সেগুলো হঠাৎ প্রাঞ্জলভাবে আমার মাথায় উদ্ভাসিত হল। অঝোরে কাঁদতে লাগলাম।

না, আমি দেওঘর যাইনি। তাঁর প্রাণবন্ত মুখশ্রীর শেষস্মৃতির রেশটুকুই আমার থাক, তাঁর মৃতদেহ দেখতে যাবো কেন? দুর্বল চিত্ত আমি তাই তাঁব শেষকৃত্যে উপস্থিত হইনি। শুধু এক অন্তর্গত অস্থিরতার নিদ্রাহীন রাত কাটিয়েছি। দিনের বেলা উদ্‌ভ্রান্তের মতো পথে পথে ঘুরেছি। ঠাকুর নেই। ঠাকুরহীন এই পৃথীবীতে কী করে থাকবো? কী করে বেঁচে থাকব তাঁকে ছাড়া?

ঠাকুর চলে যাওয়ার পর তাঁর স্পর্শ, তাঁর দয়া পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে অনেকেরই সংশয় দেখা দিয়েছিল। আমারও ঠাকুরকে প্রত্যক্ষভাবে তো আর সমস্যা সংকটের কথা জানানো যাবে না। এখন তবে কী হবে?

আমার এই প্রশ্নের জবাব অবশ্য পেতে দেরি হয়নি। একটি ঘটনার ভিতর দিয়ে স্পষ্টই বোঝা গেল, তিনি যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। তিনি পূর্ণসত্তা, দেহে থেকে এবং বিদেহী অবস্থাতেও কখনও তিনি অনুপস্থিত নন। ঠাকুর পুণ্য পুঁথিতে এবং অন্যত্র বারংবার আভাস দিয়েচেন, চার অক্ষরী নামের সঙ্গে তিনি অঙ্গাঙ্গি ভাবে মিশে থাকেন। নামই তিনি।

নামধ্যানের চর্চায় একটা ভাটা ইদানীং লক্ষ্য করা যায়। এমনকি উৎসবাদিতে, সভায় বক্তারা নামধ্যান প্রসঙ্গে তেমন গুরুত্ব দেন না। ঠাকুর তাঁর উপদেশাবলীতে কিন্তু বারবার নামধ্যানের কথা টেনে এনেছেন। গুরুর দেওয়া জিনিস, একবার দুবার করলে হয় না, চব্বিশ ঘণ্টাই করতে হয়। বলেছেন, হরদম নাম চাই। বলেছেন,

পাপ করছিস, তার মধ্যেও নামধ্যান কর। বলেছেন, আটেকাঠে দড় তো ঘোড়ার উপর চড়। কেন বারবার নামধ্যানের কথা বলছেন! কেন বলছেন, যে আজ্ঞাচক্রে গুরুকে জাগিয়ে নিতে পারে তার কোনও চিন্তা নেই? বারবার বলেছেন নামধ্যানে সব হয়।

ওই চার অক্ষরের স্পন্দনের মধ্যে তিনি যে আছেন তো আমাদের যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝা যাবে না বটে, কিন্তু বিশ্বাস আর চর্চার ভিতর দিয়ে বুঝতে কোন কষ্টই হয় না।

নামধ্যানের প্রতি আগ্রহ মানুষের এমনিতে হয় না, কিন্তু সমস্যায় পড়লে হয়। আমি নিজে যে খুব নামধ্যান-পরায়ণ তা মোটেই নয়। দিনের পর দিন চলে যায়, নামধ্যান, নামমাত্র নিয়মরক্ষার মতো করে দায় মেটাই। জানি এর ফল ভুগতে হবে, তবু আলস্য জড়তা শয়তানের থানা হয়ে গেড়ে বসে থাকে মাথায়। ঠাকুর-ঠাকুর মুখে যতই করি না কেন, নামধ্যানের ভিতর দিয়ে ঠাকুর-পিপাসা প্রকাশ না পেলে তাঁর সঙ্গে আমাদের সংযোগই ঘটে না। নামধ্যানই তাঁর সঙ্গে আমাদের একমাত্র যোগাযোগের রাস্তা। ঠাকুর যে কত জীয়ন্ত, কত নিকট তা টের পাই যখন তিনি মাঝে মাঝে আমাকে নানারকম সমস্যায়, জটিলতায়, বিপদে ফেলে দেন। তখন আর আলস্য-জড়তা থাকে না, সব ঝেড়ে ফেলে পাগলের মতো হন্যে হয়ে নাম করি। অস্তিত্বের সঙ্কট, প্রাণের মায়া আর প্রিয়জনের চিন্তায় তখন শতকরা একশ ভাগ ভক্তিপ্রীতি না হলেও জপ আর ধ্যান কিছুটা হয়। আর ওইভাবেই ঠাকুর বকেয়া নামধ্যানের ফাঁক বোধ হয় পূরণ করে দেন।

আমার নিজের নানা ঘাটতি আছে, সেসব লেখার উদ্দেশ্য হল, যাতে এসব ঘাটতির শিকার হয়ে অন্য গুরুভাইরা কষ্ট না পান। দয়াল ঠাকুর এমনই সব নিয়ম বেঁধে দিয়ে গেছেন যা চতুর্দিক থেকে সর্বতোভাবে আমাদের রক্ষাকবচের মতো ঘিরে থাকে। রোগ শোক মৃত্যু-সব কিছুকেই ঠেকিয়ে রাখতে এই সব আচরণবিধি। শুধু তাই নয়, ঠেলে নিয়ে যেতে প্রবল উন্নতির পথে, সব নিদানই তাঁর বাস্তবভাবে, সহজভাবে দেওয়া আছে। ফাঁকটুকু হচ্ছে আমাদের করার মধ্যে। আমি নিজে ফাঁকিবাজ বলে অনেক সময়েই নানা ঝঞ্ঝাটে পড়ে যাই। লক্ষ্য করেছি, ঠাকুর তাঁর ব্যাপারে ফাঁকিবাজি বা গাফিলতি খুব বেশি দূর সহ্য করেন না, একসময়ে ঠিকই আবার নানা বিপাকে ফেলে নামধ্যানে তৎপর করে তোলেন।

॥ নয় ॥

একাশি বছর বয়সে নরলীলা সংবরণ করার আগে পর্যন্ত ছেদচিহ্নহীন অক্লান্তকর্মা মানুষটিকে কখনোই আমাদের পর্যায়ের প্রাকৃত মানুষ বলে মনে হয়নি কারও। ঠাকুরের এই এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য, কখনোই কোনো অসতর্ক মুহূর্তেও তাঁকে নিতান্ত সাধারণ বলে প্রতিভাত হয় না। ঠাকুরের মধ্যে এই যে সহজাত অসাধারণত্ব এটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। কেন ঠাকুর অন্য সকলের চেয়ে আলাদা? অথচ কী সহজ, সরল, কী দীনতায় মাখা তাঁর ব্যবহার! কী সহজ সুরেই না কথা বলেন! অনেকটাই গেঁয়ো তাঁর চালচলন আর কথাবার্তা। অথচ আদ্যন্ত কী সাঙ্ঘাতিক রকমের আধুনিক। ঠাকুরের মধ্যে বৈপরীত্য ছিল না, কিন্তু সংমিশ্রণ ছিল, সমন্বয় ছিল। সনাতন প্রথা প্রকরণকে ভেঙে না ফেলে তিনি সেগুলিকে সংস্কার করে দিয়েছেন। আবার তাঁর প্রবল উৎসাহ ও কৌতূহল আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের নানা গবেষণার প্রতি। এই কৌতূহল নিছক তাত্ত্বিক ছিল না।

এই সব সমস্যা এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গের মধ্যে যেমন আধুনিক মানুষের বিচিত্র জটিল অন্তর্জগতের উন্মোচন আছে, তেমনি আছে আকাশতত্ত্ব থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের দুর্বোধ্য তথ্য, চিকিৎসা-বিজ্ঞান থেকে মনোবিকলন পর্যন্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের কথাও। আমরা তো সর্ববিদ্যা-বিশারদ নই, তাই অতটা ধরতে পারি না। ঠাকুরের প্রজ্ঞার পরিধি অনুমান করার সাধ্য কারই বা আছে? কিন্তু তাঁর মুখ থেকে অকারণেই নিঃসৃত হয়নি তাঁর প্রজ্ঞার পরিচয়। তিনি তো জ্ঞানের অহঙ্কার প্রদর্শন করতে আসেননি। মানুষেরই নানা প্রশ্ন বিচিত্র সমস্যা, অসংখ্য সুখ-দুঃখ ত্রাস তাঁর ভিতর থেকে টেনে এনেছে ঐশী বাণীনিচয়। যা-কিছু তিনি প্রকাশ করেছেন তার সবই প্রয়োজন ভিত্তিক। অকারণ কোনোওটাই নয়। দয়াল ঠাকুরের সমুদয় বাণী, তাঁর গোটা জীবনদর্শনের মূলে ছিল তাঁর একটাই আকুতি—মানুষের মঙ্গল। মানুষের মঙ্গলকে ভিত করে গড়ে ওঠা তাঁর ধর্ম এবং অনুশাসন—তা কিন্তু, মুসলমান খ্রীষ্টান সকলের ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য। এ শুধু তত্ত্বকথা হয়ে থাকলে ঠাকুর আজকে সকলের প্রাণের ঠাকুর হয়ে উঠতেন না। তত্ত্বকথা আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু ঠাকুরের পৃথকত্ব বা বৈশিষ্ট্য আরও জীবনমুখী এক বাস্তববাদী ভাগবত সত্তার তাই তিনি যা বলেছেন তা হাতে কলমে অক্ষরে অক্ষরে করে দেখিয়েছেন। তাঁর কাছে যে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান নিজস্ব বৈশিষ্ট্য-সমেত পৃথক হয়েও মূলত একই পরম

পিতার সন্তান হয়ে সমদৃষ্টির দুলর্ভ আলোকে আলোকিত হয়েছে তা তাঁর কাছের যে কোনও মানুষই উচ্চকণ্ঠে বলবে।

ঠাকুরের সম্পদ ছিল মানুষ। যেমন ছিল তাঁর মানুষের পিপাসা, তেমনি নিরন্তর ছিল মানুষ ও জীবজগতের জন্য তাঁর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা। এই ঘোর কলিকালে ঠিক এরকম সর্বগ্রাসী মঙ্গলচিন্তা আর কারও মধ্যে এতটা প্রকট হয়ে দেখা যায়নি ওর একঝোঁকা ভালবাসা। ঠাকুরের এই ভালবাসাকেই আমার অলৌকিক বলে মনে হয়। কী করে সবাইকে নির্বিশেষে অত ভালবাসা সম্ভব তা ভেবেই পাই না। ঠাকুরের যা কিছু প্রজ্ঞা বা জ্ঞান তার সবটুকুকেই তিনি উজাড় করে দিতে চেয়েছেন মানুষ ও জীবজগতের কল্যাণে। তাই তাঁর জীবনদর্শনের মধ্যে বিজ্ঞান, রাজনীতি, স্বাস্থ্য ও সদাচার সবকিছুই ওতপ্রোত হয়ে আছে। তার জীবনদর্শনের সবটুকুই তাই ফলিত ও বাস্তবমুখী। ঠাকুর বলেন, "সব ভাবেরই রূপ আছে।" এই রূপটিকে একেবারে চোখের সামনে না তুলে ধরা পর্যন্ত তাঁর সোয়াস্তি নেই। এমনকি ধ্যানে মানুষের যেসব অনুভূতি হয়, সেগুলিকেও ঠাকুর বাস্তবায়িত করার কথা বলেন। বিজ্ঞানকে সহায়ক করে নিলে এই সব অনুভূতির রেকর্ড করা যে সম্ভব তারও ইঙ্গিত ঠাকুরের কথায় পাই।

ঠাকুর নিজেই এক উৎসুক বিজ্ঞানী। তাঁর সৎসঙ্গ আন্দোলনের একেবারে প্রথম পর্যায়েই দেখতে পাই তিনি বিজ্ঞানকে সাথীয়া করে নিয়েছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ ও প্রেরণায় অখ্যাত গ্রাম বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ববিজ্ঞান। বিজ্ঞানের অভিসার কোন দিকে হওয়া উচিত? অবশ্যই বিজ্ঞানকে হতে হবে মানুষের সর্ববিধ কল্যাণের আয়ুধ। তার উদ্দেশ্য হবে নিরাময়, স্বস্তি, উপযোগ ও প্রয়োজনের অনুপূরক। এবং অবশ্যই গভীর ও অতন্দ্রভাবে জগৎ ও পারিপার্শ্বিককে বাস্তবভাবে ব্যাখ্যা করা। আজকাল অনেকেই বিজ্ঞানকে ঈশ্বর বা ধর্মের শত্রু বলে ধরে নেন। এ প্রবণতা তরল বুদ্ধির পরিচায়ক। বিজ্ঞানের উদ্ভবই হয়েছিল ধর্মের অঙ্গ হিসেবে। ধর্ম মানে তো জীবন। যে বস্তুবিশ্ব আমাদের ঘিরে আছে তাকে জানতে গিয়েই বিজ্ঞানের উদ্ভব হল। ঠাকুর নিজে ছিলেন বিজ্ঞানের একজন নিবিড় অন্তরাসী। বিজ্ঞনচর্চাকে তিনি কতখানি গুরুত্ব দিতেন. তা তাঁর বিস্তৃত কর্মকাণ্ডে ছড়িয়ে রয়েছে।

ঠাকুর তাঁর জন্মভূমি হিমায়েতপুর গ্রামে তৎকালে বিশ্ববিজ্ঞান নামে একটি বৃহৎ গবেষণাগার তৈরি করেছিলেন, নানা বিষেয়ে বিজ্ঞান চর্চার জন্যই। একজন ধর্মগুরুর পক্ষে এ ধরনের কাজ বিরল। শুধু গবেষণাগার প্রতিষ্ঠাই নয় তাতে নানা ধরনের গবেষণা সাফল্যের সঙ্গে হয়েছেও। এ ব্যাপারে ঠাকুরের মস্ত সহায়ক ছিলেন বিজ্ঞানসাধক কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। তিনি বিজ্ঞানের উজ্জ্বল ছাত্র ও গবেষক ছিলেন।

সেদিকে হয়তো তাঁর বিশাল সাফল্য আসতে পারত। কিন্তু সেদিকে যাওয়ার মন হয়নি তাঁর, ঠাকুরকে অবলম্বন করে তাঁর সঙ্গেই জড়িয়ে নিলেন জীবন। বিজ্ঞান অর্থাৎ শুকনো বিজ্ঞান তাঁকে হয়তো অর্থ ও যশ দিতে পারত, ঠাকুরকে জড়িয়ে নিয়ে তিনি পেয়ে গেলেন মহাবিজ্ঞান তথা জীবনবিজ্ঞান। জীবনকেও ধরতে পারলেন, বিজ্ঞানও তাঁর সঙ্গে রইল। ঠাকুর তাঁকে দিয়ে নানা ধরনের গবেষণা করিয়েছেন। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা কিছুই বাদ দেননি।

বিজ্ঞানের মধ্যেও সেই ধারণ-পালনী সম্বেগময়ী ধর্মকেই দেখতে পাই আমরা। ধর্ম তার নিয়ামক না হলে বিজ্ঞানকে জীবনমুখী অস্তিবৃদ্ধিমুখী করে তুলবে কেন? শাতনপন্থীরা বিজ্ঞানকে যে মারণাস্ত্র তৈরি এবং অন্যান্য বিধ্বস্তির সেবায় লাগাচ্ছে সে প্রবণতাই বা ঠেকানো যাবে কী করে? বিজ্ঞান এক নিরপেক্ষ শক্তি। তাকে জীবনমুখী কাজে যেমন নিয়োজিত করা যায়, তেমনি মারণযজ্ঞেও তাকে ব্যবহার করা যায়। সমস্যা হল ব্যবহারকারীকে নিয়ে। মানুষ তার মস্তিক এবং মেধা দিয়ে বিজ্ঞান ব্যবহার করে। মেধাও কিন্তু এক নিরপেক্ষ শক্তি। শুধু মেধা বা বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে কিন্তু প্রেম-ভালবাসা-আবেগ বা মঙ্গলমুখী সম্বেগ থাকে না। তাই এই মেধারও প্রহরী দরকার। একজন মস্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গবেষণা করতে করতে এমন আবিষ্কারের মুখোমুখি হন যা মারণমুখী, যা ভয়ংকর। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তাঁর ওই আবিষ্কারকে উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করতে পারেন না। আইনস্টাইন বা তাঁর মতো আরও কয়েকজন প্রাতঃস্মরণীয় বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের এই দিকটির প্রতি অত্যন্ত অনুভূতিশীল ছিলেন। তাঁদের আবেদনে অবশ্য কাজ হয়নি। বিজ্ঞানকে রাষ্ট্রশক্তি কাজে লাগিয়েছে ধ্বংসাত্মক, মারণমুখী যজ্ঞে। বিজ্ঞানকে কাজে লাগানো হয়েছে ব্যবসায়িক দুর্নীতিতে, যুক্তিহীন অপচয়ে। বিজ্ঞানকে তাই ধর্মান্তরিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বৃথা আবিষ্কারে তাকে কাজে লাগানোর চেয়ে মানুষের সেবায়, মঙ্গলে কী করে তাকে ব্যবহার করা যাবে সেটাই ভেবে দেখা দরকার। বিজ্ঞানী যদি ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন, যদি অস্তিবৃদ্ধির অনুশাসনই তাঁর নিয়ন্তা হয় তবে অচিরে বিজ্ঞানের জাদুকরী প্রভাবে পৃথিবী সুন্দরতর হয়ে উঠতে পারে। বিজ্ঞান নিয়ে আসতে পারে স্বস্তি, আরোগ্য, জ্ঞান ও সার্বিক মঙ্গল। ঠাকুর বিজ্ঞানকে সেইভাবেই নিয়োজিত করেছেন। সেইভাবেই চালনা করেছেন তাঁর বিশ্ববিজ্ঞানকে। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে বিজ্ঞানের মানুষ বড়ো কম নেই। কিন্তু জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁদের অভিজ্ঞ করে তুলতে ঠাকুর পিছপা হননি। তাঁদের নিয়োগ করেছেন লোকসেবামূলক কাজে, পাঠিয়েছেন যাজনে, ভিক্ষায়, করে তুলেছেন ধ্যানী ও প্রেমী। আর ঐভাবেই জীবনের

সঙ্গে মিলিয়ে অস্তিবৃদ্ধির অনুগ [illegible] বিজ্ঞানের সারকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন।

বিজ্ঞান ধর্ম মানে না, ঈশ্বর মানে না এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে। বিজ্ঞান যা প্রমাণ করতে পারে তা-ই বিজ্ঞানের সত্য। তাই বিজ্ঞান অনুমানভিত্তিক বা বিশ্বাসভিত্তিক নয়, এ কথা তো সবারই জানা। কিন্তু যা বিজ্ঞানের জানা নেই তাকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করাও বিজ্ঞানের ধর্ম নয়। ঈশ্বর আছে কি নেই তা বিজ্ঞানের পরিধির বাইরের ব্যাপার, বিজ্ঞান সেই কারণেই আস্তিকও নয়, নাস্তিকও নয় বিজ্ঞানকে মানুষের মঙ্গলের কাজে নিয়োজিত করা এবং শাতনপন্থী প্রয়োগ প্রতিরোধ করাই মানুষের ধর্ম হওয়া উচিত। ঠাকুর বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন. বিজ্ঞান-সম্পর্কিত প্রসঙ্গও বারবার তাঁর আলাপচারিতে এসেছে। সংগঠন করলেন প্রযুক্তিবিদ্যার। কুটিরশিল্পকে উন্নীত করে তুললেন এমনভাবে যাতে সৎসঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে। সৎসঙ্গের প্রযুক্তিবিদরা ব্রিজ তৈরি থেকে নানা কাজের ঠিকাদারি নিয়ে যোগ্যতার সঙ্গে সেই কাজ সম্পন্ন করেছেন। একসময়ে সৎসঙ্গের গেঞ্জির খুব নাম ছিল। কিন্তু ব্যবসা বা বিজ্ঞান কোনোটাই ঠাকুরের উদ্দেশ্য তো ছিল না, তাই সৎসঙ্গকে তিনি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেননি। কিন্তু মানুষকে যে প্রায় শূন্যতা থেকে কেবলমাত্র যোগ্যতাকে উস্কে দিয়ে অনেকখানি করে তোলা যায় তা তিনি পরীক্ষামূলকভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন।

ঠাকুর যখন দেশভাগের এক বছর আগে দেশ ছেড়ে দেওঘরে চলে আসেন তখন ইচ্ছে করেই সঙ্গে কিছুই নিয়ে আসেননি। যা কিছু নির্মিত হয়েছিল, যা কিছু সঞ্চিত হয়েছিল সবই হেলাভরে ফেলে রেখে এসেছিলেন। দেওঘরে আবার তাঁকে গোড়া থেকে শুরু করতে হয়েছিল। আর সে কী কষ্ট! তার ওপর ছিল স্থানীয় কিছু লোকের হিংস্র বিরোধিতা।

কেন এভাবে সব ছেড়ে দিয়ে আবার নতুন করে শুরু করলেন ঠাকুর? এর কোনো প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। অবশ্য এটা ঠিক যে দূরদর্শী ঠাকুর অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেশ ভাগ হবেই। তাই এক বছর আগেই তিনি দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলেন। কেন দেওঘরে? তার কারণ বোধ হয় বিহার-বাংলার সীমান্ত অঞ্চলকে ঠাকুর বরাবরই পছন্দ করতেন। এই সীমান্তেই তিনি চেয়েছিলেন তাঁর বঙ্গ-মাগধ পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে। আর সেই উদ্দেশ্যেই বর্ধমানের রামকানালীতে তাঁর ইচ্ছে ছিল হিমাইতপুর গড়ে তুলতে। বিহার-বাংলা সীমান্ত অঞ্চল কেন তাঁর প্রিয়, তা হয়তো আমাদের বুঝে ওঠা কঠিন। কিন্তু তাঁর সমস্ত পরিকল্পনার পিছনেই সবসময়ে থাকত সুচিন্তিত যুক্তিসিদ্ধ বিচার।

মানুষকে দক্ষ যোগ্য ও মানসম্পন্ন করে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বলে তিনি কোন মানুষকেই উপেক্ষা করেননি। নির্বোধ, অতি চতুর, ঠকবাজ, ধান্দাবাজ, মিথ্যাচারী, সন্ত্রাসবাদী, চোর, বাটপাড়, খুনী, গুণ্ডা যারাই এসেছে তাঁর কাছে বা তাঁকে যারাই ভাঙাতে চেয়েছে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে তিনি তাদের কাউকেই প্রত্যাখ্যান করেননি। এই যে নানারকম মানুষ,এদের নিয়েই ছিল ঠাকুরের আশ্চর্য সংগঠন। আর এই সংগঠনের ভিতর দিয়ে একদিকে যেমন মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তেমনি তৈরি হয়েছে একটি আদর্শ সমাজের চেহারাও। সংগঠনকেও আবার ঠাকুর প্রধান করে তোলেননি, কারণ সংগঠন প্রবল হলে ব্যাষ্টি অপ্রধান হয়ে পড়ে। মনে রাখতে হবে সমষ্টির চেয়ে ব্যাষ্টিকে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত করতে চান। ব্যষ্টিকে সেই প্রয়োজনের উপকরণ জোগাতে এবং তার যোগ্যতাকে উস্কে তুলতেই সংগঠন। ঠাকুর নিজে এই সংগঠনের শীর্ষদেশে থেকেছেন বটে, কিন্তু ব্যক্তি তিনিই সকলের আকর্ষণের মূল লক্ষ্য।

যিনি একটি মানুষের জন্য সাম্রাজ্য হারাতেও প্রস্তুত তাঁর পক্ষেই এটা সম্ভব। মানুষের প্রতি এই তীব্র আপসহীন নিঃশর্ত ভালবাসাই তাঁকে এমনতরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে যে নাস্তিকও তাঁর কাছে এসেছে চুম্বকের টানে। এসেছে ভিন্ন মতাবলম্বী মানুষ। এসেছে তাঁর ঘোরতর নিন্দুক এবং বিরোধীরাও।

সত্য বলতে কী, আমি নিজেও তাঁর প্রতি একসময়ে প্রবল বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলাম। দেখার অনেক আগে থেকেই তাঁর সম্পর্কে নানা অপবাদ শুনে আমার মনোভাব বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যখন তাঁকে প্রথম দেখি, তখনই, অর্থাৎ প্রথম দর্শনেই যেন এক স্রোতোময়ী পুণ্য জলধারায় অবগাহন করে উঠলাম, তাঁর প্রতি আমার সমস্ত বিদ্বেষ ধুয়ে গেল। আসলে তাঁর অমল ধবল চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ তাঁর সর্বাঙ্গে সর্বদাই প্রোজ্জ্বল থাকত। খাঁটি মানুষ যিনি তাঁকে কখনো চেষ্টা করে ভাল সাজাতে হয় না। তাঁর অস্তিত্বই তাঁর প্রতি গোটা জগৎকে আকর্ষণ করতে থাকে। ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করা মানেই এক মহাপুণ্য কর্ম। এক বিরল অভিজ্ঞতাও বটে। তাঁকে দেখবার আগে আমি তাঁর সমতুল আর কাউকেই দেখিনি। দেখামাত্র মনপ্রাণ আশা-ভরসা নির্ভরতায় ভরে উঠতে থাকে।

ঠাকুরের সঙ্গে আমার বাক্য বিনিময় হয়েছে সামান্যই। আমি লাজুক এবং কুণ্ঠিত-স্বভাব বলে এবং তিনি সর্বদাই নানা মানুষের ভিড়ে আবদ্ধ থাকেন বলে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ আমি কখনো পাইনি। কিন্তু সর্বদাই মনে হত, তিনি আমাকে যতটা ভালবাসেন ততটা কেউ কখনো আমাকে বাসেনি। কেন এরকম মনে হত

তা আমি আজও ব্যাখ্যা করতে পারিনি। আসলে এসব প্রেম ভালবাসাহীনতার যুগে আমরা ভালবাসার স্বরূপটাকে চিনতেই আর পারি না। তাই হঠাৎ অমল ধবল ভালবাসার আকস্মিক স্পর্শ পেলে কেমন যেন হয়ে যাই। ঠাকুর যে অত মানুষের মধ্যে আমাকে ভালবাসছেন তা কেমন করে টের পেলাম অনেক ভেবেও তার কূলকিনারা করতে পারিনি। কিন্তু বারবারই সেই ভালবাসার চকিত স্পর্শ আমাকে অনেক দুর্গতি থেকে টেনে এনেছে।

নিজের মা-বাবাকে আমি ভীষণ ভালবাসি। তাঁরাও আমার চার ভাই-বোনের মধ্যে আমার প্রতি একটু বেশী স্নেহশীল। তাঁদের চেয়েও আমার প্রতি কারও স্নেহ ভালবাসা আছে বা থাকতে পারে এটা আমার কাছে কল্পনার অতীত ছিল। ঠাকুরের কাছে গিয়ে আমি এরকম এক অসম্ভব সত্যকে আবিষ্কার করলাম। স্পষ্টই টের পেলাম আমার প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা মানুষী সব সীমারেখাকে ভেঙে দিতে পেরেছে। ইনি আমার মায়ের চেয়েও আমাকে বেশি ভালবাসেন। ঠাকুর সম্পর্কে এই বোধটা যখন হল তখনই মনটা আত্মধিক্কারে ভরে যেতে লাগল। তিনি বাসেন কিন্তু কই আমি তো তাঁকে ততটা ভালবেসে উঠতে পারছি না!

এই যে ভালবাসার প্রতিদান, এইটেই সবচেয়ে কঠিন কাজ। ঠাকুরের ওপর আমাদের একধরনের টান বা ভালবাসা হয়তো হয়, কিন্তু ঠিক সেইরকমটা সহজে হতে চায় না যাতে পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করতে পারে, বা দুনিয়া ওলট পালট করে দিতে পারে একজন সাধারণ মানুষও।

ঠাকুর জানতেন সহজে এটা হয় না। তাই তিনি ভালবাসার একটা সহজ বাস্তব শিক্ষা দেওয়ারই চেষ্টা করেছেন। ঠাকুরের সাধনা এই ভালবাসা বা প্রেমেরই সাধনা। এই সাধনার ভিতর দিয়েই ধীরে ধীরে ভালবাসা জন্মায়।

ঠাকুরের অলৌকিকত্ব আমার চোখে এইখানেই। শূন্য মূল্যকে পূর্ণ মূল্যে রূপান্তরের এমন জাদুকাঠি আর কারো হাতে আছে বলে তো আমার জানা নেই।

এই যুগে সব দেশে সব রাষ্ট্রেই ব্যক্তি-মানুষের এক অসহায় অবস্থা। রাষ্ট্রযন্ত্র কাজ করে সমষ্টিগত মানুষের জন্য। আর সমাজ বলে যাও বা একটা কিছু ছিল তা ক্রম-অবলুপ্তির পথে। সুতরাং ব্যক্তি-মানুষের আশ্রয় এখন নিজস্ব পরিবার এবং নিজস্ব গণ্ডি। তার অস্বচ্ছ দৃষ্টি এবং জ্ঞানের অভাব তাকে প্রতিনিয়ত নানা সমস্যা ও অসঙ্গতির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। তার কথা শোনার কেউ নেই, তাকে তেমনভাবে ভালবাসার কেউ নেই। এই অসহায় ব্যক্তি-মানুষটি নিজের সঙ্গে গোটা পৃথিবীর সম্পর্কসূত্রটি খুঁজে পায় না। এই ব্যক্তি হল ঠাকুরের লক্ষ্য। ঠাকুর সমষ্টিকে নিয়ে

যত না ভেবেছেন তার চেয়ে বৈশিষ্ট্যমাফিক প্রতিটি ব্যক্তিকে নিয়ে ভেবেছেন অনেক বেশি। আর ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ তথা পৃথিবীর এবং গোটা জগৎ-জীবনের সম্পর্ক স্থাপনের তুকটিও দিয়ে গেছেন আমাদের হাতে। ঠাকুর উপলব্ধি করেছেন মানুষকে তার কূপমণ্ডুক ও স্বার্থপর জীবন থেকে মুক্ত না করলে তাকে বৃহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়।

॥ দশ ॥

পিছনে রেখে গেছেন ঘটনাবহুল, বর্ণাঢ্য একাশি বছরের এক প্রবল আয়ুষ্কালের দুরন্ত স্মৃতি। ঠাকুরের এই আয়ুষ্কালকে আরও বহুকাল ধরে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হবে। তাঁর দর্শন নিয়ে হবে বহুল গবেষণা! ভাবী পৃথিবীতে ঠাকুরের দর্শন যখন গৃহীত ও ব্যাখ্যাত হবে তখন মানবসমাজের একটা আমূল পরিবর্তনও আমরা আশা করতে পারি। তার কারণ ঠাকুর যা দিয়েছেন তা ধরার মতো, বোঝার মতো অতিমস্তিষ্ক আমাদের কারোই নেই। এক প্রজন্মে ঠাকুরের গোটা জীবনদর্শনটা অন্বয়সহ বুঝে ওঠা বাস্তবিকই এক অতিশয় কঠিন কাজ।

ঠাকুরের জীবনদর্শনের যে অভিনবত্ব আমাদের হতচকিত করে দেয় তা হল সব কিছুর সঙ্গে যুক্ত করে কোনো কিছুকে দেখা। এই যে অন্বয়বোধ এ প্রায় লোপাট হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। এ হচ্ছে স্পেশালাইজেশনের যুগ। ফলে আমরা যে কোনো বিষয়কেই খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন করে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আর এই করতে গিয়ে আমরা কোনো একটা বিষয়ের সঙ্গে অন্য বিষয়ের যোগসূত্র কোথায় তা আর ভেবেও দেখি না, জানতেও পারি না। ঠাকুরেরই একমাত্র একটি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাই তিনি বিচ্ছিন্নভাবে কিছু দেখতেন না দেখতেন তার পশ্চাৎপট এবং অন্বয়সহ। রসায়ন নিয়ে কথা হচ্ছে কিন্তু প্রাসঙ্গিকভাবে পদার্থবিদ্যাকেও আনতে হল। সহায়ক হিসেবে এসে গেল প্রাণিবিদ্যা, নৃতত্ত্ব এবং আরো কত কী। দেখা গেল গোটা জিনিসটাই এক অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা। এই সার্বিক দৃষ্টি ছিল ঠাকুরের মানুষের প্রতিও। কোনো মানুষই নিছক হঠাৎ জন্মায় না, বংশগতির ধারা অনুযায়ী। এক বিশেষ কালসীমায় সে পৃথিবীতে আসে এবং অবস্থান করে। তাছাড়া আছে বিবিধ কর্ম ও অভিভূতি, যা তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, যা চালায়। ঠাকুর তাই একটি মানুষকে দেখতেন তার গোটা পশ্চাৎপটসহ।

ঠাকুরের কাছে গিয়ে যে ক'বার বসবার দুর্লভ সুযোগ হয়েছে ততবারই দেখেছি

নিরন্তর জ্ঞানচর্চাই হচ্ছে। কত বিষয় নিয়ে যে আলোচনা হত তার হিসেব নেই। আবার আর্ত-আতুর সংকটাপন্ন রোগাক্রান্তদেরও নিদান দিতে হত নিরন্তর, বোকা পাগল বায়ুগ্রস্ত মতলববাজদেরও অভাব ছিল না। তাঁর এই ধৈর্যশীল সহানুভূতি এবং প্রতি মানুষের প্রতিই তাঁর অখণ্ড মনোযোগ কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব বলে আমার জানা ছিল না। এটা সম্ভব হয় একমাত্র গভীর ও ব্যাপক ভালবাসা থেকে।

ত্যাগবাদ, কৃচ্ছ্রসাধন, সন্ন্যাস ইত্যাদি তথাকথিত ধর্মীয় আচার-আচরণকে ঠাকুর তেমন মূল্য দেন না। যোগ মানে কোনো কিছুতে বা কোনো কারও প্রতি সক্রিয় অনুরাগ নিয়ে যুক্ত হওয়া। আর এই অনুরাগটিই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই অনুরাগ থেকেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জীবন ও চলনায় আসে জোয়ার। আর এই অনুরাগটিকে জাগ্রত করতে হলে এবং নিরন্তর প্রবহমান রাখতে হলে যা করতে হয় তাই সাধনা। গুরু ভিন্ন যে অন্য কোনো পন্থা নেই, এটা সব শাস্ত্রের, সব ধর্মেরই মত। গুরুর ভিতর দিয়েই ঈশ্বর-সন্ধান করতে হয়। নরদেহে তিনিই নারায়ণ, তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। আবার সেই গুরু যদি হন সর্বজ্ঞ গুরু পুরুষোত্তম তাহলে তো কথাই নেই। ঠাকুরের কাছে যখনই গিয়ে বসেছি তখনই অভ্রান্ত অনুভব করেছি, আর সকলেই তাঁর কাছে নিষ্প্রভ। যৌবনকালে ঠাকুর কেমন হাঁটতেন তা আমি দেখিনি তবে অনেকে তো দেখেছেন। তাঁরাই বলেন তাঁর হাঁটা ছিল ভেসে ভেসে চলার মতো। আর হাঁটতেন অতি দ্রুত। সর্বদাই তাঁর চোখ থাকত সামান্য ঊর্ধ্বমুখী। তাঁর সাধন ভজন বা সিদ্ধিলাভের আলাদা কোনো প্রক্রিয়া ছিল না, খুব সহজ ভাবেই তিনি ভজমান ছিলেন অর্থাৎ নিরন্ত অচ্ছিন্ন নামময় এবং ভাবময়। ঠাকুরের এই লক্ষণগুলি নির্ভুলভাবে নির্দেশ করে তিনি আসলে কে এবং কী, কোমলে কঠোরে সরলে জটিলে রসে বশে তিনি এক অনন্য মানুষ, তেমনি জ্ঞানে সর্বজ্ঞত্বে ক্ষমতায় পুরুষোত্তম।

অনেক চিন্তাভাবনা করেও আমি রহস্যময় ব্যাপারটিকে আজও ঠিক বুঝতে পারি না। ঠাকুরের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে সামান্যই। তাঁকে কখনো স্পর্শ করিনি, তাঁর তামাক সাজা বা অন্যান্য সব পরিচর্যার সুযোগও কখনো হয়নি। তিনি আমার লৌকিক অর্থে অনাত্মীয়, বয়সের ব্যবধান অনেক, তবু কী আশ্চর্য এক মোহ আমাদের অবিরল টানে তাঁর দিকে।

কথা বলা যায় তাঁর মূর্তি আর ছবি নিয়ে। ঠাকুরের এই সব মূর্তি বা ছবি পরবর্তী প্রজন্মের প্রধান অবলম্বন হবে, কেননা তারা তাঁকে চোখে দেখেনি, তাঁর কথা শুনতে পায়নি এবং তাঁর ঐশী ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শেও আসেনি। ঠাকুর বহুবার বলেছেন নাম

ও নামী অভিন্ন। ঠাকুর এই ভরসা ও আশ্বাস আমাদের দিয়েই রেখেছেন, যে ওই চার অক্ষরী বীজ-নামের মধ্যেই তিনি নিয়ত রয়েছেন। সুতরাং পরবর্তী প্রজন্মের যারা, অর্থাৎ যারা তাঁকে চাক্ষুষ করেনি তাদের কাছেও তিনি অপ্রকট নন। যারা ঠিকমতো নামধ্যান করে তাদের কাছে তিনি অদেখা থাকেন না।

কথাটার মধ্যে হয়তো একটু ইঙ্গিত রয়ে গেল। ঠাকুর তো মিরাকল পছন্দ করতেন না। কিন্তু এটাও ঠিক যে নামধ্যান করলে এমন একটা তৃতীয় নয়ন খুলে যায় যার ভিতর দিয়ে অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দর্শন ও অনুভূতি হতেই থাকে।

জগতে তিনি একটা রূপ ধরে আসেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর একটা রূপাতীত রূপও তো আছে। যারা তাঁকে চোখে দেখেছে তারা তাঁর লৌকিক রূপটি ধ্যান করতে করতে রূপাতীতের দিকে যেতে পারে। যারা দেখেনি তারাও পারে। আসল হল এই নাম, তাঁর কাছে উপনীত হওয়ার ওই একমাত্র চাবিকাঠি।

যিশুখ্রীষ্ট নেই, হজরত মহম্মদ নেই, বুদ্ধদেব নেই, চৈতন্যদেব নেই, রামকৃষ্ণদেব নেই, অথচ না থেকেও কত প্রবলভাবেই না তাঁরা আছেন।

ঠাকুর তাঁর মানবলীলা সংবরণ করার পরই আমি কিছুদিন খুব অসহায় বোধ করেছিলাম। মনে হয়েছিল, আমাকে সঙ্গ দেওয়ার, সাহায্য করার, সান্ত্বনা দেওয়ার আর কেউ রইল না। ভারী নিঃসঙ্গ লাগত, ভয় পেতাম। ঠাকুর চলে যাওয়ার মাস দুয়েকের মধ্যেই একটি অদ্ভুত ঘটনার ভিতর দিয়ে ঠাকুর জানিয়ে দিলেন আমাকে, তিনি দেহাতীত হয়েছেন বটে, কিন্তু অনুপস্থিত নন। এই ঘটনার ফলে আমি নিশ্চিন্তির শ্বাস ছেড়েছিলাম। ঘটনাটির বিবরণ দেওয়াটা ঠিক হবে না, সব কিছু প্রকাশ করতে নেই বলেই।

ঠাকুর নিজেই পুণ্যপুঁথিতে বলেছেন, মরলেই তিনি চলে যান না। দেহে থেকেও তো তিনি দেহাতীত ছিলেন। নইলে ধ্যানে ধরা দিতেন কী করে ভক্তের কাছে? কী করে নির্জন বিজনে বিপন্ন ভক্তের কাছে পৌঁছে যেতেন?

ঠাকুরকে নিয়ে এক অলৌকিক কিংবদন্তীর ঘেরাটোপ আছে। তাঁর সম্পর্কে যেটা জনপ্রিয় প্রচার ছিল তা হল তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা। মানুষকে তিনি সম্মোহিত করেন, বশীভূত করেন এবং এমন সব অঘটন ঘটান যা বড়ো ভীতিজনক।

বোঝা যাচ্ছে, অপপ্রচার হলেও তার মধ্যে ঠাকুর সম্পর্কে ওই অলৌকিক ক্ষমতার কথা পাকে প্রকারে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি কয়েকটি পত্র পত্রিকাতেও ঠাকুর সম্পর্কে এই ধরনের কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

একটা কথা বলে রাখা ভাল, ঠাকুর কখনোই এইসব অলৌকিক ঘটনাবলীকে মূল্য দেননি। এই সব ঘটনার ওপর নির্ভর করে ঠাকুরের প্রচার বা প্রতিষ্ঠা অনুচিত।

একথা ঠিক যে প্রেরিত পুরুষেরা অলৌকিক ঘটনাবলীকে মূল্য না দিলে তাঁদের ক্ষমতার কিছু স্বতঃস্ফূর্তি প্রকাশ ঘটতেই থাকে। যিশুখ্রিস্ট থেকে রামকৃষ্ণদেব পর্যন্ত কেউই সম্পূর্ণ নিজের ক্ষমতাকে গোপন করতে পারেননি। ঠাকুরের বেলাতেও একই কথা। কিন্তু তাঁর যেসব ক্ষমতার প্রকাশ ঘটেছে সেটাকেই ধরে বসলে হবে না। ঠাকুরের গভীর জীবনদর্শনে অলৌকিকের স্থান নেই বললেই চলে।

তবে ঠাকুরের দেওয়া জীবনদর্শন এবং জীবনের চলনার নীতিবিধির মধ্যেই অঘটন ঘটনবীজ রয়ে গেছে। "মূল্যহীনের সোনা করিবার পরশ পাথর হাতে আছে তাঁর"— একথাটা ঠাকুর সম্পর্কে খাটে শতকরা একশ ভাগ।

প্রার্থনা

আহ্বানী

(সমবেত প্রার্থনায় অগ্রণী কর্ত্তৃক উদাত্ত আহ্বান)

তমসার পার অচ্ছেদ্যবর্ণ মহান্ পুরুষ
ইষ্টপ্রতীকে আবির্ভূত।
যদ্‌বিদাচরণে তদুপাসনাতেই ব্রতী হই,
জাগ্রত হও, আগমন কর,
আমরা যেন একেই অভিগমন করি,
এক উদ্দেশ্যেই বাক্‌-কর্ম্ম বিনিযোগ করি,
একনিরন্তরতায় সেই তাঁকেই যেন জানিতে পারি, শ্রদ্ধানুসৃত আপূর্য্যমাণ ইষ্টৈকপ্রাণনায়,
একই মন্ত্রে, একই মননে সমষ্টি-উৎসারণায়,
বৈশিষ্ট্যপূরণী একচেতনাভিমন্ত্রণে
শিষ্ট হবিঃ ও শ্রেষ্ঠ হবনায়
সমান আকূতি ও সম্যক্ হৃদয়ে
জীবন-বর্দ্ধনে ঋদ্ধিমান হই।
স্বস্তি। স্বস্তি!! স্বস্তি!!!

পুরুষোত্তম-প্রণাম

বন্দে লোকতিলকং সাত্বতবার্ত্তা-বিভূষণং
অমরকৃত্যুৎসারণং প্রবুদ্ধং লোকজীবনং
প্রণয়-প্রমত্ত-যাগদীপনং
বন্দে জীবন-জীবনং সৎপুরুষম্।

(১)
প্রাতঃকালীন বিনতি

রাধাস্বামী নাম। জো গাওয়ে সোঈ তরে।।
কল কলেশ সব নাশ। সুখ পাওয়ে সব দুখ হরে।। ১ ।।
অ্যায়সা নাম অপার। কোঈ ভেদ না জানঈ।।
জো জানে সো পার। বহুরি ন জগ মে জনমঈ।। ২ ।।
রাধাস্বামী গায় কর। জনম সুফল কর লে।।
ইয়হী নাম নিজ নাম হ্যায়। মন অপনে ধর লে।। ৩ ।।
ব্যয়ঠক স্বামী অদ্‌ভুতী। রাধা নিরখ নিহার।।
অউর ন কোঈ লখ সকে। শোভা অগম অপার।। ৪ ।।
গুপ্ত রূপ জঁহ্ ধারিয়া। রাধাস্বামী নাম।।
বিনা মেহর নহি পাওঈ। জহাঁ কোঈ বিশ্রাম।। ৫ ।।
করূঁ বন্দগী রাধাস্বামী আগে। জিন পরতাপ জীও
বহু জাগে।। ৬ ।।
বারম্বার করূঁ পরনাম। সদগুরু পদম ধাম সতনাম।। ৭।।
আদি অনাদি জুগাদি অনাম। সন্ত স্বরূপ ছোড়
নিজ ধাম।। ৮ ।।
আয়ে ভওজল নাও লগাঈ। হম সে জীওন লিয়া চঢ়াঈ।। ৯ ।।
শব্দ দৃঢ়ায়া সুরত বতাঈ। অরব খরব দণ্ডৌত।।
রাধাস্বামী মিল গয়ে। খুলা ভক্তি কা সোত।। ১১ ।।
ভক্তি সুনাঈ সব সে ন্যারী। বেদ কতেব ন
তাহি বিচারী।। ১২ ।।
সন্ত-পুরুষ চৌথে পদ বাসা। সন্তন কা ওহাঁ সদা
বিলাসা।। ১৩ ।।
সো ঘর দরসায়া গুরু পূরে। বীন বজে জহঁ
অচরজ তূরে।। ১৪ ।।
আগে অলখ পুরুষ দরবারা। দেখা জায় সুরত
সে সারা।। ১৫ ।।

তিস পর অগম লোক ইক ন্যারা। সন্ত সুরত কোই করত
বিহারা।। ১৬ ।।
তহাঁ সে দরসে অটল অটারী। অদ্ভুত রাধাস্বামী মহল
সঁওয়ারী।। ১৭ ।।
সুরত হুঙ্গ অতি কর মগনানী। পুরুষ অনামী
জায় সমানী।। ১৮ ।।

বাংলা অনুবাদ ঃ—

রাধাস্বামী নাম যে গান করে সেই তরিয়া যায়। শরীরের ক্লেশ সবই নাশ হয়, সুখ পায়, সমস্ত দুঃখ দূর হয়। এই অপার নামের রহস্য কেহ জানে না—যে জানে সে পার হয়, পুনরায় জগতে জন্মায় না। "রাধাস্বামী" গান করিয়া জনম সফল কর। এই নাম আদি নাম নিজের মনে ধরিয়া লও।

স্বামীর অদ্ভুত সিংহাসন রাধা পূর্ণভাবে নিরীক্ষণ করেন। অন্য কেহ এই অগম ও অপার শোভা দেখিতে পায় না। যেইখানে রাধাস্বামী নাম গুপ্তরূপ ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার দয়া ভিন্ন সেইখানে কেহ বিশ্রাম পায় না।

যাঁহার প্রতাপে বহু জীব জাগরিত হয়, সেই রাধাস্বামীর সামনে বন্দনা করিতেছি। সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে, সত্যধামে ও সত্যনামে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি। আদি, অনাদি ও অনামী সন্তস্বরূপ নিজ ধাম ছাড়িয়া আসিয়া ভবসাগরে নৌকা লাগাইয়াছেন ও আমার মত জীবসকলকে তাহতে চড়াইতেছেন এবং শব্দ বিশ্বাস করাইয়া ও সুরতের কথা শুনাইয়া ভ্রম-কর্ম্ম হইতে রক্ষা করিতেছেন। কোটি কোটি বার বন্দনা করিতেছি, অসংখ্য বার দন্ডবৎ জানাইতেছি—রাধাস্বামীকে পাইয়া ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইয়াছে—এমন অনন্য ভক্তির কথা শুনাইয়াছেন। সত্যপুরুষের ধাম চতুর্থ পদে—যেইখানে আশ্চর্য্য শব্দে বীণাধ্বনি হইতেছে—সেইখানেই সন্তগণ সদা বিলাস করেন। পূর্ণগুরু সেই ঘর দেখাইয়াছেন। সম্মুখে অলখ পুরুষের দরবার, সুরত তত্ত্ববস্তু দেখিতে পায়। তারপর অগম পুরুষের দরবার—যেইখানে কোন কোন সন্তসুরত বিহার করেন—সেইখানে হইতে অবিনাশী "রাধাস্বামী" মহল দেখিয়া তথায় প্রবেশ করে এবং সুরত অত্যন্ত মগ্ন হইয়া অনামী পুরুষে বিলীন হইয়া যায়।

(২)
সন্ধ্যাকালীন বিনতি

বার বার করূঁ বীনতি। রাধাস্বামী আগে।।
দয়া করো দাতা মেরে। চিত চরনন লাগে।। ১ ।।
জনম জনম রহী ভুল মেঁ। নহিঁ পায়া ভেদা।।
কাল করম কে জাল মেঁ। রহি ভোগত খেদা।। ২ ।।
জগত জীও ভরমত ফিরেঁ। নিত চারোঁ খানী।।
জ্ঞানী যোগী পিল রহে। সব মন কী ঘানী।। ৩ ।।
ভাগ জগা মেরা আদি কা। মিলে সদগুরু আঈ।।
রাধাস্বামী ধাম কা। মোহিঁ ভেদ জনাঈ।। ৪ ।।
উঁচ সে উঁচা দেশ হ্যায়। ওঅহ্ অধর ঠিকানী।।
বিনা সন্ত পাওয়ে নহীঁ। শ্রুত শব্দ নিশানী।। ৫ ।।
রাধাস্বামী নাম কী। মোহি মহিমা সুনাঈ।।
বিরহ্ অনুরাগ জগায় কে। ঘর পঁহুচুঁ ভাঈ।। ৬ ।।
সাধ সংগ কর সার রস। ম্যাঁয়নে পিয়া অঘাঈ।।
প্রেম লগা গুরু চরণ মেঁ। মন শান্ত ন আঈ।। ৭ ।।
তড়প উঠে বেকল রহুঁ। কৈসে পিয়া ঘর জাঈ।।
দরশন রস নিত নিত লহুঁ। গহে মন থির তাঈ।। ৮ ।।
সুরত চঢ়ে আকাশ মেঁ। করে শব্দ বিলাসা।।
ধাম ধাম নিরখত চলে। পাওয়ে নিজ ঘর বাসা।। ৯ ।।
ইয়হ্ আশা মেরে মন বসে। রহেঁ চিত উদাসা।।
বিনয় সুনো কিরপা করো। দীজে চরন নিবাসা।। ১০ ।।
তুম বিন কোই সমরথ নহীঁ। য্যায়সে সে মাঁগু দানা।।
প্রেম ধার বরখা করো। খোলো অমৃত খানা।। ১১ ।।
দীন দয়াল দয়া করো। মেরে সমরথ স্বামী।।
শুকর করূঁ গাওত রহুঁ। নিত রাধাস্বামী।। ১২ ।।

বাংলা অনুবাদ ঃ—

রাধাস্বামীর সম্মুখে বার বার বিনতি করি। হে দাতা! আমাকে দয়া কর—যেন চরণে চিত্ত লাগিয়া থাকে। জন্ম জন্ম ভুলের মধ্যে থাকিয়া তত্ত্ব পাই নাই—কাল এবং কর্ম্মের জালে পড়িয়া দুঃখ ভোগ করিতেছি। জগতের জীবসকল সদা চতুর্ব্বিধ অবস্থায় (স্বেদজ, অন্ডজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ) ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। জ্ঞানী ও যোগী সকলেই মনের ঘানিতে ঘোরে। আমার আদি ভাগ্য জাগরিত হইয়াছে—সদ্গুরু পাইয়াছি। রাধাস্বামী ধামের মর্ম্ম আমাকে জানাইয়াছেন। সেই দেশ উচ্চ হইতে উচ্চ এবং ইহা সর্বোচ্চ স্থান। সন্ত ব্যতীত অন্য কেহ সুরত শব্দের সন্ধান পায় না। রাধাস্বামী নামের মহিমা আমাকে শুনাইয়াছেন। বিরহ এবং অনুরাগ জাগাইয়া আমাকে ঘরে পৌঁছাইয়াছেন। সাধুসঙ্গ করিয়া আমি সার রস আকণ্ঠ পান করিয়াছি। গুরুর চরণে আমার প্রেম জাগিয়াছে—কিন্তু মন শান্ত হয় নাই। কি প্রকারে আমি প্রিয়তমের ঘরে যাইব, নিত্য তাঁহাকে দর্শন করিব এবং মন স্থির হইবে—এই চিন্তায় মন ব্যস্ত ও ব্যাকুল। সুরত আকাশে উঠিয়া শব্দের বিলাস ভোগ করে। ধামের পর ধাম দেখিতে দেখিতে নিজ ঘরে বাসা পায়। এই আশা আমার মনে যেন স্থান পায়, চিত্ত উদাস থাকে। আমার বিনতি শোন, দয়া করিয়া চরণে স্থান দাও। তুমি ভিন্ন সমর্থ পুরুষ আর কেহ নাই—যাঁহার কাছে থাকিয়া দান ভিক্ষা করিব। প্রেমের ধারা বর্ষণ করো, অমৃত ভান্ডার খুলিয়া দাও। হে দীন দয়াল সর্ব্বশক্তিমান প্রভু। দয়া করো, কৃতজ্ঞতার সহিত নিত্য রাধাস্বামী নাম যেন গান করি।

(৩)
প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালীন বিনতি

বার বার কর জোড় কর। সবিনয় করূঁ পুকার।।
সাধ সঙ্গ মোহি দেও নিত। পরম গুরু দাতার।। ১ ।।
কৃপাসিন্ধু সমরথ পুরুষ। আদি অনাদি অপার।।
রাধাস্বামী পরম পিতু। ম্যাঁয় তুম সদা অধার।। ২ ।।
বার বার বল জাউঁ। তনমন ওয়ারূঁ চরণ পর।।
ক্যা মুখ লে ম্যাঁয় গাউঁ। মেহর করী জস কৃপা কর।। ৩ ।।

ধন্য ধন্য গুরু দেব। দয়া সিন্ধু পূরণ ধনী।।
নিত্য করুঁ তুম সেব। অচল ভক্তি মোহিঁ দেও প্রভু।। ৪ ।।
দীন অধীন অনাথ। হাথ গহা তুম আন কর।।
অব রাখো নিত সাথ। দীন দয়াল কৃপানিধি।। ৫ ।।
কাম ক্রোধ মদ লোভ। সব বিধি অবগুন হার ম্যঁয়।।
প্রভু রাখো মেরী লাজ। তুম দ্বারে অব ম্যঁয় পড়া।। ৬ ।।
রাধাস্বামী গুরু পর্‌তক্‌স। তুম দ্বারে এতী বিলম্ব কেঁও।। ৭ ।।
দয়া করো মেরে সাইয়াঁ। দেও প্রেম কী দাত।।
দুখ সুখ কুছ ব্যাপে নহী। ছুটে সব উৎপাত।। ৮ ।।

বাংলা অনুবাদ ঃ—

হাত জোড় করিয়া বিনয়ের সহিত বারংবার প্রার্থনা করিতেছি। হে পরম গুরু দাতা। আমাকে নিত্য সাধুসঙ্গ দাও। হে সর্ব্বশক্তিমান কৃপাসিন্ধু পুরুষ। তুমিই আদি, অনাদি ও অপার। হে রাধাস্বামী পরমপিতা। তুমি সদাই আমার অবলম্বন। পুনঃ পুনঃ বলি—তোমার চরণে দেহমন অর্পন করিতেছি। তুমি অনুগ্রহ করিয়া যে প্রকার আমাকে কৃপা করিতেছ—তাহা মুখে আমি কেমন করিয়া বর্ণনা করিব। হে দয়াসিন্ধু পূর্ণধ্বনি গুরুদেব। তুমিই ধন্য প্রভু। আমি নিত্য তোমার সেবা করি, তুমি আমাকে অচলা ভক্তি দাও। আমি দীন, অধীন, অনাথ, তুমি আসিয়া আমার হাত ধরিয়াছ। হে দীনদয়াল কৃপানিধি। এখন তুমি আমাকে নিত্য সাথে রাখ। কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ ইত্যাদি সব রকম অবগুনে আমি বশীভূত্। হে প্রভু! আমার লজ্জা রক্ষা কর, আমি তোমার দ্বারে পড়িয়া আছি। হে সর্ব্বশক্তিমান গুরু রাধাস্বামী। তুমি ভিন্ন আমার আর দ্বিতীয় কেহ নাই। এখন প্রত্যক্ষভাবে দয়া কর। তোমার দ্বারে এত বিলম্ব কেন! হে আমার প্রভু! আমাকে দয়া ও প্রেম দান কর। সুখ-দুঃখ কিছুই যেন আমার নাগাল না পায়—সমস্ত উৎপাত ছুটিয়া যায়।

প্রার্থনা

হে পরমকারুণিক! হে সর্ব্ব! হে সর্ব্বানুস্যূত ব্যাপ্ত প্রাক্ প্রথমবাক্! সব্বস্বর্গ সর্ব্বহৃদয় প্রাণনপরিমল অদ্বিতীয় ঈশ্বর! জীব জগৎরূপে প্রতিভাত! রক্ত-মাংস-সঙ্কুল উদ্ভাসিত—তুমিই তোমার তজ্জাত সন্তান! এই আমিও তোমার তুমিরই উৎক্ষেপ, এই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের যা'-কিছু মলিনতা উৎসারিত অমৃত আশিসে জরা-মরণ-দুঃখ-দুরিত-বিপত্তি যা'-কিছু অপসারিত করিয়া তোমাতে উদ্ভাসিত করিয়া তোল! এই আমি আমার আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়া অমৃত আচমনে পবিত্র হইলাম! আমি পবিত্র। আমি পবিত্র। আমি পবিত্র।

পুরুষোত্তম-বন্দনা

বন্দে পুরুষোত্তমম্।
ত্বাং ইষ্টং হৃদয়োৎসবং শ্রীবিগ্রহম্
বৈশিষ্ট্যপূরকং সমষ্ট্যুৎসারকম্
একাচারিণম্!
সৃজনোৎসং ত্বামীশ্বরং প্রকটপরায়ণম্
নিখিল-জগজ্জীবনবীচিস্পন্দিতম্
ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপকম্ পরমদৈবতম্
নরং নারায়ণম্!
মৎস্য-কূর্ম্ম-কোল-নৃসিংহ-বামন-শরীরম্
রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধ-যীশু-মোহম্মদ-রূপায়িতম্
চৈতন্য-রামকৃষ্ণানুকূলং পূর্ব্বতনীপূরণম্
শাশ্বতং বর্ত্তমানম্!
ব্যক্তি-দম্পতি-গৃহ-সমাজ-রাষ্ট্রোদ্ধারণে
যজন-যাজনেষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নী-প্রবর্ত্তকম্
প্রাচ্যপ্রতীচ্য-নিয়ন্ত্রণে বর্ণাশ্রমানুশাসকম্
আর্য্য-চিরায়ণম্!
আর্য্যকৃষ্টিতূর্য্যধ্বনিত-পল্লীনিকেতনম্

আর্য্যভূমিধূলিপাবনচিদানন্দকম্
সকলশিল্পবিজ্ঞানুযুতং পূর্ণং পুরাণং
পরাৎপরকম্!
ধর্ম্মগ্লানিত্রস্ত-ভুবনে বৃত্তিঘূর্ণনে
সকলবাদব্যামোহর সদ্ধর্ম্মস্থাপকম্!
আপূরয়ন্তমিষ্টমেকমদ্বিতীয়কম্
যুগাদর্শমনুত্তমম্!
প্রেমোচ্ছলনরবপুর্ধৃতং মন্মথমন্মথম্
নবীনার্য্যতীর্থঙ্করং বিচিত্রলীলকম্
বিশ্বমিলনহবন-নবীনবেদদায়িনম্
বিনায়কভাস্করম্!
রণতান্ডবদ্রোহক্ষুব্ধে ক্লিষ্টে বিশ্লিষ্টে লোকে
অভ্যুত্থিত-ম্লেচ্ছাচারাপূরিত-দিঙ্মন্ডলে
জীবনবৃদ্ধ্যসিলকং মিত্রামিত্রবল্লভম্
কল্কিবৃমুদগ্রম্!
নমানি বিপ্লাবিনং প্রিয়ং পরমং কমমপি
করালম্।
পুরুষোত্তমম্! পুরুষোত্তমম্!
বন্দে পুরুষোত্তমম্!

প্রণাম

যিনি সব যাহা কিছুতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়ার দেদীপ্যমান, সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি! আর সেই ব্রাহ্মণ যিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন, তাঁহাকে আমার অশেষ নমস্কার। যে আচরণে তাঁহাকে জানা যায় সেই আচরণকে যিনি আচরণ দ্বারা জানাইয়া থাকেন— সেই আচার্য্যকে প্রণিপাত করিতেছি। যাঁহারা দ্রষ্টাপুরুষ, সেই ঋষিদিগকে নমস্কার করি। যিনি মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিকে সেবা ও সাহচর্য্যে উদ্দীপ্ত করিয়া প্রত্যেক হৃদয়ে দীপ্তিমান—সেই দেবতাকে নমস্কার করিতেছি। যাহা জানা গিয়াছে এবম্প্রকার জ্ঞানকে আমি আমার সর্ব্বশরীর ও ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রণিপাত করিতেছি। আমি পরমকারুণিকপ্রসূত

সর্ব্বপ্রাণপোষণপ্রদ বায়ুকে প্রণাম করি। মৃত্যু—যিনি জীবের জীবন ও বৃদ্ধির অপলাপ করিয়া স্থায়িত্বকে নিঃশেষ করিয়া দেন—আমি তাঁহাকেও নমস্কার করিতেছি, যেন তাঁহা হইতেও অমৃত বহন করিতে পারি! যিনি সর্ব্ব ও প্রত্যেকের ভিতর বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত সেই বিষ্ণুকে আমি অশেষ প্রণিপাতে প্রণাম করিতেছি। আর যাহা কিছু সবের প্রতীক, আব্রহ্মসর্ব্বদেবময়, আমারই উদ্ধাতা, আমার সদ্‌গুরুকে প্রলীন প্রণিপাতে বার বার প্রণাম করি।

যাহা কিছু জাত হইয়াছে—তৎসমুদয়ের জ্ঞানের কারণ যিনি, তাঁহার নিমিত্ত তদৈশ্বর্য্যে স্নাত হইতেছি। তিনি আমাদের অরাতিবুদ্ধিকে দহন করুন! সেই অগ্নি—সর্ব্বপ্রকার দুরিত ও দুর্গতি হইতে নৌকা যেমন সিন্ধু পার করে, তেমনই করিয়া আমাদিগকে উত্তীর্ণ করুন। উর্দ্ধগতিশীল, অস্তি ও প্রগতিপন্ন, দেদীপ্যায়িত, বৃদ্ধি-পরম, কৃষ্ণপিঙ্গল, বিরূপাক্ষ, বিশ্বপ্রতীক হে পুরুষ! আমি তোমাকে নমস্কার করি!

সদ্‌গুরু-বন্দনা

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
অখন্ডমন্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যেন কৃৎস্নং চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ
চিদ্রূপেণ পরিব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
মন্নাথ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদগুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষীভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং ত্বাং নমামি।।

পঞ্চবর্হি

১। এঁকমেবাদ্বিতীয়ং শরণম্।
২। পূর্ব্বেষামাপূরয়িতারঃ প্রবুদ্ধ ঋষয়ঃ শরণম্।
৩। তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তিনঃ পিতরঃ শরণম্।
৪। সত্ত্বানুগুণা বর্ণাশ্রমাঃ শরণম্।
৫। পূর্ব্বাপূরকো বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ শরণম্।

এতদেবার্য্যায়ণম্, এষ এব সদ্ধর্ম্মঃ,
এতদেব শাশ্বতং শরণ্যম্।

১। এক অদ্বিতীয়দের শরণ লইতেছি। ২। পূর্ব্বপূরণকারী প্রবুদ্ধ ঋষিগণের শরণ লইতেছি। ৩। তাঁহাদের পথ অনুসরণকারী পিতৃপুরুষগণের শরণ লইতেছি। ৪। অস্তিত্বের গুণপরিপোষক বর্ণাশ্রমের শরণ লইতেছি। ৫। পূর্ব্ব-পূরণকারী বর্ত্তমানে পুরুষোত্তমের শরণ লইতেছি।

ইহাই আর্য্যপথ—ইহাই সদ্ধর্ম্ম,
আর ইহাই চিরন্তন শরণযোগ্য।

সপ্তার্চ্চি

১। নোপাস্যমন্যদ্ ব্রহ্মণো ব্রহ্মৈকমেবাদ্বিতীয়ম্।

২। তথাগতাস্তদ্বার্ত্তিকা অভেদাঃ।

৩। তথাগতাগ্র্যো হি বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ পূর্ব্বেষামাপূরয়িতা বিশিষ্ট-বিশেষবিগ্রহঃ।

৪। তদনুকূলশাসনং হ্যনুসর্ত্তব্যন্নেতরৎ।

৫। শিষ্টাপ্তবেদপিতৃপরলোকদেবাঃ শ্রদ্ধেয়া নাপোহ্যাঃ।

৬। সদাচারা বর্ণাশ্রমনুগজীববর্দ্ধনা নিত্যং পালনীয়াঃ।

৭। বিহিতসবর্ণানুলোমাচারাঃ পরমোৎকর্ষহেতবঃ, স্বভাবপরিধ্বংসিনস্তু প্রতিলোমাচারাঃ।

ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নহে, ব্রহ্ম এক—অদ্বিতীয়। ২। তথাগতগণ—তাঁহারা বার্ত্তা বহনকারী—অভিন্ন। ৩। তথাগকগণের অগ্রণী বর্ত্তমানে পুরুষোত্তম, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-পূর্ব্বগণের আপূরণকারী বিশেষ বিশিষ্ট নরবিগ্রহ। ৪। তাঁহারা অনুকূলশাসনই অনুসরণীয়—সেই ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ৫। শিষ্ট তত্ত্ববিৎ পিতৃপুরুষ ও পরলোকবাসী দেবগণ শ্রদ্ধেয়—অবহেলার যোগ্য নহে। ৬। বর্ণাশ্রম-অনুগামী সদাচার জীবনবর্দ্ধনীয়—নিত্যপালনীয়। ৭। বিহিত সবর্ণ ও অনুলোমক্রমিক আচারসমূহ পরম উৎকর্ষের কারণ—এবং প্রতিলোম-আচার স্বভাব-ধ্বংসকারী।

দন্ড প্রণাম-মন্ত্র

প্রত্যহ দন্ড ব্যবহারের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণপূর্ব্বক দন্ড মস্তকে স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে—ধর্ম্মানুশাসন-পালকং শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসাদম্ শান্তি-স্বস্তি-শুভদায়কং জীবনবৃদ্ধিদং

—শ্রীশ্রীঠাকুর

যজন, যাজন ইষ্টভৃতি

যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি—সৎসঙ্গী মাত্রেরই অবশ্য পালনীয় নিত্য ব্রত। সদাচারসম্পন্ন হইয়া নিষ্ঠা ও অনুরাগের সহিত ইষ্টের নামধ্যানপরায়ণ হইয়া চলা, অনুসন্ধিৎসু সেবা

ও সাহচর্য্যের সহিত পারিপার্শ্বিকের ভিতর তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করা,—আর, ইষ্টভরণের মধ্য-দিয়া নিজের সর্ব্বশক্তি ইষ্টে কেন্দ্রায়িত করিয়া সত্তাকে অটুট করিয়া তোলা—ইহাই যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি। কিন্তু সব কিছুরই মূলে থাকা চাই ইষ্টানুরাগ। অনুরক্ত হৃদয়ে তাঁহাকে অনুসরণ করিলেই মানুষ প্রকৃত মঙ্গলের অধিকারী হয়। প্রতিদিন প্রাতে সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে শ্রদ্ধার সহিত 'ইষ্টভৃতির অর্ঘ্য নিবেদন করিবে। এই নিবেদিন অর্ঘ্য প্রতি ৩০ দিনে সদক্ষিণায় ও সংগঠনী ১২ পয়সাসহ ইষ্টসকাশে তাঁহারই নির্দ্দেশমত স্বহস্তে কিংবা স্বয়ং ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া দুইজন ইষ্টভ্রাতাকে নিজ হইতে দুইটি ভোজ্য প্রদান করতঃ পারিপার্শ্বিকের সেবার জন্য কিছু অর্থ সংরক্ষণ করিবে।

ইষ্টভৃতি-মন্ত্র

সংস্কৃত

জীবনং করুণাসিন্ধো! জগতস্ত্বং জগৎপতে।
ভবতঃ কৃপয়া লব্ধং জীবনং সফলং মম।।
প্রাগেব সর্ব্বকার্য্যেভ্যস্তবৈব ভোগ-তৃপ্তয়ে।
ইষ্টভৃতিঃ কৃতাস্মাভিঃ কৃপয়া গৃহ্যতাং প্রভো।।

বাংলা

জীব-জগৎ-জীবন-কারণ করুণাময় স্বামী।
তোমার দয়ায় লভেছি জনম, সকলি
পেয়েছি আমি।
আজি এ প্রভাতে কর্ম্মারম্ভে তোমারি
ভোগের লাগি'
ইষ্টভৃতির অর্ঘ্য দিতেছি—শ্রীচরণে কৃপা মাগি।

ইষ্টভৃতি-ব্রতভঙ্গে

অন্ততঃ একদিন হবিষ্যাশী হইয়া সম্পূর্ণ অনিবেদিত অর্ঘ্য অথবা অপারগপক্ষে যথাসম্ভব নিবেদন করিয়া পুনরায় ব্রত নিয়মিতভাবে পালন করিয়া যাইতে হইবে।

ইষ্টভৃতির নিবেদিতঅর্ঘ্য অন্য কাজে ব্যয় করিলে বা হারাইয়া ফেলিলে নষ্ট কিংবা অপহৃত হইলে—অনুতাপের সহিত খ্যাপনসহ ভিক্ষা করিয়া নষ্ট বা অপহৃত অর্ঘ্য সংগ্রহ করিয়া পরদিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া তৎপরদিন ঐ সংগৃহীত অর্থ মন্ত্র পাঠ করিয়া নিবেদনানন্তর রাখিয়া দিতে হইবে।

হবিষ্যে গ্রহণীয় দ্রব্য

হবিষ্যান্নে আতপ তণ্ডুল, সৈন্ধব লবণ, মুগ, মটর, তিল, যব, কাঁচকলা, আম, পাকাকলা, দুধ, ঘৃত, হরীতকী ও আমলকী—এইগুলি গ্রহণীয়। দিনে একবার পরিমিতভাবে হবিষ্যান্ন বিধিমত গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহা ছাড়া, নেহাৎ তৃষ্ণা বোধ করিলে অপারগপক্ষে জল গ্রহণ করিতে পারা যায়।

স্বস্ত্যয়নী-ব্রত

নিজের ও পরিবারের ইষ্টমুখী উন্নত চলনাকে চলৎশীল রাখার জন্য স্বস্ত্যয়নী-ব্রত প্রত্যেকেরই অবশ্য গ্রহনীয়।

স্বস্ত্যয়নী-মন্ত্র

শ্রীবিগ্রহস্ত্বং পুরুষোত্তমো মে বন্দে ত্বাং
সদনুকূলচন্দ্রম্।
ত্বং হীষ্টস্ত্বমে পূজ্যঃ প্রতিষ্ঠায়ৈ তে
নিযুনক্তু বৃত্তিঃ।।
তবানুকূলং যদি সত্যকামং মুহুঃ কৃপয়া
কুরু কর্ম্মনিষ্ঠম্।
সন্ধিৎসয়া সেবয়া যাজনেন
সর্ব্বাংস্তএবানুরঞ্জয়ানি।।

রোগ-শোক-গ্রহদোষ-বুদ্ধিবিপর্য্যয়াচ্চ মে।
দারিদ্র্যাদি-সর্ব্বদৈন্যাৎ মুঞ্চ মে ত্বয়ি নিষ্ঠয়া।
শান্তিং স্বস্তিং শুভং দেহি
দেহি কর্ম্ম সুকৌশলম্।
দেহি মে জীবন-বৃদ্ধী নিয়তং স্মৃতিচিদ্যুতে।।

বাংলা অনুবাদ ঃ—

শ্রীবিগ্রহ তুমি, তুমিই পুরুষোত্তম, আমার অস্তিবৃদ্ধির অনুকূল দীপ্তি, তোমাকে বন্দনা করি। তুমিই ইষ্ট, তুমিই পূজ্য, আমার সকল বৃত্তি তোমারই প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত হউক। সত্যকাম, তবানুকূল আমাকে কৃপা করিয়া ত্বৎকর্ম্মনিষ্ঠ কর। সন্ধিৎসায়, সেবায় ও যাজনে যেন সকলকে ইষ্টে অনুরঞ্জিত করি ও করিতে পারি। তোমার প্রতি নিষ্ঠা যেন আমাকে রোগ-শোক-গ্রহদোষ বুদ্ধিবিপর্য্যয় ও দারিদ্র্যাদি সর্ব্বদৈন্য হইতে মুক্ত করিয়া তোলে। আমাকে শান্তি দাও, স্বস্তি দাও, শুভ ও সুকর্ম্মের কৌশল দাও— আর দাও আমাকে নিরন্তর চেতনাবাহী স্মৃতিযুক্ত জীবন ও বৃদ্ধি।

স্বস্ত্যয়নী-ব্রতভঙ্গে

তিনদিন অহোরাত্র উপবাস থাকিয়া—অপারগপক্ষে তিনদিন একবেলা পরিমিত হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ অনিবেদিত অর্ঘ্য মন্ত্র পাঠানন্তর একসঙ্গে নিবেদন করিতে হইবে অথবা অপারগপক্ষে উপবাসান্তে নিত্যব্রতার্ঘ্যসহ যথাসাধ্য প্রত্যহ পৃথকভাবে উল্লেখ ও নিবেদন করিয়া ঐ অনিবেদিত অর্ঘ্য পূরণ করিয়া রাখিতে হইবে। উপবাসের তিনদিনও নিত্য অর্ঘ্য রাখিতে হইবে।

স্বেচ্ছায় স্বস্ত্যয়নী-ব্রতের নিবেদিত অর্ঘ্য অন্য কাজে ব্যয় করিলে—শিশু-প্রাজাপত্য ব্রত শেষ করিয়া পঞ্চম দিনে মন্ত্র পাঠ করিয়া ব্যয়িত অর্ঘ্য পুনঃ নিবেদন করিয়া স্বস্ত্যয়নী-ব্রত আরম্ভ করিতে হইবে।

অজ্ঞাতে স্বস্ত্যয়নী-ব্রতের নিবেদিত অর্ঘ্য হারাইয়া ফেলিলে, নষ্ট বা অপহৃত হইলে—অনুতাপের সহিত খ্যাপনসহ ভিক্ষা করিয়া নষ্ট বা অপহৃত অর্থ সংগ্রহ করিয়া পরদিন প্রাতে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া সারাদিন উপবাসী থাকিয়া তৎপরদিন ঐ সংগৃহীত অর্থ অর্ঘ্যমন্ত্র পাঠ করিয়া নিবেদনানন্তর রাখিয়া দিতে হইবে।

স্বস্ত্যয়নী-ব্রতের অর্ঘ্য যথাবিধি যথাসময়ে প্রেরণ না করিলে—একদিন পূর্ব্বাহ্নে হবিষ্য করিয়া প্রায়শ্চিত্তানন্তর ঐ অর্ঘ্য ইষ্টস্থানে প্রেরণ করিতে হইবে।

প্রায়শ্চিত্তের সময় নিত্যকরণীয় স্বস্ত্যয়নী-ব্রতের অর্ঘ্যাদি নিবেদন ঠিকমত চলিতে থাকিবে।

অশৌচাবস্থায় ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নীর অর্ঘ্য অপর কোনো সৎসঙ্গী দ্বারা নিবেদন করা বিধি—অভাবে অশৌচান্তে প্রতিদিনের অর্ঘ্য একত্রি করিয়া নিবেদন করিবে।

ঋত্বিকী

প্রতিমাসের ইষ্টভৃতির সাথে নিজের দীক্ষাদাতা ঋত্বিকের পোষণ ও তুষ্টির জন্য অন্ততঃ নিজের একদিনের আহার্য্য-উপযোগী ঋত্বিকী-অবদান ইষ্টসকাশে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। ইহা যেন ইষ্টভৃতি অপেক্ষা বেশী না হয়।

শিশু প্রাজ্যপত্য-ব্রত

শিশু প্রাজ্যপত্যের নিয়মে পর পর বারো দিন অথবা প্রথম ৩ দিন পূর্ব্বাহ্নে হবিষ্যান্ন, দ্বিতীয় ৩ দিন অপরাহ্নে হবিষ্যান্ন, তৃতীয় ৩ দিন অযাচিত হবিষ্যান্ন, চতুর্থ ৩ দিন নিরম্বু উপবাস থাকিয়া ত্রয়োদশ দিন প্রাতে যথাসাধ্য ইষ্টপ্রণামী নিবেদন করিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে।

ব্রতকালে নিতান্ত অশক্ত হইলে জল, ফলমূলাদিও গ্রহণ করা যাইতে পারে। সংযমী ও ইষ্টনিষ্ঠ থাকিয়া ত্রিসন্ধ্যা স্নান, ভূমিতে কম্বলে শয়ন, নগ্নপদে ভ্রমণ, ক্ষৌরকর্ম্ম না করা এবং মাতা ভিন্ন অপর স্ত্রীলোক ও পতিতের সঙ্গে বাক্যালাপ না করাই বিধি।

কৃচ্ছ্র-সান্তপন বা মহাসান্তপন-ব্রত

জাতিভ্রংশকর কর্ম্ম করিলে ইষ্টসকাশে উপস্থিত হইয়া সপ্ত দিবসব্যাপী ব্রত পালন করিয়া আত্মশুদ্ধি করিতে হইবে।

খ্যাপন অর্থাৎ "আমি পাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া মহাসান্তপন ব্রত করিতেছি"—

অনুতপ্ত হৃদয়ে পাপের ব্যাপারগুলিকে স্ত্রী এবং জিজ্ঞাসাকারী শ্রদ্ধান্বিত যাহারা, তাহাদের নিকট বলা, শ্রদ্ধা ও অর্থবোধের সহিত নামজপ অথবা সাবিত্রীজপ ও অঘমর্ষণ-মন্ত্র জপ ও আবৃত্তি করা, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, কম্বল পাতিয়া শয়ন, নগ্নপদে ভ্রমণ, ক্ষৌরকার্য্য না করা এবং নারী, শূদ্র ও পতিতের (অর্থাৎ ইষ্টনিষ্ঠাহীন ম্লেচ্ছের) সহিত বাক্যালাপ না করা—এই নিয়ম পালন করতঃ শ্রদ্ধাময় সত্যকাম হইয়া অপ্রয়োজনীয় বিক্ষেপী বাক্যালাপ সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিবে।

(১) প্রথমদিন ভোরে একবার এবং পরে বারে-বাবে কয়েকবার ক্ষুধাতৃষ্ণার প্রয়োজন মাফিক গো-মূত্র পান করিয়া সারাদিন উপবাসী থাকিতে হইবে।

(২) দ্বিতীয় দিন অল্প-অল্প করিয়া কয়েকবার ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রয়োজন-মাফিক টাটকা গোময় সেব করিয়া উপবাসী থাকিতে হইবে।

(৩) তৃতীয় দিন গো-দুগ্ধের সহিত সমপরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া এক বলকা হইলে অল্প গরম থাকিতে ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রয়োজন-মাফিক এক ছটাক আন্দাজ প্রতিবারে সেবন করিতে হইবে।

(৫) পঞ্চম দিনে গো-ঘৃত বারে-বারে ক্ষুধাতৃষ্ণার প্রয়োজন-মাফিক ঈষৎ উষ্ণ করিয়া চা-চামচের এক চামচ আন্দাজ পান করিবে।

(৬) ষষ্ঠ দিনে সদ্য কুশ পূর্ব্বদিন রাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া বারে বারে ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রয়োজন-মাফিক প্রতিবারে এক ছটাক আন্দাজ পান করিতে হইবে।

(৭) সপ্তম দিনে উপবাসী থাকিতে হয়—অশক্তপক্ষে বিশেষ প্রয়োজন হইলে প্রত্যেক দিনই শুধু জল অল্প করিয়া পান করা যাইতে পারে।

ব্রত শেষে যথাবিধি গুরু-প্রণামী দিয়া ব্রাহ্মণকে ভোজ্য প্রদান করতঃ প্রাতে কাঁচা মুগ ভিজান, একটু মাখন ও ইক্ষু-গুড় উত্তম-রূপে চিবাইয়া খাইয়া ফেলিতে হইবে এবং তাহার ঘন্টা দুই-তিন পরে পাতলা মিশ্রীর সরবৎ খাইয়া কিছুকাল পরে মধ্যাহ্নে খুব অল্প পরিমাণে যাহাতে পেটের কোনরূপ উপদ্রব সৃষ্টি না করে, এমনতর সহজপাচ্য আহার্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। রাত্রে বা বৈকালে সহজে পরিপাক হয় এমনতর কিছু—যেমন দুধ-সাগু আহার করাই শ্রেয়। পরদিনও সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর আহার্য্য অল্প পরিমাণে যথাসময়ে গ্রহণ করাই উচিত। এইরূপে ক্রমশঃ স্বাভাবিক আহার্য্য গ্রহণের উপযোগী হইতে হইবে।